বংশ পরিচয়।

(চতুর্থ খণ্ড)

"প্রজাপতি" ও "মজলিস" সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

মূল্য ৫৲ টাকা।
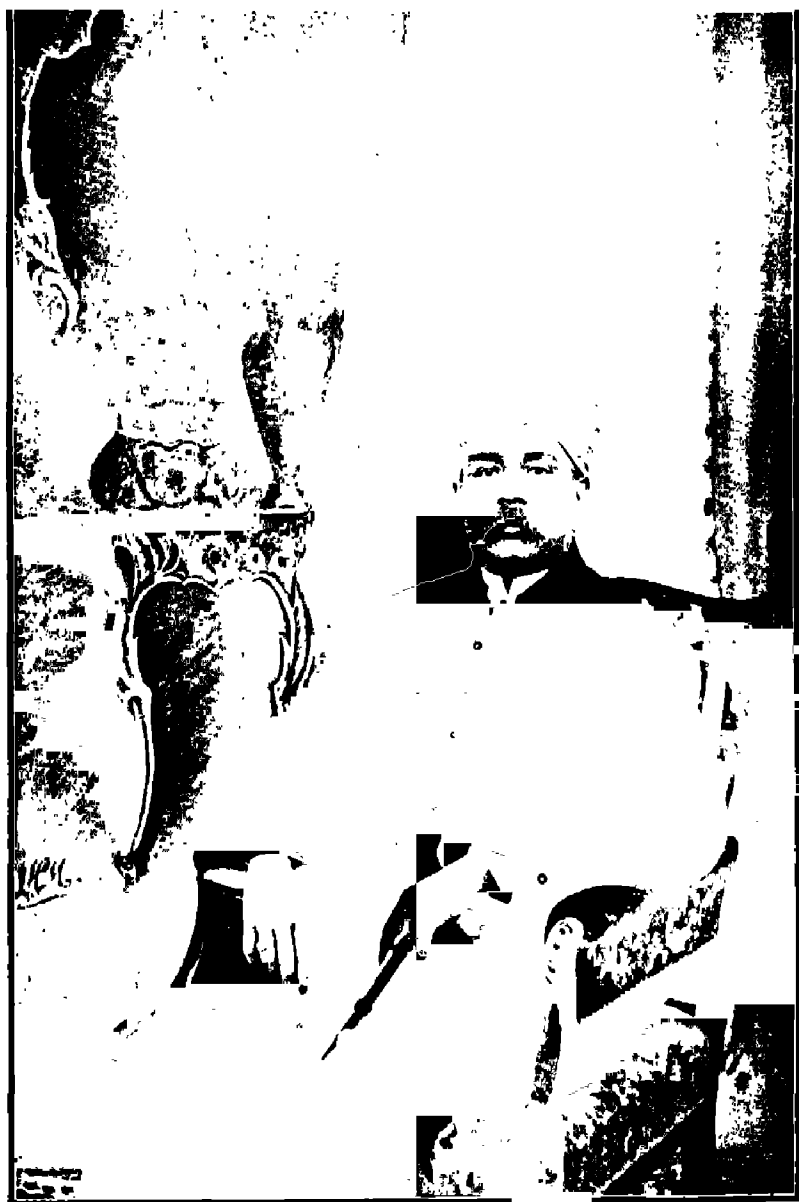
রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া

উৎসর্গ পত্র

বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক

বঙ্গের অন্যতম বদান্যবর প্রজারঞ্জক

শিয়াড়শোলাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া

মহোদয়ের করকমলে

বংশ পরিচয়ের চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থকারের

অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বংশ পরিচয়।

চতুর্থ খণ্ড।

কলিকাতার ঠাকুর বংশ।

বঙ্গদেশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র শুভ সম্মিলন যদি কোন জমিদার গৃহে হইয়া থাকে, তবে তাহা কলিকাতার ঠাকুর বংশে। এই বংশের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই সাহিত্যসেবা, দর্শনালোচনা, সঙ্গীতপ্রিয়তা, চিত্রনিপুণতা অথবা বদান্যতা ইহার কোন না কোন গুণের জন্য বঙ্গদেশের সকলের নিকট সুপরিচিত। বস্তুতঃ বঙ্গের জমিদারবর্গের মধ্যে ঠাকুর বংশ আদর্শ স্থানীয়।

১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূরের অনুরোধে কান্যকুব্জাধিপতি যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন, ভট্টনারায়ণ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই ভট্টনারায়ণ হইতেই এই ঠাকুরবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ বহু সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "বেণী সংহার" নাটকখানি আজও পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাট্যরসজ্ঞগণের নিকট সমাদৃত হইতেছে। সে সময়ে রাজন্যবর্গকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ হয় কোন শ্লোক রচনা করিয়া, না হয় কোন গ্রন্থাদি লিখিয়া তাহাকে উপহার দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। কথিত আছে, ভট্টনারায়ণ এই "বেণী সংহার" নাটকের দ্বারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

ভট্টনারায়ণের নবম বংশধর ধরণীধর মনুসংহিতার টীকাকার ছিলেন। ধরণীধরের ভ্রাতা বনমালীও বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। ধরণীধরের পৌত্র ধনঞ্জয় "নিবন্ধ' নামক একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের রাজা বল্লালসেনের অধীনে বিচারক ছিলেন। তাঁহার পুত্র হলায়ুধ সাতখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনের অমাত্য বলিয়াই বিশেষ পরিচিত। তাঁহার সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য রাজদরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার দুই পুত্র মহেন্দ্র ও গুণেন্দ্রকে সাধারণে বড় কুমার ও ছোট কুমার বলিত। এই বড় কুমার হইতেই কলিকাতার ঠাকুর বংশ প্রত্যক্ষভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। রাজারাম ও জগন্নাথ, মহেন্দ্রের চতুর্থ ও ষষ্ঠ বংশধর। তাঁহারা বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। জগন্নাথ "পণ্ডিতরাজ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ পিঠাভোগের শুদ্ধশোত্রীয় কুশারী ব্রাহ্মণ। তিনি যশোহর চেঙ্গটিয়ার পিরালী বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া পিরালী হন এবং সেই স্থানেই নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম এবং পৌত্র বলরামও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

বলরামের পঞ্চম বংশধর এবং ভট্টনারায়ণের পঞ্চবিংশতি ও ষষ্ঠবিংশতি বংশধর শুকদেব ও পঞ্চানন প্রথমে "ঠাকুর" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যে কোন ব্রাহ্মণ কার্য্য করিতেন, তাঁহাকেই 'ঠাকুর' অভিধা দেওয়া হইত। পঞ্চাননও গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের মধ্যে "ঠাকুর", বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ "ঠাকুর" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। পঞ্চানন ও তাঁহার খুল্লতাত শুকদেব যশোহরের চেঙ্গটিয়ার অন্তর্গত বারপাড়া গ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন।

এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অবস্থিত, সেখানকার নাম পূর্ব্বে গোবিন্দপুর ছিল। পঞ্চানন এই গোবিন্দপুরে জায়গা জমি কিনিয়া

বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কলিকাতা কালেক্টারের অধীনে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন এবং এই সূত্রে রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। জয়রাম ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে চারি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। সিরাজউদ্দৌলার নিকট হইতে কোম্পানী যখন কলিকাতা পুনরায় গ্রহণ করিলেন, তখন জয়রামের পিতা যেখানে বাড়ী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই স্থান তাঁহারা দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য স্থির করিলেন। তদনুসারে ঐ স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্রদিগকে অন্য জমি দেওয়া হইয়াছিল। জয়রামের পুত্রেরা পাথুরিয়াঘাটায় জমি খরিদ করিয়া উঠিয়া আসিলেন, সেখানে তাঁহারা একটি নূতন বাসগৃহ ও স্নানের ঘাট নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটী ও স্নানের ঘাট এখনও তাঁহার বংশধরদিগের সম্পত্তি। জয়রামের চারি পুত্রের নাম আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। গোবিন্দরামের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মিত হয়। আনন্দীরামের ও গোবিন্দরামের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলমণির বংশ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ এবং দর্পনারায়ণের বংশ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ বলিয়া সর্ব্বজনপরিচিত। শুকদেবের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চোরবাগানে বাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তদ্বংশীয়েরা চোরবাগানের ঠাকুর বংশ বলিয়া পরিচিত।

জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র নীলমণি হইতে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের উৎপত্তি। নীলমণির তিন পুত্র—রামলোচন, রামমণি, ও রামবল্লভ। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে রামমণির তিন পুত্র ছিল। এই তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন ঠাকুর কর্ত্তৃক পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রমানাথ ঠাকুর। ইনিই পরে মহারাজা রমানাথ ঠাকুর বলিয়া সর্ব্বসাধারণে পরিচিত হন।

কলিকাতা ঠাকুর বংশের পৈতৃক বাসভবন দরমাহাটা ষ্ট্রীটে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেখানে এই বংশের প্রথম বাসগৃহ স্থাপিত হয়।

৺দ্বারকানাথ ঠাকুর।

নীলমণি ভ্রাতার সহিত পৃথক হইবার পর জোড়াসাঁকোতে বাস করেন। নীলমণির বংশধরগণ রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্যের অনুশীলন করিয়া বঙ্গে—শুধু বঙ্গে কেন, সমগ্র ভুবনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নীলমণি ঠাকুরের পুত্র রামমণি ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন তাঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রামলোচন পরলোক গমন করেন, তখন দ্বারকানাথ সবেমাত্র বালক। কাজেই তাঁহার দত্তক মাতা তাঁহাকে লালন-পালন করেন।

দ্বারকানাথ উত্তরাধিকার সূত্রে কুমারখালির জমিদারী এবং কটকে ও কলিকাতায় অনেক ভূসম্পত্তি ও দালান কোটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি শৈশবাবধি হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী বিধানে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তিনি মিঃ সেরবোর্ণের স্কুলে প্রথমে ইংরাজী পড়িয়া পরে পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। অতি অল্প বয়স হইতেই জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি জমিদারী সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আইনও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ছয় বৎসর কাল চব্বিশপরগণার লবণ বিভাগের এজেণ্টের সেরেস্তাদার পদে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছুকাল কার্য্য করিবার পর তিনি এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে "কারঠাকুর" নামক একটী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি শিলাইদহে ও অন্যান্যস্থানে নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠা

স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর

করেন। তিনি "Resolution" নামে একখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া অনেক বাণিজ্য সম্ভারে জাহাজখানি পরিপূর্ণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় মাল রপ্তানী করিয়াছিলেন। "সতীদাহ" প্রথা নিবারণ কল্পে রাজা রামমোহন যে আন্দোলন করেন, সেই আন্দোলনের দ্বারকানাথ অন্যতম সহায়ক ছিলেন। কলিকাতার হিন্দু কলেজ ও মেডিকল কলেজদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে দ্বারকনাথের চেষ্টা ও উদ্যম নিহিত। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "জমিদার সভা"র প্রতিষ্ঠা করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ তাঁহারই পরামর্শ মত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার তিনি অগ্রদূত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। রোমে উপস্থিত হইয়া তিনি তত্রত্য মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাত করেন। লণ্ডনে উপনীত হইলে তিনি বিশেষ অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনা লাভ করেন। ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে দর্শন দান করেন। দ্বারকানাথের পূর্ব্বে এ সম্মান ও সৌভাগ্য অন্য কোন ভারতবাসীর হয় নাই। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মহারাণীর সহিত একত্রে ভোজন করিবার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ স্কটল্যাণ্ডেও গিয়াছিলেন এবং তথায়ও যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারিশে রাজা লুই ফিলিপের সন্দর্শন লাভের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যান্বিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় লণ্ডনে গমন করেন। পথে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও ইটালীর রাজা তাঁহাকে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করেন। মহারাণী এবারেও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং দ্বারকানাথের প্রদত্ত উপহার অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। মহারাণীর বিশেষ নিমন্ত্রণে দ্বারকানাথ বাকিংহাম প্রাসাদে উপনীত হইলে মহারাণী তাঁহাকে তাঁহার নিজের ও যুবরাজ আলবার্টের প্রতিকৃতি উপহার দেন। লণ্ডন হইতে দ্বারকানাথ আয়রলণ্ডে যান, সেখানকার গবর্ণরও তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

দ্বারকানাথের সহিত ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন্ প্রায়ই ভারতীয় ব্যাপারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

দ্বারকানাথ District Charitable societyতে ১০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে লণ্ডন নগরেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য লণ্ডনের Times পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

"We regret to have to announce the death of the distinguished Hindu gentleman Babu Dwarka nath Tagore whose name and high character may be familiar to many of our readers···His donations to the different institutions and colleges and his active advocacy of every measure to advance the individual in India be his rank or position what it may—who has more largely patronised the advancement and fortunes of the many around him···His opinion was one of the foremost on the abolition of Sutee..."

দ্বারকানাথ তিন পুত্র রাখিয়া যান; দেবেন্দ্রনাথ, গিরিন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথ অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করেন। ঋষিতুল্য চরিত্র ও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য দেবেন্দ্রনাথের নাম সমগ্র বঙ্গে সুপরিচিত। তিনি "মহর্ষি" আখ্যায় আখ্যায়িত হইতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যখন সবেমাত্র বালক তখন তিনি সংস্কৃত ও হাফেজের কবিতা অনর্গল কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি যখন বিংশতি

বর্ষীয় যুবকমাত্র তখন তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। শ্মশান ঘাটে জ্বলন্ত চিতা চুল্লীতে পিতামহীর দেহকে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি পার্থিব ধনসম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের অস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের আধিপত্য হ্রাস হইতে লাগিলে দেবেন্দ্রনাথ সেই সময় ভগ্নদশা হইতে সমাজকে রক্ষা করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেবেন্দ্র নাথের চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ পুনরায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠে। দেবেন্দ্র নাথ জীবনের অধিকাংশ সময় হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে ভগবদারাধনায় অতিবাহিত করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ সত্য, সরলতা ও সৌহার্দ্দ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। কুচবিহার মহারাজের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় যখন কেশবচন্দ্রকে সকলে ত্যাগ করিয়াছিল, তখন শেষ পর্য্যন্ত—এমন কি কেশবচন্দ্রের মৃত্যু শয্যায় দেবেন্দ্রনাথই শুধু উপস্থিত ছিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যু হইবার অব্যবহিত পরেই দেখা গেল যে তিনি প্রায় এক ক্রোর টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের জমিদারীর কিয়দংশ ট্রাষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার জমিদারীর আয় বৎসরিক ১২।১৩ লক্ষ টাকা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর অনেকে দেবেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিল যে কার ঠাকুর কোম্পানীর ঋণের জন্য ট্রাষ্ট-সম্পত্তি বিন্দুমাত্র দায়ী নয় এবং সে জন্য উত্তমর্ণগণ আপনার জমীদারীর সেই অংশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ দেবেন্দ্র নাথ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সমস্ত ঋণদাতাগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সমগ্র জমিদারী গ্রহণ করিয়া তাহার আয়ে স্ব স্ব

ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া লইতে এবং তাঁহার নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের জন্য সামান্য মাত্র মাসিক বৃত্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সহৃদয়তা গুণে ট্রাষ্ট সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই; অন্যান্য সম্পত্তি হইতে ঋণশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মহাঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য সামান্য গৃহস্থের ন্যায় অবস্থায় পতিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে দেবেন্দ্র নাথের বিন্দুমাত্র দুঃখ হয় নাই। তিনি যে পিতার ঋণ পাশ হইতে মুক্ত হইবার একটা উপায় করিতে পারিয়াছেন, তাহাতেই তিনি পরম সুখী হইয়াছিলেন। পিতার ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ, আসবাবপত্র, অলঙ্কার ও ঘোড়া গাড়ী প্রভৃতি সমস্তই বিক্রয় করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে সম্পত্তি বিক্রয়াদির দ্বারা ঋণের টাকা সমস্তই সুদে আসলে পরিশোধ হইয়াছিল।

দেবেন্দ্র নাথের পিতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। দ্বারকানাথ কোন এক দাতব্য সভায় (Charitable society) তে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কার ঠাকুর কোম্পানীর জন্য ক্রোড় টাকার ঋণে ঋণী হইলেও ঐ লক্ষ টাকা পিতার স্বাক্ষর হইতে পরিশোধের দিন পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা সুদে আসলে শোধ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই যোগী পুরুষ ছিলেন। ধনে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তিনি সংসারে থাকিতেন বটে, কিন্তু নিষ্কাম ও নিস্পৃহভাবে। তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে যে ‘মহর্ষি” উপাধি দিয়াছিল তাহা যোগ্যপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট নানা দিগ্দেশ হইতে শত শত তীর্থযাত্রী আগমন করিত, সকলেরই তাঁহার নিকট যাইবার অবারিত অধিকার ছিল। বার্দ্ধক্য দশায় তিনি উভয় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি

হারাইয়াছিলেন বটে এবং কাণেও শুনিতে পাইতেন না বটে, তথাচ সকলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবলোকে প্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। মহামতি ভীষ্ম যে উত্তরায়ণ দিনে শরশয্যায় দেহত্যাগ করেন, সেই উত্তরায়ণ দিনে মধ্যাহ্নকালে পুণ্যবান দেবেন্দ্রনাথ নিত্য পুণ্যধামে মহাপ্রস্থান করেন।

তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য যে অনুশাসন রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির কথা প্রতি অক্ষরে পরিব্যক্ত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। তিনি তাঁহার পুত্র ও কন্যাগণকে যে ভাবে সুশিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন তাহার সুফল আজ সমগ্র বঙ্গদেশ ভোগ করিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৭ পুত্র ও ৫ কন্যা। তাঁহার যে সকল রচনা দ্বারা বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছিল এস্থলে সেগুলি উল্লিখিত হইল:—আত্মজীবনী, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্ম সমাজে ২৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি এবং পরলোক ও মুক্তি। তাঁহার জীবনীকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরপ্রীতি ও দেশপ্রীতি—এই দুই প্রীতি ছিল তাঁহার সমস্ত রচনার উৎস। তাহার সহিত তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টি, তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রভৃতি মানস শক্তিগুলি মিলিয়া তাঁহার রচনার রীতিকে সুন্দর, সংহত ও সুবোধ্য করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গলা গদ্যভাগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

তাঁহার পুত্র কন্যাগণের নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুকুমারী দেবী, শরৎকুমারী দেবী, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এক্ষণে তাঁহার বয়স ছেয়াশি বৎসর। পঞ্চম বৎসর বয়সে হাতে খড়ী হইবার পর তিনি সহোদর সত্যেন্দ্রনাথের সহিত পাঠারম্ভ করেন। কথিত আছে. এই শৈশব বয়সেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারত কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। আট বৎসর বয়ঃক্রম-কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ সেণ্টপল্‌স্ নামক স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালা রচনায় তাঁহার আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। মাত্র পনর বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সংস্কৃত মেঘদূত কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। দর্শন শাস্ত্র তাঁহার চিত্তে বাল্যকাল হইতেই স্থান লাভ করিয়াছিল। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময় তিনি "তত্ত্ব বিদ্যা" নামে একখানি গভীর চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থ রচনা করেন। তেইস্ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার "স্বপ্ন প্রয়াণ" নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। "তত্ত্ব বিদ্যা" দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ তত্ত্ব জ্ঞানের নিদর্শন। তদ্ব্যতীত বহু সভা সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ রাশিও তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা ও তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু দার্শনিক নহেন, —তিনি কবি, নাট্যকার ও সুগায়ক।

তাঁহার মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ, মেবার ও রোস্তম, ব্রহ্মধর্ম্মের পদ্যানুবাদ, "মলিন মুখ চন্দ্রমা" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত এবং গুম্ফাক্রমণ কাব্য, বাবুর গঙ্গাযাত্রা, সোণার কাটী রূপার কাটী, সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা প্রভৃতি রহস্য রচনা বাঙ্গালার সাহিত্যিক মণ্ডলীর আদরের বস্তু। বাঙ্গালা ভাষায় সাংকেতিক লিপি প্রচলনের জন্য তাঁহার রেখাক্ষর বর্ণমালা

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার অদ্ভুত উদ্ভাবনা শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার গীতার আলোচনা এবং গীতাপাঠ বিশেষজ্ঞের নিকটেও তাঁহার দার্শনিকতার পরিচয় দেয়।

তাঁহার মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের আদরের বস্তু। বিজ্ঞানে ও গণিত শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে; তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং স্বীয় সমাজের উন্নতির জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন। কিছুদিন যাবৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশেষ দক্ষতার সহিত তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। প্রবাসী পত্রিকায় এখনও তিনি মধ্যে মধ্যে পরিণত বয়সের প্রগাঢ় চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধাদি দিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্র-নাথ মূল সভাপতির পদে বরিত হন। সেই অধিবেশন বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল উদ্বোধন করেন। এখনও দ্বিজেন্দ্র নাথের সাহিত্যালোচনার নিবৃত্তি নাই। অধুনা তিনি বোলপুরের শান্তি নিকেতনে ঋষি মুনিদিগের ন্যায় নির্জ্জন ও শান্তিময় জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার অহিংসা, ধর্ম্মভাব এত প্রবল যে বনের পক্ষীসকল পর্য্যন্ত অকুতোভয়ে তাঁহার শরীরে পতিত হয়। তিনি তাহাদের লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্র নাথ অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ গত ১৩৩০ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নলিনী দেবীকে এবং দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সভ্য ছিলেন। শেষ জীবনে বোলপুর শান্তি নিকেতনে বাস করিতেন এবং শান্তি নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার উক্ত কন্যার সহিত হরিপুর জমিদার বংশীয় সার আশুতোষ চৌধুরীর অন্যতম ভ্রাতা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুহৃদ চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীত ও অভিনয় কলায় এবং অন্যান্য কলা নৈপুণ্যের জন্য বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলির বিশুদ্ধ স্বরলিপি এবং পিতামহের বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া, তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি এখন বোলপুরে থাকিয়া বিশ্বভারতীর অন্যতম অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কবিতাপুস্তক 'বীণ' তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্য সেবার পরিচায়ক। ৺দীপেন্দ্রনাথ প্রথম পক্ষে—হাইকোর্টের প্রথিত নামা ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল্ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও লাখুটিয়ার জমিদার, বঙ্গ সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের বৈমাত্রেয় ভাগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে হাইকোর্টের স্বনামধন্য এটর্ণী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী হেমলতা দেবীও বাঙ্গলা সাহিত্যে অপরিচিতা নন। তাঁহার ইংরাজাধিকারে ভারতে ধর্ম্ম বিস্তার, দুনিয়ার দেনা, জ্যোতি প্রভৃতি পুস্তকগুলি যথেষ্ট প্রশংসালাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণেন্দ্রনাথ ও তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কৃতীন্দ্রনাথ। চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্র নাথের দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার সহিত হাইকোর্টের স্বনামধন্য এটর্ণী পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর জীবন চরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে, এবং কনিষ্ঠার সহিত কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সর্ব্বজন পরিচিত ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান ৺রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। মোহিনী মোহন ও রমণীমোহন ইঁহারা সহোদর। ইঁহাদের পিতা ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের অন্যতম দৌহিত্র। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।
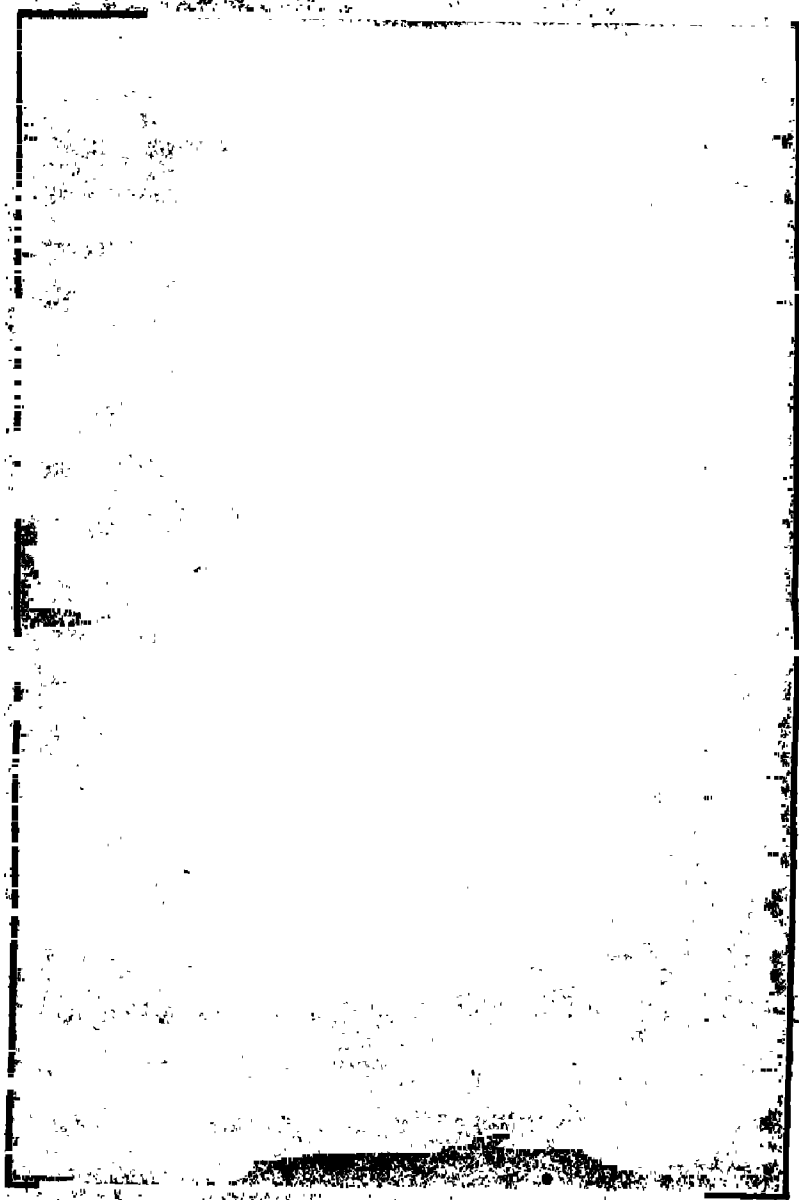
৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি প্রতিম শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গ-সাহিত্যের একজন যশস্বী লেখক। সুধীন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম ব্যবহারাজীব। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র গল্প বঙ্গীয় মাসিকপত্র সমূহের ললাট-তিলক।

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁহার ক্ষুদ্র গল্প পড়িতে পড়িতে অনেক সময় অশ্রুসংবরণ দায় হইয়া উঠে। মঞ্জুষা, চিত্ররেখা, করঙ্ক প্রভৃতি গল্প পুস্তকগুলি সুধীন্দ্রনাথের উপন্যাস-প্রতিভার সম্যক পরিচয়। সুধীন্দ্রনাথ সামাজিক, নিরভিমানী, বিনয়ী ও শিষ্টাচারী। তিনি অনেক সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকেন। তিনি "সাধনার" সম্পাদকরূপে অনেকদিন সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। "সাধনা" পত্রিকার আরম্ভ হইতে তিনি তাহার সম্পাদকতা করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ এ পড়িবার সময় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রদেশের নানা জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, ও পরে সেসন জজের পদে কার্য্য করিয়া পেনসন গ্রহণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথও সুলেখক।

কিছুকাল তিনি ৺মনমোহন ঘোষের সহিত এক যোগে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি তত্ত্ব-বোধিনী-পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ বৎসর ম্যাজিষ্ট্রেটী, কালেক্টরী ও পরে সেসন জজীয়তা করিবার পর তিনি পেনসন লইয়া অবকাশ গ্রহণ করেন। অবকাশ গ্রহণ করিয়া তিনি রাষ্ট্রনৈতিক

আন্দোলনে যোগদান করিতে থাকেন এবং নাটোরে যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেনস হয় সেই কন্‌ফারেনসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি নির্জ্জন জীবন যাপন করিতে অধিক অভিলাষী বলিয়া শীঘ্রই রাষ্ট্রক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। তিনি কুষ্টিয়া ও কুষ্টিয়াবাসিগণের উন্নতি কল্পে ও হিতার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছিলেন, তাহা অপরিশোধনীয়। তিনি ইংলণ্ড হইতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছিলেন—

"সুরপুরে সশরীরে শূর কুলপতি,
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি' পুণ্যবলে,
ফিরিলা কানন বাসে, তুমি হে তেমতি
কত স্থানে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে—
মনোদ্যানে আশালতা তব ফলবতী—
ধন্য ভাগ্য হে সুভগ, তব ভবতলে।"

সত্যেন্দ্রনাথ নীরবে সাধনা করিয়াছিলেন এবং সে সাধনার ফল নীরবেই দেশ মাতৃকার পায়ে অর্পণ করিয়া আপনি ধন্য হইয়াছিলেন এবং দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন।

তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে পর্দ্দা প্রথার অত্যন্ত কঠোরতা ছিল, সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টার ফলে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা সর্ব্ব প্রথমে সস্ত্রীক সভা সমিতিতে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করেন।

"ভারতী" পত্রিকায় তাঁহার অনেক সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্রবাসীতে "আমার বোম্বাই প্রবাস" নাম দিয়া তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। "স্ত্রী স্বাধীনতা" নামক তাঁহার পুস্তকখানিতে স্ত্রীস্বাধীনতার তিনি যে পক্ষপাতী ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বোম্বাইচিত্র, বৌদ্ধধর্ম্ম, নবরত্নমালা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার,
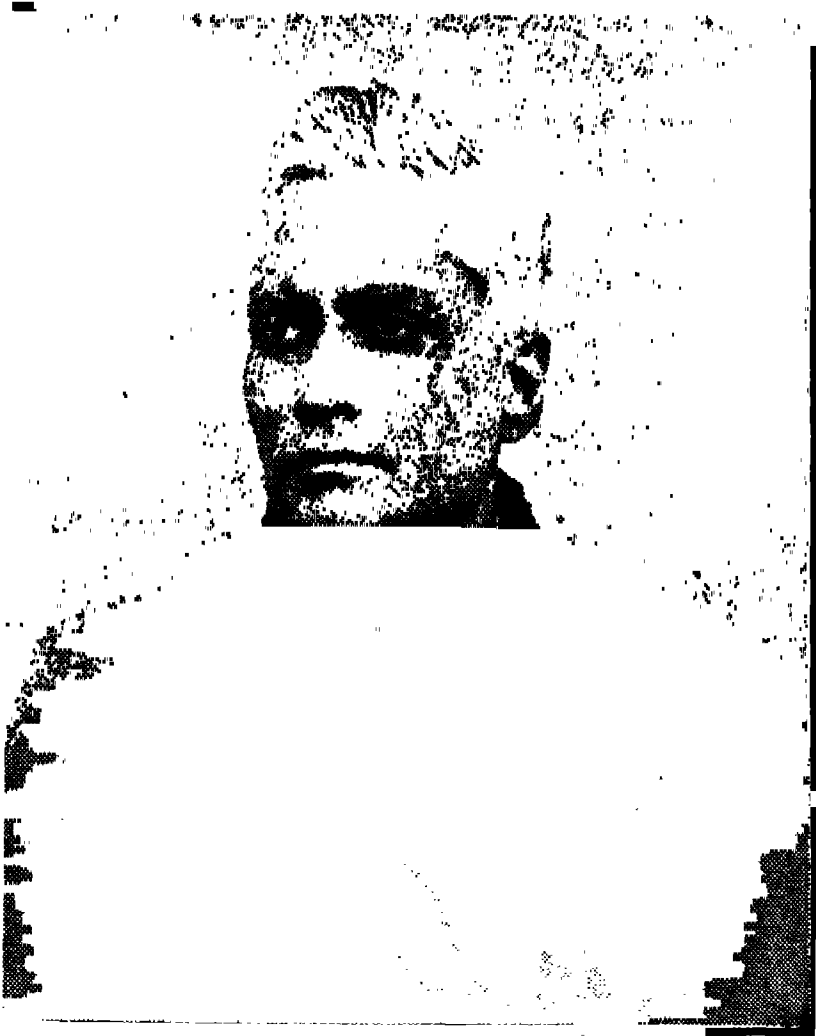
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, ইংরাজী অনুবাদ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য ভাণ্ডারে তিনি দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিবিলিয়ান। বিনয়ে, সৌজন্যে, সাধুতায় তিনি সর্ব্বপ্রকারে পিতৃ পিতামহের অনুরূপ। গত ১৩২৯ সালে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দেবী নিজের, ভাসুর ও দেবর পুত্র-কন্যাগণকে বঙ্গসাহিত্য সেবায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য "বালক" পত্রের অনুষ্ঠান করেন ও অনেকদিন তাহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সম্পাদক। তিনিও বঙ্গসাহিত্যের একজন লেখক। সকুয়া পুষ্প, মহাভারত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ সুরেন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পরিচায়ক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবিকা। বাগ্দেবীর পাদপদ্মে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া অধুনা যে সমস্ত বিদুষী নারী বিদ্বজ্জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইন্দিরা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতমা। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। ইহার সহিত সবুজপত্রের বিখ্যাত সম্পাদক, হাইকোর্টের সুপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, হরিপুরের জমিদারবংশীয় শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার ন্যায় চরিত্র ও শিষ্টাচারে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই তিন পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যাগণের মধ্যে হরিপুর জমিদারবংশীয় স্বনামধন্য সার আশুতোষ চৌধুরী কে, টি, মহাশয়ের পত্নী পরলোকগতা প্রতিভাসুন্দরী নিজের সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যে অনন্য সাধারণ গুণপনার জন্য সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও স্বরচিত "আমিষ ও নিরামিষ আহার" নামক পুস্তকের জন্য বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী মনীষা দেবী গীতবিদ্যায় সুপণ্ডিত। তিনি বেদের গান সমূহ ইংরাজী স্বরলিপিতে প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমুলারের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যা সুদক্ষিণা দেবী আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বিধবা হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার স্বামী পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদের বিস্তৃত জমীদারী পরিচালনায় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তিনিও একজন উচ্চ দরের লেখক ছিলেন। তিনি "পুণ্য" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতাবলী "হিতেন্দ্র গ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীন্দ্রনাথ হাওড়া মিউনিসিপালিটীর সহকারী সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। এক বৎসর পরে তিনি মিউনিসিপালিটীর সম্পাদক পদে (Secretary) উন্নীত হন। ক্ষিতীন্দ্র নাথও একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি তত্ত্ববিদ্যার সম্যক পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচিত

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিব্যক্তিবাদ অতি সুচিন্তিত গ্রন্থ বলিয়া আদৃত হইয়াছে। 'আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, অধ্যাত্ম ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আলাপ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, আর্ট ও সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্ষিতীন্দ্রনাথের অনেক দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত প্রাচীন পত্রের তিনি এখন সম্পাদক।

৺হেমেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্বরচিত "মুদির দোকান" "পদ্মরাগ" প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানাবিধ প্রবন্ধের জন্য বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। এক্ষণে তিনি শারদা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্পাদকতা করিতেছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৪র্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়স হইতেই মস্তিষ্ক পীড়ায় পীড়িত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺বলেন্দ্রনাথও বঙ্গবাণীর সেবায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। তাঁহার শ্রাবণী, মাধবিকা প্রভৃতি কবিতা ও বহু প্রবন্ধে "সাধনা" পত্র অলঙ্কৃত হইত। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লিখিত ভূমিকা সম্বলিত তাঁহার রচনা "বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অনুবাদে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষায় তিনি সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অনেক সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী গ্রন্থের তিনি বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুগায়ক ও সঙ্গীতানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার বহুবিধ সঙ্গীত সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারত-সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন ও বহুবৎসর তাহার সম্পাদকরূপে তাহার অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্মের—

বিশেষতঃ অভিনয় নৈপুণ্যের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে, প্রথমে 'বীণাবাদিনী', পরে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামক দুইখানি সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি উভয় পত্রেরই সম্পাদক ছিলেন। তিনি, কিঞ্চিৎ জলযোগ, পুরুবিক্রম, সরোজিনী, 'এমন কর্ম্ম আর ক'রবো না' (পরে নাম হয় অলীক বাবু) মানভঙ্গ (পরে নাম হয় পুনর্ব্বসন্ত) ঝাঁসীর রাণী, হিতে বিপরীত, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী, বসন্তলীলা, হঠাৎ নবাব, দায় পড়ে দারগ্রহ, ধ্যানভঙ্গ, ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, এপিক্‌টেটাসের উপদেশ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তর চরিত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী, মালতী মাধব, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, বেণী সংহার, মহাবীর চরিত, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, চণ্ডকৌশিক, নাগানন্দ, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ধনঞ্জয় বিজয়, কর্পূর মঞ্জরী, মৃচ্ছ কটিক, রক্তগিরি ও জুলিয়াস সিজার প্রভৃতি বহু নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটক সমূহ এক-সময়ে মহাসমারোহে বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। তিনি দেশ-বৎসল জাতীয় কবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীত আজিও বঙ্গে সাদরে গীত হয়। তিনি লোকের প্রতিকৃতিও বেশ অঙ্কন করিতে পারিতেন এবং তাহারই ফলে কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর চিত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি প্রবল দেশহিতৈষীণায় অনুপ্রাণিত হইয়া খুলনা-বরিশাল ষ্টীমার লাইন খুলিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাতী কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় ও দুর্দ্দৈববশে লাইন তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ পুত্র সোমেন্দ্রনাথও বহুদিন যাবৎ মস্তিষ্ক পীড়ায় আক্রান্ত থাকায় বিবাহ করেন নাই এবং প্রায় তিন বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ভারতগৌরব, কবি সম্রাট
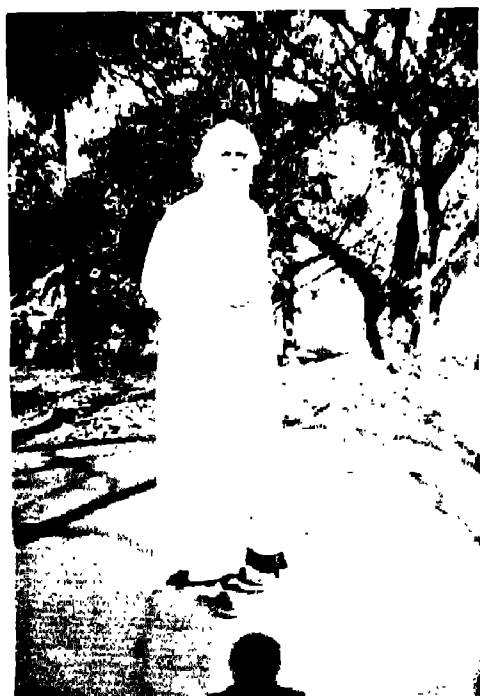
ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডাক্তার স্যার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর কে-টি মহোদয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ চিন্তাশীল, প্রকৃতির উপাসক, ভাবুক, মনস্বী, ভক্ত, সাধক ও বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি।

ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ স্কুলের ধরাবাঁধা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কোন দিন কোন স্কুল কলেজে পড়েন নাই, তত্রাচ তাঁহার সমগ্র জীবনটা ছাত্র জীবন। রবীন্দ্রনাথ আইন অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন, কিন্তু স্বভাবের সৌন্দর্য্য অধ্যয়ন করিয়া বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক হওয়াই যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, তিনি কি সামান্য আইনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যৌবন সুলভ প্রেমের কবিতা লিখিতে থাকেন, কিন্তু পঞ্চত্রিংশ বৎসর অতিক্রম করিলে তাঁহার এই লৌকিক প্রেমের স্রোত অলৌকিক প্রেমের দিকে প্রধাবিত হয়—ফলে তিনি তত্ত্বপূর্ণ দার্শনিক কবিতা সমূহ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাকবি এ পর্য্যন্ত ভারতে—শুধু ভারতে কেন সমগ্র ভুবনে জন্ম পরিগ্রহ করে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিজ্ঞ, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার—ভারতের গৌরব স্তম্ভ। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিণার নিদর্শন তদীয় সঙ্গীত সমূহের প্রতি ছত্রে নিবদ্ধ। বোলপুর শান্তি নিকেতন তাঁহার নির্জ্জন সাধনার ভূমি। এইখানেই সহস্র সহস্র ছাত্র প্রাচীন রীতি-নীতি অনুসারে শিক্ষা লাভ করিতেছে।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র নাথ বিশ্ব-বিশ্রুত নোবেল্ প্রাইজ লাভ করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন।

রবীন্দ্র নাথের বহুবিধ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। রবীন্দ্র নাথ নোবল্ প্রাইজ্ উপলক্ষে যে ৮০০০ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন তাহা বোলপুর স্কুলের উন্নতিকল্পেই প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, লিট্, (Doctor of literature) উপাধি প্রদান করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। পঞ্জাব জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট সেই সনন্দ প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। রবীন্দ্র নাথ এরূপ স্বজাতির সম্মানপ্রিয় যে কানাডায় অবস্থানকালে যখন তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে তথায় বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, তিনি তখন বলিয়াছিলেন "যতদিন কানাডার অধিবাসিগণ ভারতবাসীকে ব্রিটীশ রাজ্যের সমান অধিকারী বলিয়া বিবেচনা না করিবেন ততদিন আমি কানাডায় বক্তৃতা করিব না।"

রবীন্দ্র নাথের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বভাবের মধুরতা, নম্রতা, ভদ্রতা এবং নিঃস্বার্থপরায়ণতা। তিনি যখন পীড়িত হন, তিনি কাহারও নিকট কিছু না বলিয়া শান্তভাবে পীড়ার যন্ত্রণা সহ্য করেন। যে কেহই তাঁহার নিকট পত্র লেখেন, রবীন্দ্র নাথ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন।

চরিত্র বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষ অতি বিরল। যৌবনে তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপরাশি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার উন্নত প্রশস্ত ললাট, দোদুল্যমান শ্মশ্রু, জলন্ত নেত্রদ্বয় দর্শন করিলেই তাঁহাকে একজন ভগবদ্ভক্ত চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা তাঁহাকে কখনও দেখে নাই, তাহারাও ধারণা করিতে পারে। রবীন্দ্র নাথ সুগায়ক, গান করিতে করিতে অনেক সময় তিনি এমন তন্ময় হইয়া পড়েন যে প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত তিনি কেবল গানই করেন। মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য মাত্র এক ঘণ্টা বিশ্রাম লন। রবীন্দ্রনাথ সন্তরণ করিতে ও নৌকার দাঁড় টানিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। গৌরবের যেরূপ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে লোকে সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া সাধারণের করতালি গ্রহণ করে,

রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ গৌরব-কিরীটী বিমণ্ডিত হইয়াও বোলপুর শান্তি-নিকেতনে নির্জ্জন জীবন যাপন করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন।

প্রতিভা।

প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের শুভ সম্মিলনেই রবীন্দ্র নাথের প্রতিভা নিহিত। তিনি ভারতের জাতীয় মন্ত্রের পুরোহিত হইলেও ইংরাজী শিক্ষার প্রতিকূল মত কথনও প্রচার করেন নাই। কিংবা পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান হইতে ভারতকে বঞ্চিত হইবার পরামর্শও দেন নাই। রবীন্দ্রনাথ জন সাধারণের কবি, শুধু এই কারণেই তিনি ভারতের কাব্য জগতে একচ্ছত্র সম্রাটের সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে ও নাটকের নায়ক নায়িকা বীর বা বীরপত্নী রাজপ্রাসাদবাসী ধনীর সন্তান নহে, কিন্তু দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর জাত।

রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে রচনা করিয়াছেন, তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত বাঙ্গালী পাঠক সুপরিচিত।

এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনীতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কাব্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তাঁহার মত ওরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া এ পর্য্যন্ত ভারতে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, কিংবা নানাভাবের এত গ্রন্থও কেহ লিখে নাই।

তাঁহার কৈশোর রচনা জ্ঞানাঙ্কুর, ভারতী ও অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনার তালিকা যতদূর সম্ভব ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাব্য ও কবিতা—বনফুল, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহ, ঠাকুরের পদাবলী, (বনফুল ও ভগ্নহৃদয়, কবি পুনর্মুদ্রিত করেন নাই বা তাঁহার গ্রন্থাবলী ভুক্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার অনেকগুলি কবিতা গ্রন্থাবলীর কৈশোরক অংশে স্থান পাইয়াছে)। সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী সোণার তরী, চিত্রা, বৈতালিক, কণিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, কথা ও

কাহিনী, সঙ্কল্প ও স্বদেশ, শিশু, নৈবেদ্য, স্মরণ, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা পলাতকা, শিশু ভোলানাথ। এই সকল কাব্য ও কবিতা হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত হইয়া 'চয়নিকা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে ইংরাজী গীতাঞ্জলিতে কবি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাহা বাঙ্গলা গীতাঞ্জলির অভিনব অনুবাদ নহে। তাহাতে বাঙ্গালা গীতাঞ্জলি নৈবেদ্য ও খেয়া হইতে পদ্যাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাব্য নাটিকা—কাল মৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভা, (সিন্ধুবধ উপাখ্যান লইয়া কাল মৃগয়া রচিত। তাহা আর পুনঃ মুদ্রিত হয় নাই। তাহার কতকগুলি গীত বাল্মিকী প্রতিভায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল)। প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিদায় অভিশাপ, মালিনী, মায়ার খেলা।

নাটক—রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, মুকুট, শারদোৎসব, অচলায়তন, প্রায়শ্চিত্ত, ফাল্গুনী, রাজা, ডাকঘর, গুরু, অরূপরতন, ঋণশোধ, মুক্তধারা, বসন্ত ও রক্তকরবী।

কৌতুক ও প্রহসন—গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুক, প্রহসন ও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

গান ও স্বরলিপি—ধর্ম্মসঙ্গীত, গান, গীতপঞ্চাশিকা, গীতলেখা, কাব্যগীতি, নবগীতি, নবগীতিকা, শেফালী, কেতকী, বৈতালিক, গীতিবীথিকা ও গীতলিপি।

গল্প ও উপন্যাস—বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, গল্পগুচ্ছ, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে, আটটি গল্প, গল্প, চারিটী, চতুরঙ্গ, গল্প সপ্তক ও লিপিকা।

আত্মজীবনী ও জীবনী—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, জীবন স্মৃতি, ছিন্নপত্র, বিদ্যাসাগর চরিত ও জাপান যাত্রী।

সাহিত্য ও প্রবন্ধ—বিবিধ প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা, বিচিত্র প্রবন্ধ, সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য,

রাজা প্রজা, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সমূহ, স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম্ম, শান্তিনিকেতন, ভক্তবাণী, শিক্ষাপরিচয়, সঞ্চয়, শব্দতত্ত্ব, পাঠ সঞ্চয়, ছুটির পড়া ও ইংরাজি সোপান।

তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন।

রাজনীতি।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যারাধনায় অহোরাত্র ব্যাপৃত থাকিলেও এবং অবসর সময় বোলপুর বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের নৈতিক শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করিলেও, রাজনীতি বিষয়ে তিনি একেবারে উদাসীন নহেন। যখনই দেশে রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বান হয়, তখনই তিনি বীণা রাখিয়া নির্জ্জন স্থান হইতে বহির্গত হইয়া কর্ম্মকোলাহলময় রাজনীতিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হন। শ্রীমতি আনি বেশান্তকে অবরুদ্ধ করায় গবর্ণমেণ্টের নিন্দনীয় কার্য্যের জন্য যখন সমগ্রদেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন রবীন্দ্রনাথও সেই সময় "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" নাম দিয়া ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে এক ওজস্বিনী ভাষা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

ঐ বৎসরে রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতা কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়, রবীন্দ্রনাথ অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সেই দায় হইতে মুক্ত হন এবং একটি সুন্দর কবিতা কংগ্রেসে পাঠ করেন। মিসেস্ আনি বেশান্ত সেই মহাসভায় সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ইহাতে দক্ষিণ ভারত প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ যাহারা এ তাবৎকাল কেবল রবীন্দ্র নাথের নাম শুনিয়াছে, কিন্তু চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়। ভ্রমণ শেষ হইলে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় লেখনী ধারণ ও শিক্ষা সংস্কারে মন দিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পঞ্জাব জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শ্রবণে রবীন্দ্রনাথের

চিরসৌম্যময় মূর্ত্তি রুদ্রভাব ধারণ করে। তিনি বড় ক্ষোভে পঞ্জাবের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁহার উপাধির সনন্দাদি ভারত সরকারে প্রেরণ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন যাত্রা করিলেন। ডায়ার সম্বন্ধে হাউস অব লর্ডসে যখন তর্ক বিতর্ক হয় তখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন। একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহনান্তর সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ "আমি ডাক্তার রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পঞ্জাবের ব্যাপারে তাঁহার অভিমত কি ?" রবীন্দ্রনাথ অতিমাত্র সঙ্কুচিত চিত্তে বলিলেন, "যে সমস্ত ইংরাজ হতভাগ্য ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া ডয়ার ও'ডায়ারের পাশবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। কিন্তু তিনি ভারতের শাসন কর্ত্তাদের ব্যবহারে লজ্জিত, দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। যে শাসকের জাতি ভারতীয়দিগকে এত ঘৃণা করে তাহাদের নিকট হইতে কোন অনুগ্রহ পাইবার আশা ভারত-বাসী করিতেই পারে না। রবীন্দ্র নাথ আরও বলেন, আমরা আমাদের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া, আমাদের সামাজিক শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও অর্থনৈতিক জীবন গঠিত করিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের গভীরতম গর্ত্ত হইতে উঠিতে পারিব। সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য আত্মাহুতি দিতে হইবে। সাম্য ও মৈত্রীর ভাব বৃদ্ধি করিতে হইবে। পঞ্জাবের অত্যাচার ও অবমাননা ত অবমাননা নয়, উহাতে আমাদিগের মঙ্গলই হইবে। ঐ অত্যাচার ছদ্মবেশে বিধাতার আশীর্ব্বাদ। ঐ অত্যাচার হইতে ভারতে এক নবযুগের সৃষ্টি হইবে, ভারতবাসী আত্মসম্মান, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আর্থিক উন্নতিলাভে বদ্ধপরিকর হইবে। দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, ভয় ভাবনা দূরে ফেলিয়া দিয়া আমরা কেবল মাত্র মহত্ত্বের পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব।"

Britain in India নামক পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন—"ভারতবর্ষ পাঞ্জাবের লোম হর্ষণ নরহত্যায় বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইয়াছে। ভারতের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইয়া আছে, ইংলণ্ডের লোক ডায়ার ও'ডায়ারের কি শাস্তি বিধান করে তাহা দেখিবার জন্য। কিন্তু পার্লিয়া-মেণ্ট যদি ডায়ারকে উচিতমত শাস্তি না দেন, তবে ভারতের অবস্থা বড়ই সাংঘাতিক হইবে। ভারতবাসী পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড কখনই ভুলিবে না এবং চিরদিন তাহারা অসন্তুষ্টভাবে থাকিবে। বস্তুতঃ অমৃতসরের কাণ্ডে ভারতবাসী ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে এবং শাসনসংস্কারে তাহাদের বিরক্তি দূর করিতে সমর্থ হইবে না। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সৈনিক বিভাগীয় সভ্যগণ ডায়ারের পক্ষাবলম্বী বলিয়াই বোধ হইতেছে, সুতরাং তাহারা ডায়ারের পক্ষ অবলম্বন করিবে বলিয়াই বোধ হয়। যদি তাহাই হয় তবে ভারতবাসী মনে করিবে যে যখন ব্রিটীশ কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষে যদৃচ্ছা অত্যাচার করিয়া বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পাইতে পারে; তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহাদের দ্বিগুণ অশ্রদ্ধা বাড়িবে।

অমৃতসর।

শাসন সংস্কার।

মণ্টেগু শাসনসংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসিত হইলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,—

"আমি এই শাসন-সংস্কারে বিশেষ প্রীত হই নাই। কারণ ইহা অপ্রাকৃত। এই শাসন-সংস্কার প্রকৃত স্বাধীনতা দেয় নাই, কিন্তু স্বাধীনতার একটু ছায়া মাত্র দিয়াছে। কিরূপে আমরা স্বার্থত্যাগ করিয়া, সমাজের সেবা করিয়া আপনাদের মুক্তির উপায় আপনারাই স্থির করিব আমি তাহাতেই বেশী আগ্রহ করি। এই শাসন সংস্কারের দ্বারা হয়ত ভবিষ্যতে কোন উপকার হইতে পারে, আমি এখন রাজনীতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেও পছন্দ করিব না। আমি হয়ত এ থা বলিয়া অন্যায় বলিতেছি, কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে আরও

অনেক ব্যাপার পড়িয়া রহিয়াছে যাহার দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে বলেন যে, "যদি মিঃ মণ্টেগু ভারতে বড়লাট স্বরূপে যাইতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি শাসন সংস্কার কার্য্যে পরিণত করায় কি কি বাধা তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। ভারতের এংগ্লো ইণ্ডিয়ানেরা শাসন যন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করে না। তাহারা শক্তির পরিচালনা চায়। তাঁহার মতে মিঃ মণ্টেগু ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলে ভাল হইত।

ইংলণ্ড হইতে রবীন্দ্রনাথ নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেখিয়া আমেরিকায় গমন করেন। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে "বিশ্বভারতীর" প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সিলভান লেভি এই বিশ্বভারতীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া চীন ও জাপানে বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। তারপর নিমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায়ও গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র আমেরিকায় যাইয়া কৃষিবিদ্যায় ও তৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সমূহে বিশেষ পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন এবং নিজের জমিদারীর মধ্যে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া নানাবিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষা করিতেছেন। কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অন্যতম পুত্র, হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ জামাতা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। তিনিও আমেরিকা হইতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও 'ভারতীয় কৃষি' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পাঁচ কন্যার মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী বঙ্গ

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

সাহিত্যের একচ্ছত্র অবিসম্বাদী সম্রাজ্ঞী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তিনি বাল্যে পিতৃগৃহে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, অনন্তর বিবাহান্তে স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

"ভারতী" পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াই তিনি বিদ্বৎ সমাজে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বসুমতী সাহিত্য মন্দির তাঁহার রচিত গ্রন্থরাশি অল্প মূল্যে সর্ব্বসাধারণকে উপহার দিতেছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পৃথিবীর বিশেষজ্ঞের ও আদরের বস্তু। স্বর্ণকুমারী আবাল্য মহিলাগণের উন্নতিকামী। তদুদ্দেশ্যে তিনি "মহিলা শিল্প মেলা" নামে একটি মেলা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মললনাকুলের অশেষ প্রকার উন্নতি সাধন করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী স্বর্গীয় জানকী নাথ ঘোষাল (J. Ghoshal) এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী বিধবা হন। ইঁহার একমাত্র পুত্র জেলা জজ শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সহিত ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের রাজনন্দিনী শ্রীমতী সুকৃতি বালা দেবীর শুভ-বিবাহ হয়। স্বয়ং ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড এই বিবাহ উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপঢৌকন দিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা—প্রথমা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী, দ্বিতীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বি-এ। সরলা দেবী স্বনামধন্যা বিদুষী রমণী। তিনি পঞ্জাবপ্রদেশের জননায়ক ৺রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পত্নী এবং সাহিত্য সেবা ও স্বদেশ বাৎসল্যের জন্য ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত একযোগে ভারতী পত্রিকার সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি স্বামী বিয়োগের পর বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ঐ পত্রিকার সম্পাদন ভার নিজ হস্তে লইয়া বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

৺দ্বারকা নাথের কনিষ্ঠ পুত্র ৺নগেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার পিতার সহিত বিলাত গিয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন

৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এবং তাঁহার হৃদয় কোমল ও পরদুঃখ কাতর ছিল। তিনি কিছুদিন কলিকাতায় কাষ্টমস্ হাউসের কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীকে ঐ পদ দেওয়া হইত না। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্র নাথ বিজ্ঞানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজের বাটীতে একটী ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাটারী সাহায্যে নানা দ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিতেন। উদ্যান রচনায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেক ভাল গান রচনা করেন এবং 'বাবুবিলাস' নামে একটী পালা রচনা করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে দুই পুত্র গণেন্দ্র নাথ ও গুণেন্দ্র নাথ ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কলিকাতা মাথাঘসা গলির গাঙ্গুলী বংশের যজ্ঞেশ প্রকাশের বিবাহ হয়। যজ্ঞেশ প্রকাশের পৌত্র বিখ্যাত চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি এখন কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। গিরীন্দ্র নাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নীল-কমল কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়র স্কলার ছিলেন। তিনি গ্রেহাম কোম্পানীর মুৎসুদ্দি থাকায় এবং পোর্ট কমিশনার নির্ব্বাচিত হওয়ায় সাধারণে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। "জমিদার ও প্রজা" নামক পুস্তকে তাঁহার চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যতমা পৌত্রীর সহিত মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে।

গণেন্দ্র নানাবিদ্যায় ও নাট্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের একটি সুন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'গাওহে তাঁহারই নাম, রচিত যাঁহার এ বিশ্বধাম' এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সঙ্গীত ও অন্যান্য ধর্ম্ম সঙ্গীত তাঁহার রচনা। তিনি অকালে কাল কবলিত হন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুণেন্দ্রনাথও সঙ্গীত শাস্ত্রে ও চিত্রকলায় অনুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের দুই ভ্রাতার পুরস্কার ঘোষণায় রামনারায়ণ তর্করত্ন নবনাটক রচনা করেন এবং তাহা ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে ইঁহাদের বাটীতেই অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও দুই কন্যা রাখিয়া গুণেন্দ্রনাথ অকালে পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র ৺ শেষেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনয়নীদেবী ভারতীয় চিত্রকলায় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার সহিত পূর্ব্বোক্ত এটর্ণী মোহিনীবাবুর অন্যতম ভ্রাতা এটর্ণী শ্রীযুক্ত রজনী মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

গিরীন্দ্রনাথের বংশধরগণের মধ্যে গগনেন্দ্র নাথও চিত্রকলার জন্য দেশ প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ বিদেশ-খ্যাত চিত্রশিল্পী।

চিত্রশিল্প ব্যতীত নাট্যাভিনয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটীর অসাধারণ নৈপুণ্যের খ্যাতি 'নবনাটকের' অভিনয় হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া "ফাল্গুনীর" অভিনয় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

চিত্রকলা অধ্যাপনের জন্য যখন বাগেশ্বরী চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হইলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ঐ পদে বরণ করেন। তাঁহার শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, বাঙ্গলার ব্রত, ভারত শিল্প প্রভৃতি পুস্তক ভাষা শিল্পে তাঁহার অনন্য সাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার অন্যতম জামাতা ভারতী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ভাগ্যচক্র, ভারতীয় বিদুষী, মুক্তারমুক্তি প্রভৃতি পুস্তকে মণিবাবু সর্ব্বজন পরিচিত।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ ঠাকুর। তমলুকের মন্দির সংস্কার তাঁহার যত্নে ও অর্থে হইয়াছিল।

রাধানাথের দুইপুত্র মথুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ। ব্রজেন্দ্রনাথ অপুত্রক। তাঁহার এক দৌহিত্রীকে ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় বিবাহ করেন। মথুরানাথের দুই পুত্র শ্রীনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ। শ্রীনাথ ইংরাজী ও সংস্কৃতে কৃতবিদ্য ছিলেন। সঙ্গীতে ও অভিনয় কলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকায় নব নাটক অভিনয় কালে তিনি পরিচালনা সমিতির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। শ্রীনাথের পুত্রদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নীরজনাথ ও শ্রীযুক্ত অক্রনাথ ও শৈলেন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বা স্বরথনাথ এখনও বর্ত্তমান। রাধানাথের এক দৌহিত্রপুত্র ডাক্তার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বহুদিন কাশীতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নীলমণির তিন পুত্র, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। রামলোচন নিঃসন্তান থাকায় রামমণির দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকা নাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। সেই হিসাবে দ্বারকানাথের বংশ জ্যেষ্ঠের বংশ। রামবল্লভ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত বিলাত গিয়াছিলেন এবং পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যশের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। এই নবীন চন্দ্রের পুত্র নলিনচন্দ্র বহুদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে সহকারী কোষাধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামমণির তিন পুত্র রাধানাথ, দ্বারকানাথ এবং রমানাথ ও তিন কন্যা। তাঁহার দৌহিত্রদিগের মধ্যে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বিবরণ ঠাকুর বংশ বিবরণের পর দেওয়া যাইবে। রামমণির অন্যতম দৌহিত্র আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সদর দেওয়ানি আদালতের ও পরে হাইকোর্টের উকিল হইয়া বহুদিন মুর্শিদাবাদে যশের সহিত ওকালতি করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা,

বদান্যতা ও পরোপকার প্রবৃত্তি মুর্শিদাবাদের নবাব ও অন্যান্য ভূস্বামী-বর্গের ও জনসাধারণের নিকট তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল।

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর রাজনীতি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভারতীয় আইন সভার সদস্য পদে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ক্ষেত্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তিনি বিশেষ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। রমানাথ ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার উইলের অন্যতম একজিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং রমানাথ ঠাকুরের পৌত্রেরা প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বিষয় বুঝাইয়া দিয়া কাশীবাস করেন এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন।

মহারাজ রমানাথ ঠাকুর।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজের সিনিয়র স্কলার ছিলেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারও কিছু দিন সম্পাদক ছিলেন। তিনি পিতার জীবদ্দশায় তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্রের নাম শচীন্দ্র-নাথ, হরেন্দ্রনাথ ও বরেন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ কৃতবিদ্য হইয়া এটর্ণির আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে একমাত্র পুত্র শরদিন্দ্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। শরদিন্দ্রনাথও বিদ্যানুরাগী, সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ও পরোপকারী ছিলেন। কিন্তু তিনিও অকালে দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথ একজন বিশেষ সামাজিক, সঙ্গীতজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি দুই পুত্র শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত নিত্যেন্দ্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বরেন্দ্রনাথও সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর গৌরব স্বনাম প্রসিদ্ধ

সঙ্গীতজ্ঞ গোপাল চক্রবর্ত্তী বা নুলো গোপালের একজন গনণীয় শিষ্য ছিলেন। তিনি দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত শেষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত বড়বাজারের সর্ব্বজনপরিচিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ।

দর্পনারায়ণ।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর জয়রামের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি দ্বিতীয় ও নীলমণি তৃতীয় পুত্র ছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ৩য় খণ্ডে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহোদয় যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট দেখিয়া আমরা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, নীলমণি দ্বিতীয় ও দর্পনারায়ণ তৃতীয় পুত্র ছিলেন। দর্পনারায়ণ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি চন্দননগরে ফরাসী সরকারে কার্য্য করিয়া ও বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন নাটোরের জমিদারী স্বত্ব বিক্রীত হইতে লাগিল, তখন তিনি রঙ্গপুরে বিস্তৃত জমিদারী ক্রয় করেন। দর্পনারায়ণের পিতা জয়রাম যে সমস্ত নিঃস্বার্থ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর একখানি 'সনদ' প্রদান করেন এবং তিনি কলিকাতায় যে বাজার স্থাপন করেন, তাহার করভার হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেন। সেই বাজার অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ ভোগ

দখল করিয়া আসিতেছেন। দর্পনারায়ণ দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, যথা—রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও প্যারীমোহন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে লাড্‌লীমোহন ও মোহিনীমোহন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহনকে ও তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণমোহনকে জমিদারীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। যেহেতু তাঁহারা উভয়ে তাঁহাদের গুরুকে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আরও নানাভাবে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চম পুত্র পিয়ারীমোহন মূক ও বধির থাকায় তাঁহার অন্ন সংস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। তিনি গৃহদেবতার পূজার জন্য ৩০,০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করেন এবং জমিদারীর অবশিষ্টাংশ সমানভাবে অপর চারি পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন ও প্যারীমোহনের এক্ষণে বংশাভাব।

দর্পনারায়ণের এক দৌহিত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিপুল অর্থব্যয়ে কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথমে ইউরোপীয় প্রণালীতে পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন এবং Vetearnary Surgeon Dr. Cookএর সাহায্যে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে ভাল ভাল ঘোড়া আনাইয়া যে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন তাহাই উত্তরকালে কুক্ কোম্পানীর আড়গোড়া বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দর্পনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন, ইংরাজী, ফরাসী, সংস্কৃত, পর্ত্তুগীজ, পার্শী ও উর্দ্দু ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের

গোপীমোহন।

অনেক পুরাতন রাজবংশের সম্পত্তি বিক্রয় হইতে লাগিলে তিনি তাহা ক্রয় করিয়া ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি কলিকাতা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রণী ও উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জন্য তাঁহার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্তও এই ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম

পরিচালক মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মূলাজোড়ে তিনি একটী কালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ও প্রত্যহ অতিথি অভ্যাগতগণকে আহার দিবার জন্য বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। তিনি কবি ও গায়কদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন। গোপীমোহনের ছয় পুত্র, সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার. নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। সূর্য্যকুমারের পুত্রসন্তান ছিল না। অযোধ্যার তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র। চন্দ্রকুমার তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে হিন্দু কলেজের একজন গভর্ণর নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সকল সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদানের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। নন্দকুমারের দুই পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ও সুরেন্দ্রমোহন। এই যোগেন্দ্রমোহনের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর প্রচার করেন। কালীকুমার উর্দ্দুতে, সংস্কৃতে, সঙ্গীতে ও তত্বশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার রাজেন্দ্রমোহন নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার বংশ নাই। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এখনও বর্ত্তমান। গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র হরকুমার এবং ষষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমার ভ্রাতাদের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত।

হরকুমার।

হরকুমার দয়া, দাক্ষিণ্য, পাণ্ডিত্য ও সরলতা গুণে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একজন খাঁটী হিন্দু ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সম্মুখে প্রায়ই সংস্কৃত "সপ্তশতী" আবৃত্তি করিতেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। যখন মূলাজোড় কালীমন্দিরে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর একটি শ্লোক অঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করিয়া পারিতোষিক ঘোষণা পূর্ব্বক পণ্ডিতদিগকে শ্লোক রচনা করিতে আহ্বান করেন, তখন নিজের নাম লুকাইয়া অন্য নামে তিনি নিজেই একটী শ্লোক রচনা করেন। পরীক্ষকেরা

স্বর্গীয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর বাহাদুর,

কে, সি, এস আই।

এই শ্লোকই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন এবং সেই শ্লোকই অদ্যাবধি উক্ত কালীমন্দিরের প্রবেশ পথে প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি সংস্কৃত অনুশীলনে বিশেষ আমোদ পাইতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট শিক্ষিত পণ্ডিতেরা অবস্থান করিতেন। তিনি সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণকে মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং সময়ে সময়ে এককালীন দানও করিতেন। তিনি দক্ষিণাচার পারিজাত, হরতত্ত্ব দীধিতি, পুনশ্চরণ পদ্ধতি, শীলাচক্রার্থবোধিনী নামে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে মূলাজোড়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত করেন।

তিনি বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। সে সমস্তগুলি এখনও তাঁহার বাটীতে আছে। তিনি বিখ্যাত গায়কদিগকে সাহায্য করিতেন এবং নিজেও ভালরূপে সেতার বাজাইতে পারিতেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা প্রসন্নকুমার প্রথমে ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তৎপর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহারা তথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। হরকুমার পার্শী ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি ফার্শী ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হরকুমার স্বর্গারোহণ করেন।

হরকুমারের দুই পুত্র—যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চব্বিশ পরগণার জগদল নিবাসী ৺কৃষ্ণমোহন মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা ইংরাজ শিক্ষক তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষা দেন। যতীন্দ্রমোহন সংস্কৃত ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি

যতীন্দ্রমোহন।

বাল্যকাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকর" পত্রে বাঙ্গালা কবিতা ও Literary Gazetteএ প্রবন্ধ লিখিতেন "Flights of Fancy" নামক একখানি ইংরাজী কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া যদিও তিনি তাহা আপন বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, তথাচ তাহা অনেক ইংরাজ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বঙ্গের দেশীয় রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেরূপ অতি অল্প লোকেই করিয়াছিল। তিনি শুধু বঙ্গীয় রঙ্গালয় সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; নিজেও অনেক নাটক রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে "বিদ্যাসুন্দর নাটক" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেলগাছিয়া ভিলায় পাইকপাড়ার রাজাদের সহযোগিতায় এবং কলিকাতায় তাঁহার নিজের বাটীতে তাঁহার যত্নে ও ব্যয়ে যে সমস্ত সখের থিয়েটার হইয়াছিল, সেই সমস্ত হইতেই প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের উৎপত্তি। কিন্তু মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের উদ্যম ও অধ্যবসায় শুধু দেশীয় রঙ্গালয়ের ও নাট্যকলার উন্নতিতেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন এবং এজন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য" তাঁহারই উৎসাহে রচিত এবং তাঁহারই অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি যদি অর্থ সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আজ সাহিত্য জগতে পরিদৃষ্ট হইত না। মহারাজা বাহাদুর নিজেও সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা গান আছে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ তাঁহাকে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। যতীন্দ্রমোহনকে সনদ প্রদানকালে তদানীন্তন ছোট লাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বলেন—

* * * * * you have proved yourself worthy of it by your own merits, your great intelligence and

ability, distinguished public spirit, high character, and the services you have rendered to the state, deserve a fitting recognition."

অর্থাৎ আপনি স্বীয় গুণে এই উপাধি লাভের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আপনার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা, সাধারণ কার্য্যে উদ্যম, আদর্শ চরিত্র, এবং সরকারের যে উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি এই উপাধি পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় লাট সভার সভ্য ছিলেন। শাসন পরিষদে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে স্যার জর্জ্জ কাম্বেল পুনরায় তাঁহাকে সভ্য পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের উপর ভারত ও বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩।৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেহার দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত পরামর্শ করেন এবং পার্লামেণ্টের কমন্‌স্ সভার সিলেক্ট কমিটীতে ভারত সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজা তাহাতে সম্মত হন নাই।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন তাঁহার মেদিনীপুরের প্রজাবর্গের সাহায্য কল্পে যথেষ্ট টাকা দান করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ৪০,০০০ টাকা কর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন দীনদুঃখীর চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। চৌরঙ্গী হইতে মেও নেটিভ হাঁসপাতাল যখন পাথুরিয়াঘাটায় ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে স্থানান্তরিত হয়, তখন মহারাজা জমি দান করিয়াছিলেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১২,০০০, টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এই টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তি প্রতি মাসে তাঁহার পিতা হরকুমার ঠাকুর ও অন্যটী তাঁহার খুল্লতাত মাননীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস্, আই মহোদয়ের নামে দেওয়া হইয়া থাকে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লী দরবারে যতীন্দ্রমোহন "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরই মহারাজা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োজিত হন। তিনি যেরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহার ফলে তাঁহাকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োজিত করা হয়। মহারাজা বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্রের মুখবন্ধের জন্য যে আইন গঠিত হয়, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন আফগানদিগের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে বিবাদ চলিতেছে, তাহাতে যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা না হয় তাহা হইলে দেশে অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইতে পারে, তখন তিনি এই বিলের পোষকতা করিলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন British Indian Association এর সভাপতি মনোনীত ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হইয়া কমিসনে সাক্ষ্য দিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ Companion of the Most Exalted Order of the Star of India, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে Knight Commander of the Star of India উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যক্তিগত গুণের জন্য তিনি "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী বেলভেডিয়ারে একটি দরবার করিয়া তাঁহাকে এই উপাধির সনদ ও খিলাত স্বরূপ একখানি রত্নমণ্ডিত তরবারি উপহার দেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বাহাদুর "মহারাজা" উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। মহারাজা বাহাদুর কলিকাতার Justice of the peace, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সভাপতি,

স্বর্গীয় রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কে, টি, সি, আই, ই

মেওহাঁসপাতালের অন্যতম পরিচালক, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য এবং সেণ্ট্রাল ডফরিণ কমিটির মেম্বর ও ট্রাষ্টি ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এডুকেশন কমিশনের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ও স্যার সৌরীন্দ্রমোহন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর হস্তে একটী ভ্রমণোদ্যান তৈয়ারীর জন্য একখণ্ড জমি দান করিয়া সেই উদ্যান তাঁহার পিতার নামে নামকরণ করিতে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার পিতার মর্ম্মর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন পরম হিন্দু ছিলেন। তিনি আতিথেয়তা গুণে সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। মহারাজের পাঠাগারে বহু দুষ্পাপ্য পুস্তক সংগৃহীত আছে।

মহারাজা বাহাদুর নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার প্রদ্যোৎকুমারকে (অধুনা মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর কে, টি,) দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজের চারিটী কন্যা ছিল। তন্মধ্যে একটিমাত্র এখন জীবিতা। মহারাজের পাঁচটী দৌহিত্র শ্রীযুক্ত কুমুদপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শেষপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জলধিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺কিরণমালী মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে কুমুদপ্রকাশ, নলিনপ্রকাশ ও জলধিচন্দ্র সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহারাজ কুমারের সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, টি, সি, আই, ই, হরকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় তিনি বাল্যে হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন।

বয়স হইতেই সাহিত্যানুশীলনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" নামধেয় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "মুক্তাবলী" নামক একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি শৈশবাবধি পক্ষী পালন ভালবাসিতেন, ইহার ফলে তিনি পারাবত সমূহের স্বর দূর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিয়া দিতে পারিতেন যে কোথায় কোন্ জাতীয় পারাবত ডাকিতেছে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি কালিদাসের "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক প্রসিদ্ধ নাটকেরও বঙ্গানুবাদ করেন।

একজন জর্ম্মন দেশীয় অধ্যাপক প্রথমে তাঁহাকে ইংরাজী সঙ্গীত শিক্ষা দেন। কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহন শুধু কতিপয় সঙ্গীত শিখিয়াই ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান শিখিবার অভিলাষে কাশী, কাশ্মীর, নেপাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি দূর দেশান্তর হইতে সঙ্গীত সংক্রান্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সমূহ ক্রয় করিয়া আনাইয়াছিলেন। দেশে হিন্দু সঙ্গীতের প্রতি লোকের আস্থা ও আকর্ষণ দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে চিৎপুর রোডে Bengal Music School প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে সঙ্গীত শাস্ত্রে অধ্যয়ন অভিলাষিগণকে নামমাত্র বেতন লইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া কলুটোলায় Bengal Music Schoolএর একটি শাখা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিখাইয়া, নানারূপ সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক বিতরণ করিয়া তিনি শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌সরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে যে "Welcome" নামক ইংরাজী সঙ্গীতের দ্বারা

বেলগাছিয়া ভিলায় অভ্যর্থনা করা হয়, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন তাহার বাঙ্গালা সুর সংযোগ করিয়া দেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডফরিণের বিদায় কালে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের Bengal Academy of Music রাজ-প্রতিনিধির সমক্ষে যে গান করিয়াছিল, রাজা সৌরীন্দ্রমোহনই তাহার উদ্যোক্তা ছিলেন। দেশীয় বিদেশীয় বিখ্যাত পর্য্যটকগণ কলিকাতায় আসিলেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহার সংগৃহীত অগণিত বাদ্যযন্ত্র পরিদর্শন করিতেন। জেনারেল ও মিসেস্ গ্রাণ্ট, আর্ক ডিউক লিওপোল্ড, আর্ক ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনাণ্ড, মাকলেনবার্গের ডিউক, লর্ড জর্জ্জ হ্যামিণ্টন, লর্ড এম্থিল, স্যার মনিয়ার ও লেডী এম্থিল, চীন-দূত, রাজা কালীকুমার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন।

ভারতবাসীর মধ্যে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনই সর্ব্বপ্রথম ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Doctor of Music উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই উপাধি প্রাপ্ত হন, বঙ্গ ও ভারত সরকারও তাঁহার এই উপাধি অনুমোদন করেন। রাজা দেশীয় ও বিদেশীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে এত উপাধি, সম্মান ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীবনচরিতে দেওয়া সম্ভব নহে; তথাচ তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

ভারতবর্ষে—Companion of the Order of the Indian Empire উপাধি, রাজা উপাধি, সুবর্ণের শিরপেচ সমন্বিত খিলাত, একখানি তরবারি ও একটি সুবর্ণের ঘড়ি, Certificate of Honour, লর্ড লিটন কর্ত্তৃক স্বলিখিত গ্রন্থরাজি উপহার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, কলিকাতার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, Justice of the Peace পদ, নেপাল হইতে সঙ্গীত শিল্প বিদ্যাসাগর ও ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

আমেরিকায়—Degree of Doctor of Music উপাধি (১৮৭৫ এপ্রিল)।

ইংলণ্ডে—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট হইতে পুস্তক প্রাপ্ত হন। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, রয়াল সোসাইটী অব লিটারেচরের সভ্য।

ফ্রান্সে—প্যারিশ একাডেমীর (কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য) মনট্রিল একাডেমীর প্রথম শ্রেণীর অনারারি মেম্বর।

ইহা ছাড়া পর্ত্তুগাল, স্পেন, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, ইটালী, সুইজারলাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারী, স্যাক্সনী, জর্ম্মণী, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, রুসিয়া, গ্রীস্, তুরস্ক, ইজিপ্ট, আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, জাভা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে তিনি যে কত সম্মান, কত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তাঁহাকে Doctor of Music উপাধি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে লণ্ডনের সুবিখ্যাত "টাইমস" পত্র লিখেন—Convocation this day conferred the degree of Doctor of Music, ***honoris causa***, upon Raja Sir Sourindra Mohon Tagore of Calcutta, in his absence. The Rector of Lincoln stated that the proposal was made to convocation on the ground that by universal consent the Raja is the first Musician and the Principal of the theory of Indian Music among our Indian fellow subjects, and that he has for at least thirty one years devoted his wealth and talents to the development of the Science of Music in his own country. It was proposed to confer the degree ***in***

absentia from the inability of high caste Brahmin to cross the ocean without loss of caste.

তিনি যে সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ প্রভাবের জন্য Most Eminent order of the Indian Empire, রাজা, Knight Bechelor of the United Kingdom of Great Britain and Ireland উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বড়লাট প্রাসাদে যদৃচ্ছা-গমন করিবার ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকেও দেওয়ানী আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া কমিসনে সাক্ষ্য দিবার অধিকার দেওয়া হয়, তিনি সশস্ত্র অনুচর ও পার্শ্বচর রাখিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন এবং দুইটী কামান রাখিবার লাইসেন্সও তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন শুধু যে সঙ্গীতবিদ্যা অনুশীলনেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি গবেষণাপূর্ণ অনেক পুস্তকও লিখিয়া-ছিলেন। তাঁহার "মণিমালা", "ধাতুমালা" পুস্তকদ্বয় সাহিত্যজগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। অশ্বনির্ব্বাচন সম্বন্ধেও ইংরাজিতে তাঁহার একখানি মূল্যবান পুস্তক আছে।

বেলজিয়মের রাজা তাঁহাকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ডায়মণ্ড জুবিলী" উৎসব উপলক্ষে রাজা সৌরিন্দ্র মোহন আপন বাটীতে বিশেষ উৎসব করিয়াছিলেন। এই উৎসবের পুষ্প সমূহ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি 'ভিক্টোরিয়া মাহাত্ম্য' নামে যে পুস্তক লেখেন তাহা ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। সেই পুস্তকে মহারাণী তাহার প্রতিকৃতি সন্নিবেশ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে স্বয়ং ফটোগ্রাফারের সম্মুখে বসিয়া ফটো তুলাইয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ড কলিকাতা আগমন করিয়া তাঁহার জাহাজে রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং রাজাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা

করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে জাহাজ হইতে তোপ ধ্বনি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ সম্রাট প্রথম উইলিয়ম, নেদারল্যাণ্ডের রাজা, গ্রীসাধিপতি, ইটালীর রাজা—সকলেই ইহাকে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম রাজা সৌরীন্দ্রমোহনকে এত ভালবাসিতেন যে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তিনি প্লেগ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করেন, তখন কলিকাতার জর্ম্মণ-কন্সালের দ্বারা সৌরীন্দ্রমোহনের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত রাজা তাঁহার গার্ডেনরীচস্থ প্রাসাদে রাজা সৌরীন্দ্রমোহনকে আমন্ত্রণ করিয়া রজত সূত্রে গ্রথিত মাল্য দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বিভূষিত করিয়াছিলেন এবং সৌরিন্দ্রমোহনের পদ মর্য্যাদার অনুরূপ মুক্তার মালা দিয়া তাঁহাকে বিভূষিত করিতে পারিলেন না বলিয়া সজল নয়নে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডাফরিণ সকলেই রাজাকে সম্মান করিতেন এবং গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে কোন সঙ্গীতাদি হইলেই রাজা স্যার সৌরীন্দ্র মোহনকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন লণ্ডনের Royal College of Musicএ প্রতি বৎসর একজন সুগায়ক ও সুগায়িকাকে সুবর্ণপাদক দিবার জন্য ষ্টেট সেক্রেটারীর মারফতে এককালীন অর্থ দিয়াছিলেন। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাত পত্নী দেবী আনন্দময়ীর নামে ও পিতার নামে ছাত্রগণের জন্য বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নামে গঙ্গাসাগর দ্বীপে একটি পুষ্করিণী খনন ও বরাহনগরে হুগলীর তীরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বরিশালে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি লেডি ডাফরিণ হাঁসপাতাল গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অনেকাংশে বহন করিয়া-

ছিলেন এবং আলবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠ আশ্রমে অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তালতলা বাজার তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বাজারের করভার হইতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ, মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এখনও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺কুমার প্রমোদকুমার পিতার ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কুমার ফরাসী ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার First thoughts on Indian music, Lady Dufferins Waltও এবং Blue Jumna Waltz ইউরোপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার পুত্র—অবনীমোহন ও কৌশিকীমোহন। রাজার দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ বাহাদুর স্যার প্রদ্যোতকুমারকে মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রাজার তৃতীয় পুত্র কুমার নবাব শ্যামাকুমার ঠাকুর। শ্যামাকুমার পারস্যের ভাইস কন্‌শাল, ভারতে পারস্যের শাহের প্রতিনিধি, তাঁহার 'নবাব' উপাধি ছিল। এই উপাধি পারস্যরাজ শাহ-ইন্-শাহ তাঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং রাজা সৌরীন্দ্রমোহনকেও 'নবাব সাজাদা উপাধি দিয়াছিলেন। ইংরাজি ও পারস্য ভাষায় শ্যামাকুমারের ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কথোপকথন করিতে পারিতেন, তাঁহার রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র ও কয়েকটি ভক্তি সঙ্গীত "শ্যামা হৃদয়ং" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার শিশু পুত্র শ্রীমান শক্তীন্দ্রমোহনকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের চতুর্থ পুত্র কুমার শিবকুমার ঠাকুর সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। শিবকুমার অল্প বয়সে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে মহারাজ বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন।

ইনিও শিশুপুত্র শ্রীমান ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীমান প্রবীরেন্দ্রকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

রাজা সৌরেন্দ্রমোহনের চারি পুত্রের মধ্যে এক্ষণে এক মহারাজ বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ব্যতিত আর কেহই জীবিত নাই।

মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর কে, টি, রাজা স্যার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠতাত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন অপুত্রক হওয়ায় তাঁহাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর কে, টি, বাহাদুর।

মহারাজা হিন্দু কলেজে বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে মিঃ ডব্লিউ, এফ., পিককের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইনি British India Associationএর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষে মহারাণীকে লর্ড এল্‌গিনের দ্বারা উক্ত এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দিবার জন্য যে প্রতিনিধিগণ সিমলা শৈলে গিয়াছিলেন ইনি তাঁহাদের নেতা ছিলেন।

ইনিও ইঁহার স্বর্গগত পিতা ও খুল্লতাতের ন্যায় বিজ্ঞান, শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য মুক্তহস্ত। কি সরকারী, কি বে-সরকারী সমস্ত বড় বড় সভাসমিতিতেই প্রদ্যোৎকুমার কর্ত্তৃত্বের আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজভক্তি ঠাকুর বংশের কুল পরম্পরাগত প্রথা। মহারাজ প্রদ্যোৎকুমারও রাজভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই অনন্যসাধারণ রাজভক্তির জন্য তিনি সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র কলিকাতাবাসির প্রতিনিধিস্বরূপ লণ্ডনে আহূত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার বাকিংহাম প্রাসাদে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী এবং যুবরাজ যুবরাজপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তাঁহাকে দরবার পদক প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করেন। মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার

যখন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তাঁহাকে নিজের একখানি তৈলচিত্র প্রদান করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি রোমের মহামান্য পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পান। তিনি পোপ মহোদয়কে ভারতীয় শিল্পজাত কয়েকটি মূল্যবান জিনিষ ও কিছু সুগন্ধি দ্রব্য উপহার দেন। মহামান্য পোপ তাহা সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করেন। ইউরোরোপ ভ্রমণকালে তত্রত্য যাবতীয় অভিজাত সম্প্রদায় মহারাজের সহিত অকুণ্ঠিতচিত্তে আলাপ পরিচয় করেন এবং তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে দরবার উৎসব সমাপ্ত হইলে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, আসাম, ব্রহ্ম এবং সীমান্তবাসীদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতসচিবের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

"We represcntives of the people of India, appointed, in obedience to the wish of our Most Gracious Emperor to attend the august ceremony of his coronation as Ruler of all British realms, beg permission through your Lordship, to approach His Majesty with an expre-ssion of the strong and heartfelt gratitude ; which,with deep emotion filled our hearts as we witnessed the Abbey to day, and to assure His Majesty that, we all felt and experienced, we were indeed the representatives of neraly three hundred millions of people. all of them His Majesty's devoted and loyal subjects in his distant Empire".

"For all these, His Majesty's Indian subjects ; and

for ourselves, we humbly yet fervently express gratitude to Almighty God for His goodness in healing the malady from which our sovereign so sorely suffered, and in restoring him to health ; in rendering our homage to himself, to his throne, and to his family, to give His Majesty who became the Crowned Emperor of this great realm of India, and king of all his other dominions. * * * *

ইংলণ্ডের লর্ড মেয়েরের নিকটও তিনি ঐ মর্ম্মের পত্র প্রেরণ করেন।

তদুত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্ন লিখিতধন্যবাদ সূচক পত্র করেন—

I am accordingly to express the sincere thanks of the Govenment of India for the expressions of loyalty and congratulation conveyed in the letter on behalf of yourself and the people of India whom you represented at the coronation of His Majesty in England.

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন এবং ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বরাবর ২৪শে মে ' Empire Day" উৎসব সম্পন্ন করিয়েছেন।

১৯ ৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২রা মঙ্গলবার মহারাজের জীবনের অতি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ইউরোপীয় ও ভারতবাসিগণ একত্র মিলিয়া কলিকাতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ময়দানে যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যুবরাজকে যেরূপ আড়ম্বরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল এবং সেই উপলক্ষে যেরূপ আয়োজন করা হইয়াছিল তাহার সমতুল্য আয়োজন বোধ হয় এক দিল্লীর দরবার ব্যতীত আর কোথাও হয়

যাই। এই বিরাট অনুষ্ঠানের কৃতকার্য্যতার মূলে মহারাজ বাহাদুর প্রদ্যোৎকুমারের উদ্যম ও অধ্যবসায় নিহিত। তিনিই দেশের জমিদার সম্প্রদায়ের নিকট এই উপলক্ষে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তিনিই এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর প্রদ্যোৎকুমার ও মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর যুবরাজকে গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ হইতে ময়দানে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজের পরিশ্রম ও অকপট রাজভক্তি দর্শনে যুবরাজ তাঁহাকে "নাইট" উপাধি দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলে তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার তাঁহাকে লিখেন --

"I congratulate you on the high honour which His Royal Highness has conferred on you in appreciation of the work you have done in connection with the Royal visit.

ইহা ছাড়া লর্ড কার্জন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতিও তাঁহার নিকট আনন্দসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার সুন্দর আলোক চিত্র (Photograph) তুলিতে পারেন। তিনি ভারতীয় ফটোগ্রাফিক সোসাইটীর (Photographic Society of India) একজন সভ্য এবং ১৮৯০ খৃঃ হইতে ঐ কমিটীর অন্যতম সভ্য। তিনি বিলাতের Royal Photographic Societyরও একজন সভ্য। তিনি রাজকীয় মিউজিয়মের (Imperial Museum) একজন ট্রাষ্টি, অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর চিড়িয়াখানা পরিচালন সমিতির সভ্য। ছয় বৎসর কাল তিনি মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন এবং রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক মহারাণীর স্মৃতিসৌধ (Victoria Memorial Hall) কমিটির ট্রাষ্টি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার যুবা বয়স হইতেই জ্ঞানে বৃদ্ধ। দেখিতে সুপুরুষ এবং কি রাজনীতি কি, সমাজনীতি সমস্ত বিষয়েই সুপণ্ডিত।

স্বর্গীয় অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস্, আই।

অনারেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস্, আই গোপীমোহনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসন্নকুমারের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধুত্ব ও সখ্য হইয়াছিল। ফলে প্রসন্নকুমার একেশ্বরবাদীতে পরিণত হইয়াছিলেন। An appeal to his countrymen নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া তিনি তাহাতে এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নাই, এই মতের পোষকতা করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পিতৃমাতৃ-অনুসৃত পূজার্চ্চনা কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। তিনি মায়ের ব্যবহৃত রৌপানির্ম্মিত খট্টাখানি মূলাজোড় দেবী মন্দিরে প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

প্রসন্নকুমার ধনী ছিলেন, অর্থের কোন অভাব তাঁহার ছিল না। তাহা সত্ত্বেও তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এত ধনৈশ্বর্য্য থাকিতে তুমি আইন পড়িতেছ কেন?" কিন্তু কৃতসংকল্প প্রসন্নকুমার সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। তাঁহার নিজের যে নীলের চাষ ও তৈলের কল ছিল তৎসংক্রান্ত মোকদ্দমায় তিনি আদালতে সুবিচার না পাওয়ায় ভবিষ্যতে নিজের মোকদ্দমা নিজেই চালাইবার জন্য উকিল হইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের কাছে সঙ্কল্পে ও কার্য্যে প্রভেদ ছিল না। তিনি সদর দেওয়ানি আদালতে উকীল শ্রেণীভুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ বিচারকের আগ্রহাতিশয্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ওকালতী করিয়া

বৎসরে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এই টাকার দ্বারা তিনি আপন জমীদারী প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি বালিকা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে রাস্তা দিয়া প্রকাশ্যে মেয়েরা স্কুলে যাইবে কিংবা প্রকাশ্যে স্কুলে মেয়েরা শিক্ষালাভ করিবে এ মতের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি আপন কন্যা ও পৌত্রী দৌহিত্রীগণকে বাড়ীতে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার "অনুবাদক" নামে একখানি বাঙ্গালা কাগজ ও Reformer নামে একখানি ইংরাজী কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এই উভয় কাগজেই তিনি দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ চেষ্টার অন্যতম সহকারী ছিলেন। এই প্রথা তিরোহিত করায় কতিপয় হিন্দু বিলাতে প্রিভিকৌন্সিলে আবেদন করিলে ইংলণ্ডাধিপতি সে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এই জন্য ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ গৃহে রাজাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য যে মহতী সভা আহূত হয়, তিনি তাহার অন্যতম আহ্বানকারী ছিলেন।

১৮৩৭ ও ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বোর্ড অব্ রেভিনিউর সেক্রেটারী মিঃ রস্ ম্যাংগল্স্ লাখরাজ খাজনা পুনরুদ্ধারের জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন এবং তদনুসারে একটি বিশেষ কমিশন বসে, প্রতি জেলাতেই মোকদ্দমা বিচারের জন্য স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টার প্রেরিত হন। ইহাতে সারা দেশময় একটি হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। লাখরাজদার ও জোতদারদিগের নামে যেরূপভাবে ডিক্রী হইতে লাগিল ও টাকা আদায় হইতে লাগিল, তাহাতে সারা দেশময় একটা গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। সরকারী তহশীলদারেরা স্ত্রীলোকদের কাণ হইতে মাকড়ী, হাত হইতে বালা

প্রভৃতি কাড়িয়া লইতে লাগিল। ইহাতে অতিমাত্র বিচলিত হইয়া প্রসন্নকুমার ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া টাউনহলে লাখরাজদিগের একটি বিরাটসভার আয়োজন করিলেন। দেশের সমস্ত স্থান হইতে দলে দলে প্রতিনিধি আসিয়া সভায় যোগদান করিল। সভায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে তাহারা সভায় স্থান না পাইয়া অবশেষে চাঁদপাল ঘাট হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত সারিবন্দিভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সেই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। দ্বারকানাথ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সরকারের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন। চারিদিকে লোকের মুখে একটা উত্তেজনার ভাব পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লর্ড অকলাণ্ড তখন ভারতের বড়লাট। পাছে তাঁহার প্রাসাদ উত্তেজিত জনসঙ্ঘ দ্বারা আক্রান্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি বহুসংখ্যক পুলিশ প্রহরী প্রেরণ করিলেন। তাহারা লাট প্রাসাদকে রক্ষা করিতে লাগিল। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর সভার কার্য্য বিবরণী বড় লাটের নিকট আসিতে লাগিল। এই সভার ফলে তৎক্ষণাৎ বড়লাট এক সার্কুলার জারী করিয়া ৫০ বিঘার কম যে সমস্ত নিষ্কর জমি আছে তাহার কর লইবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চারিদিকে প্রসন্নকুমারের জয় জয়কার পড়িয়া গেল।

প্রসন্নকুমার কেবল জাতীয় উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহার অতুল কর্ম্মময় জীবনের স্রোত চতুর্দ্দিকেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার শুঁড়ার বাটীতে তিনি একটি সখের থিয়েটার খুলিয়াছিলেন। সেই থিয়েটারে উইলসন কর্ত্তৃক অনূদিত "উত্তর রামচরিত" এবং "জুলিয়স সিজর" অভিনীত হইত।

দানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ শতাধিক দরিদ্র লোক ও স্কুলের বালকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। দরিদ্র, নিঃস্ব ভদ্র পরিবারেও তাঁহার অল্পাধিক দান ছিল। তিনি পরিচারক, পরিচারিকা-

গণের চিকিৎসার ব্যয় নিজেই বহন করিতেন। তিনি "মেও নেটীভ হাঁসপাতালের" অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে গরাণহাটা শাখা ঔষধালয় এতদিন উঠিয়া যাইত। দেশের শিক্ষিত অধ্যাপক পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাঁহার যে কতদূর অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহার পাঠাগার দর্শন করিলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ এই পাঠাগারে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ পর্যান্ত পুস্তক পাঠ করিতে আসিতেন।

তাঁহার রচিত বিবাদ চিন্তামণি গ্রন্থের অনুবাদ ও Loose papers প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার জমিদারী কার্য্যের, তাঁহার বিষয় বুদ্ধির ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

তিনি রায়তবর্গের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টান্বিত ছিলেন। নিরীহ প্রজাগণের উপর অত্যাচার হয় বলিয়া তিনি 'পত্তনী' পদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁহার জমিদারী পরিদর্শনে যাইতেন এবং অতি দরিদ্রের সহিত পর্য্যন্ত অকপটচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিতেন। তিনি প্রজাবর্গের উপকারের জন্য দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ঋণ দিতেন এবং অনেক সময় যদি প্রজারা রাজকর অধিক হইয়াছে বলিয়া আপত্তি জানাইত তবে তাহা হ্রাস করিয়া দিতেন।

একদা প্রসন্নকুমার একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া রঙ্গপুরে প্রজাবর্গকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রজারা বলিল, আপনার মত লোকের কি এরূপ কাঠের পাল্কী ব্যবহার করা উচিত? আপনি রূপার পাল্কীতে চড়িলে তবে আপনাকে মানায়। ইহাতে প্রসন্নকুমার ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি রূপার পাল্কী করিবার সামর্থ্য আছে?" এমনই ধারা সরলতা ও বিনয়ে ভগবান তাঁহাকে গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রজারা নিতান্ত নাছোড়বান্দা। তাহারা চাঁদা তুলিয়া রূপার পাল্কী তৈয়ারী করিতে

দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। প্রসন্নকুমার তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া অতি বিনীতভাবে চাঁদাদাতৃগণকে অর্থ ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। তিনি প্রজাবর্গের সুবিধার জন্য বগুড়ার করোতিয়া নদীর সংস্কারার্থে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

লর্ড ডালহৌসীর সভাপতিত্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে একমাত্র যোগ্য লোক বিবেচিত হওয়ায় লর্ড ডালহৌসী প্রসন্নকুমারকে Clerk Assistant to the Council পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার কাশ্মীরাধিপতির আমন্ত্রণে তথায় যাইয়া পঁচিশ দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অনেক সুপরামর্শ দান করেন।

তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠা করান। তিনি British Indian Association এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পর ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মূলাজোড়ের সংস্কৃত কলেজ প্রসন্ন কুমারেরই অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রসন্নকুমার যে যে সদনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম ও দানের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১)	ঠাকুর ল অধ্যাপক পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে	৩,০০,০০০
(২)	District Charitable Society	১০,০০০
(৩)	নেটিভ হাঁসপাতালে	১০,০০০
(৪)	মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ গৃহ নির্ম্মাণে	৩৫,০০০
(৫)	মূলাজোড় দাতব্য ঔষধালয়ে	১,০০,০০০
(৬)	আশ্রিতগণকে	১,০৯,০০০
(৭)	জমিদারীতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের জন্য	১,০৬,০০০
	একুনে	৬,৭০,০০০

ভারত সরকার ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল প্রসন্নকুমারকে সি, এস্, আই উপাধি প্রদান করেন। কি দেশীয়, কি বিদেশীয় সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী, করদ ও মিত্ররাজগণ অথবা সম্ভ্রান্ত পর্য্যটক প্রসন্নকুমারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট প্রসন্নকুমার পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় সাধারণতঃ ইংলণ্ডেই বাস করিতেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহনই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার।

তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র ফণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ও ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। প্রসন্নকুমারের অন্যতম দৌহিত্র যোগেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। এইখানে তাঁহার যত্নেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গালী জনসাধারণ সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথের বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অভিনয় দর্শন করিয়া উচ্চাঙ্গের নাটক ও নাট্যকলার অভিনব সমাবেশে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর।

স্বর্গীয় হরিমোহন ঠাকুর বঙ্গের স্বনামধন্য, বিশ্রুতকীর্ত্তি, মহানুভব ঠাকুর বংশের সমুজ্জ্বল কুল প্রদীপ। তিনি দর্পনারায়ণ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। সমসাময়িক নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনি একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি ছিলেন। Bishop Journal লিখিতেছেন যে ' His family is Brahminical and of singular purity of descent

কার্য্যতঃ সর্ব্ববিষয়ে নীতি এবং সত্যের পরাকাষ্ঠায় তিনি একজন দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাকেই লোকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিত এবং শ্রদ্ধার সহিত সে কথা মানিয়া লইত। ১৮২৪।২৫ খৃঃ অব্দের একখানি গ্রন্থে হরিমোহন সম্বন্ধে রাইট অনারেবল Charles W. Wynn সাহেবের নিকট সেই সময়ের লর্ড বিশপ সাহেবের একপত্রে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র পাওয়া যায়—"Being, however, one of the principal landholders in Bengal, and of a famiiy so ancient they still enjoy to a great degree the veneration of the common people"। বাস্তবিক চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, সাধুতায়, ন্যায়পরায়ণতায়, জিতেন্দ্রিয় হরিমোহনের এতদূর প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল যে এক সময়ে দুইটী বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে হাইকোর্টে জটিল মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় হাইকোর্ট একমাত্র হরিমোহনের সাক্ষ্যের উপর বিচারের সমস্ত ফলাফল ন্যস্ত করেন এবং তাঁহারই মতানুযায়ী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। নৌকোপরি ভাগীরথী-বক্ষে থাকিয়া তিনি প্রত্যহ প্রভাতে লক্ষ হরিনাম জপ না করিয়া কখনও জলগ্রহণ করিতেন না। প্রত্যহ পারিবারিক মন্দির ৺রাধাকান্তের বাটীতে যাওয়ার ক্রটী কখনও তাঁহার হয় নাই। এইরূপে তাঁহার বহুমূল্য জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত হইত; অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারেও তিনি তাঁহার সমকালীন বন্ধু ও বিদ্বানবর্গের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে অবহেলা করেন নাই। তিনি সাধারণের হিতকারী বহু সভা সমিতির সম্প্রদায়শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। Heber's Journal page 183 লিখিতেছেন, "Since I can hardly reconcile in any other manner his philosophical studies and immitation on many European habits with the daily and austere devotion which he is said to practice towards the Ganges, in

which he bathes three times every twenty four hours.) and his veneration for all the other duties of his ancestors!" এতদ্ভিন্ন তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও প্রতিভা নানাদিকে নানাভাবে সর্ব্বদাই পরিব্যাপ্ত ও প্রবাহিত হইত। ইংরাজী ভাষায় হরিমোহনের বিশেষ দখল ছিল। তিনি যেমন একদিকে দেশপ্রিয়, স্বজন বৎসল, দীন-দরিদ্রের প্রাণস্বরূপ, ভালবাসার পাত্র ছিলেন, আবার তদনুরূপ গভর্ণমেণ্টেরও বিশ্বস্ত বন্ধু ও সৌজন্য সমাদরের পাত্র হইয়া অম্লান যশঃ ও অকপট প্রীতি একসঙ্গেই লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ের অনেক পুস্তকে এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। Narrative of the Journey পুস্তকে সেই সাময়িক কলিকাতার লর্ড বিশপ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা হইল (page 59) 'We had afterwards a great dinner and evening party at which were present the Governor General and Lady Amherst, and nearly all our acquaintances in Calcutta. To the latter I also asked several of the wealthy natives......... "Huree mohan Thakur observering "what an increased interest the presence of females gave to our parties" I reminded him that the introduction of women into society was an ancient Hindu custom, and only discontinued in consequence of the Mussalman conquest. He assented with a laugh, adding, however "It is too late for us to go back to the old custom now" হরি মোহন সম্বন্ধে Heber's journal page 229 এ পাওয়া যায়—"He is a fine old man who speaks English well, is well-informed on most topics of general

discussion, and talks with the appearance of much familiarity on Franklin, chemistry, natural philosophy &c....এক স্থলে লিখিয়াছেন Nor the style of his conversation of a character lessd ecidedly European" উক্ত পুস্তকে ২৩০ পৃষ্ঠায় লর্ড বিশপ সাহেব হরিমোহন সম্বন্ধে লিখিতেছেন "I have been greatly interested with the family both now and during our previous interviews. We have several other eastern acquantance, but none of equal talent, though several learned Mohllahs and one persian doctor, of considerable reputed sanctity, have called on me"

ধর্ম্মালোচনায় ও পূজার্চ্চনায় তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। এতদূর তাঁহার ভক্তি প্রাবল্য ছিল যে, কথিত আছে তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ৺রাধাকান্তজীউর বাটীতে একদিন তিনি তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক দর্শনাদি শেষ করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একটী ব্রাহ্মণ ভোগের থালা লইয়া যাইতেছিল, দৈবৎ থালা হইতে একটী প্রসাদী অন্ন প্রাঙ্গনস্থিত নর্দ্দমায় পড়িয়া যায়, সেই সময়ে মেথর নর্দ্দমা পরিষ্কার করিতেছিল। হরিমোহনের প্রগাঢ় ভক্তি, সুগভীর ঈশ্বরানুরাগ তাঁহাকে জাতিভেদ, উচ্চ নীচ ভুলাইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ অস্পৃশ্য মেথরের হস্তধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নর্দ্দমায় ঝাঁট দিতে নিষেধ করিলেন এবং নর্দ্দমা হইতে মহাপ্রসাদ উঠাইয়া দ্বিধাহীন মনেই অমৃতজ্ঞানে তাহা খাইলেন। এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ হরিপ্রেমে তাঁহার জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের উদ্বোধন হইয়াছিল। তাই পরের জন্য দুই হস্তে তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন। হরিমোহনের বিস্তৃত জমিদারী ব্যতীত কলিকাতায় সম্পত্তি ও নীলকুঠী আদিও

ছিল। হরিমোহনের একমাত্র পুত্র উমানন্দনঠাকুর ওরফে নন্দলাল ঠাকুর। নন্দলাল অতুল সুখৈশ্বর্য্যের কোমল ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণে সর্ব্বদাই বিমণ্ডিত থাকিতেন।

[নন্দলাল।]

Heber's Journal page 57এ পাওয়া যায় যে, তাঁহার দান কেবল বাংলার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল এমন নহে, করোমণ্ডল উপকূলের দুর্ভিক্ষের সময়ে উমানন্দঠাকুর ঐ ফণ্ডের একজন অগ্রগণ্য দাতা ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল মনের উপর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতারূপ কালিমার ছায়া কখনও পড়ে নাই। নন্দলালের মাতৃভক্তি চিরস্মরণীয়। সে সময়ে বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের মধ্যে মহিলাদের রেলপথে যাতায়তের নিয়ম ছিল না, অথচ বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রার অভিলাষ নন্দলালের মাতার অন্তঃকরণে বিশেষরূপে জাগরিত হওয়ায় তাঁহার জননীর জন্য নন্দলাল প্রচুর ধন ব্যয় করিয়া দমদমাতে যে দ্বিতীয় বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য জনসাধারণ ও সুহৃদ্বর্গের নিকট আজও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। "গুপ্তবৃন্দাবন" নামেই উহা বিখ্যাত ছিল' "সাতপুকুর" উহার আর একটি প্রচলিত নাম। "গুপ্তবৃন্দাবনে" মনোরম্য উদ্যানাবলীর নির্ম্মাণ কৌশল, মনোমুগ্ধকর শিল্পচাতুর্য্য, মহার্ঘ ধনরত্নরাজি ও পশুশালার দুষ্প্রাপ্য পশুসমূহ সমসাময়িক জগতে চমকপ্রদ ও অপূর্ব্ব বস্তু ছিল। Heber's Journal (page 229) ঐ উদ্যান সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে 'This is more like an Italian villa, than what one should have expected as the residence of Hurree mohan Thakur. The house is surrounded by an extensive garden, laid out in formal parterres of roses intersected by straight walks, with some fine trees, and a chain of tanks, fountains, and summer houses, not ill

adopted to a climate where air, water. and sweet smells, are almost the only natural objects which can be relished durnig the greater part of the year. The whole is little less Italian than the facade of his house but on my mentioning this similarty, he observed that the taste for such things was brought into Inidia by the Mussalmans. There are also swings, whirligigs, and other amusements for the females of his family, but the strangest was a sort of "Montague Russe" of masonry, very steep, and covered with plaster, down which, he said, the ladies used to slide" রামবাগানের দত্ত পরিবারের স্বভাবকবি তরু দত্তের কাব্যেও ঐ বাগান ও পশুশালা সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল, ঐ স্থান কোন সাধারণ কার্য্যব্যপদেশে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। নন্দলালের মাতৃভক্তিরূপ ক্ষীরসিন্ধু হইতেই এই নন্দন সুষমাপূর্ণ "দ্বিতীয় বৃন্দাবনের" সৃষ্টি। মাতৃভক্তির এমন উদাহরণ যেন আমরা ঘরে ঘরে দেখিতে পাই। নন্দলাল অতিশয় সৌখিন ব্যক্তি ছিলেন। অতি সূক্ষ্ম ও দুগ্ধ-ফেণনিভ শুভ্র পরিচ্ছদাদি ভিন্ন তাঁহার সুকোমল সুশ্রী অঙ্গে অন্য কোন প্রকার পরিচ্ছদ স্থান পাইত না। এইরূপে মখমল,মস্‌লিন ও মণিরত্নভূষণে সর্ব্বদা ভূষিত থাকিলেও পরোপকারিতা ও দানশীলতার অভাবও তাঁহাতে ছিল না। বিশুদ্ধ সঙ্গীতালাপের পরিচয় পাইবার জন্য তাঁহার গৃহে গীতাভিজ্ঞের সমাগম হইত। তিনি নিজেও সেতার বাজাইতে পারিতেন ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন।

উমানন্দন ইংরাজী, ফার্শি. উর্দ্দু ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত হিন্দু সমাজের পক্ষ

হইতে বাদানুবাদ ও প্রতিকূলতা করিতেন। "পাষণ্ডপীড়ন" তাঁহার রচনা। এই সভার স্বনামপ্রসিদ্ধ 'সংবাদ-ভাস্করের' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিতেন। সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য তাঁহার এরূপ প্রসিদ্ধি ছিল যে তৎকালে বিলাতে পার্লামেণ্টে কোনরূপ দরখাস্ত করিতে হইলে তাঁহার উপর সেই সকল দরখাস্ত লেখার ভার পড়িত। তিনি তৎকালে ধনীসমাজের মধ্যে সৌখিন লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পরিচ্ছদাদির সেই সময় বহুল অনুকরণ হইয়াছিল। উকিলেরা যে শামলা পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, তাহা তাঁহার প্রবর্ত্তিত। তখন সাধারণ ভদ্রলোকে ব্যবহার করিত বলিয়া আদালতের পোষাকের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তিনি Export Ware-houseএর দেওয়ান ছিলেন।

উমানন্দনের তিন পুত্র;—ললিতমোহন, উপেন্দ্রমোহন ও রজেন্দ্র মোহন। ললিত মোহনের এক পৌত্র শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রমোহন ও অন্য পৌত্র শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

নন্দলালের পুত্র ললিতমোহন কেবলমাত্র এক উদ্দেশ্যেই সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সে উদ্দেশ্য—সঙ্গীত শাস্ত্রের উৎকর্ষ ও উন্নতিসাধন। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান বিশেষরূপে অনুশীলন ও অর্চনা করিয়া সুরের সূক্ষ্ম রূপাদি নানাভাবে ও আকারে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সুন্দর রাজন ছবি তিনি নিজে আঁকিয়া সঙ্গীতের রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। তিনি বেহালা যন্ত্রে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ঐ বেহালা তাঁহার প্রিয় যন্ত্র ছিল এবং তাঁহার বেহালার যশঃ দেশদেশান্তর ব্যাপ্ত ছিল। শুনা যায়, ইউরোপের কোন ধনী ঐ বেহালা পাওয়ার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পান নাই। ঐ যন্ত্র তাঁহারই বংশের এক পরিবারের নিকট আছে। এইরূপ সুর সাধনায়,

ছন্দলালিত্যে, ললিতমোহনের জীবন-সুর চিরদিনের মত বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। ললিতমোহন যদুনন্দন ও রঘুনন্দন নামে দুই পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদুনন্দন বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসীর মত উদাসীনভাবে জীবন কাটাইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই এক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনন্দন নীরবে কর্ত্তব্যপালন ও তাঁহার পিতামহ নন্দলালের অতি দান ও অতি ব্যয়শীলতার অবশ্যম্ভাবী ফলের জন্য যে তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের আয়তন নষ্ট হইয়াছিল, তাহারই উন্নতিসাধনকল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহার অন্যতম গুণ ছিল, স্বজনবর্গের দুঃখে দারিদ্র্যে সহানুভূতি ও সহায়তা করা। অল্প বয়সে বিষয় সম্পত্তি বিভাগ লইয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহার জীবনের সঙ্কল্পই ছিল, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কাহারও পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে মধ্যস্থ থাকিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া। ইহার পুরস্কার ও প্রতিদান স্বরূপ তিনি আর কিছু না পাইলেও প্রিয়জনের অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার সুনির্ম্মল অর্ঘ্য হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না।

পরিমিত সঞ্চয় ও সুনিয়মিত শৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া রঘুনন্দন তাঁহার ষ্টেটকে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার জমিদারীর মধ্যে যত প্রকার শিল্পকার ছিল, তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া প্রথমে সামান্যরূপ এক প্রদর্শনী আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার নিজের ঐকান্তিক দৃঢ় যত্ন ও চেষ্টায় উহা একটী বাৎসরিক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। কিয়ৎকাল পরে ঐ চেষ্টা ও বহু অর্থ ব্যয়ের ফলে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি ঐ প্রদর্শনীকে স্থায়ীভাবে মেলার আকার ধারণ করাইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অনেক লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ মেলা তিনি "হরিঠাকুরের মেলা" বা "পতিরাম

স্বর্গীয় রঘুনন্দন ঠাকুর

ঠাকুর মেলা" নামে অভিহিত করেন। ঐ মেলা অদ্যাবধি হইয়া থাকে। ঐ প্রদর্শনী ১২৭৮ সালে প্রথম আরম্ভ হয়। তিনি যে বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া কত শত শিল্পজীবির ও ব্যবসায়ীর আশ্রয় স্থান হইয়াছে। ঐ মেলার সময় গরু, মহিষ, হস্তী, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পশু ও নানা দেশীয় রেশমী পশমী বস্ত্র, নানাবিধ বাসন, সোণা, রূপার গহনা ইত্যাদি আমদানী হইয়া ব্যবসার বৃহৎ কেন্দ্রস্থল হইয়া থাকে। শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ মেডেলাদিও পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াই তিনি নিরস্ত ছিলেন না। উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত উচ্চ-আদর্শের জমিদার হইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রজাবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দের ও হিতের দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। জমিদারীর হেড্কোয়ার্টার পতিরামে তিনি দাতব্য-চিকিৎসালয় ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারীর অন্যান্য অন্তর্বিভাগে অনেকগুলি এম্, ই, ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত করেন। তিনি পল্লীতে পল্লীতে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন এবং ক্ষেত ও চাষের জন্য অনেক সৎকার্য্যের ভার লইতেন। তিনি হেড্কোয়ার্টার পতিরামে প্রতি বৎসর কয়েক মাস বাস করিয়া জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালন করিতেন এবং সেখানে অবস্থানকালে প্রজায় প্রজায় বা প্রজা ও ষ্টেটের সহিত যে সকল মামলা উপস্থিত হইত তাহা তিনি নিজেই সুবিচার ও বন্দোবস্তের দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়া স্বধর্ম্ম পালনের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। সুতরাং তাঁহার জমিদারীতে সাংবৎসরিক শুভাগমনের প্রতীক্ষায়, প্রজাবৃন্দ তাহাদের দুঃখ ও দারিদ্র্য এবং কলহ-বিবাদের ভার সমস্তই তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও দয়াপ্রবণ সুবিচারকের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারিবে ভাবিয়া আগ্রহে উদ্গ্রীব থাকিত। প্রতি বৎসর কয়েক মাস করিয়া মফঃস্বলে যাওয়া ও মামলাদি আপোষে নিষ্পত্তি করার প্রথা অদ্যাবধি তাঁহার পুত্রের

সময়ও হইয়া আসিতেছে। পতিরামে শ্রীশ্রী৺ রসিকরায় (বিষ্ণুমন্দির) শ্রীশ্রী৺ বিশ্বেশ্বরী (কালীমন্দির) ও যুগল-শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহাদের বংশের ভক্তিপ্রণোদিত ধর্ম্ম-জিগীষু অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধায় বিমণ্ডিত হইয়া দেবসেবার আয়োজন সর্ব্বদাই সুবিহিতরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ঐ দেবালয়ে অনাথ, আতুর, অক্ষম প্রজাবৃন্দের জন্য নিত্য অন্নাহারের ব্যবস্থা ছিল ও অদ্যাপি আছে।

রঘুনন্দন অযোধ্যাপ্রদেশের তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া রঘুনন্দন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনিও ইঁহার পিতা ললিতমোহনের নিকট হইতে সঙ্গীতানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন। গীতানুশীলনে ও উহার পরিপোষণে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গুণীবৃন্দের সমাবেশে তাঁহার সান্ধ্যসভাদি প্রায়ই মনোরঞ্জন ও আনন্দদায়ক হইত। তদ্ব্যতিত ব্যায়াম চর্চ্চাতেও রঘুনন্দন অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য, প্রশস্ত বক্ষ, পীবরবাহু, সুদৃঢ় চরণক্ষেপ ও বলশালী আকার প্রকারই অনুমান হইত।

তাঁহার একমাত্র পুত্র রণেন্দ্রমোহন। সুবিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের মধ্যম দৌহিত্র শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হ্লাদিনী দেবীর সহিত রণেন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়।

রণেন্দ্রমোহনের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলা দেবী। রণেন্দ্রমোহনের পুত্র নাই, কিন্তু তাঁহার পিস্তুতো ভাই শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রণেন্দ্রমোহনের পুত্র অপেক্ষা অধিক ছিলেন। তিনি যদিও রণেন্দ্রমোহন অপেক্ষা ২।৪ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন,কিন্তু তথাপি পুত্ররূপ আচরণ, সময়ে পুত্র অপেক্ষা অধিক আন্তরিক

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর

সেবা ও যত্ন তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রীকে করিতেন। আবাল্য সখ্যতার জন্য আহার-বিহারে ও বিপদ-সম্পদে বন্ধু ছিলেন ও কার্য্যপরিচালন সময়ে সৎপরামর্শদাতা সুহৃৎ ছিলেন। তিনি একাধারে রণেন্দ্রমোহনের ও তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট বহুরূপ ধারণ করিতেন ; অথচ তাঁহার স্বভাব শিশুর ন্যায় সরল ছিল বলিয়া সকল শিশুই তাঁহার খেলার সঙ্গী হইত ও সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং এই সরল, শিশু-প্রিয়, অমায়িক, চিরকুমার সুরেশ রঞ্জনের নিস্পৃহ ও নিঃস্বার্থভাব শিশুদের অজানিত ছিল না। লীলাদেবী শিশুকালে তাঁর বড়দা'র নামে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,তাহাতে সুরেশরঞ্জনের নীরব আত্মত্যাগ একটু আধটু বোঝা যায়। নিম্নে কয়ছত্র তাহা হইতে দেওয়া হইল :—

বন্ধুত্বের নিদর্শন একি এ মহান্ !
ভুলেছ আপন সুখ আপন পরাণ।
তপসী হ'য়েছ তুমি ত্যজিয়া সংসার
তথাপি কর্ম্মের মাঝে কর যে বিহার
যথার্থ সন্ন্যাসী তুমি—পর দুখে দুখী,
নাহি রোষ অসন্তোষ পরসুখে সুখী
বরণ ক'রেছ তাই কৌমার জীবন,
সদাই তুষিত চিত স্বার্থহীন মন।
সার্থক "সুরেশ" নাম হে ত্যাগী অচিন্
নীরবসাধনা তব নীরব বিলীন।
কি দিয়ে শুধিব মোরা এ ঋণ তোমার
প্রেম আর ভক্তি বিনা কি আছে দিবার !

সুরেশরঞ্জন ১৩১৭ সালে ৫২ বৎসর বয়সে ৺ দোলপূর্ণিমার দিন সামান্য কয়দিন মাত্র পীড়িত থাকিয়া মারা যান।

লীলার সহিত ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরীর

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরীর বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী বিলাতের শিক্ষিত একজন আরকিটেক্‌ট (architect); তিনি চিত্রাঙ্কনে ও আলোকচিত্রণে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার অঙ্কিত চিত্র কেবল ভারতীয় প্রদর্শনীতে নয়, ইউরোপীয় প্রদর্শনীতেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পদক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্য কলা-বিদ্যায় তিনি বিশেষ খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী লীলাদেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার অনুগমনে কলা-ক্ষেত্রে যে সকল নব-ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সকল শ্রেণীর শিল্পীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সাহিত্য-জগতেও শ্রীমতী লীলা দেবীর নাম অপরিচিত নহে। জাতীয় ভাষার ও জাতীয় ধর্ম্মের উপর তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল ও আছে তাহা কিছু উল্লেখযোগ্য। আশৈশব বিদ্যানুশীলনে আশ্চর্য্যরূপ উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও এবং পুতুল ও খেলনার পরিবর্ত্তে কাগজ কলম বই (অনেক সময়ে তাঁহার ছেঁড়া টুকরা কাগজই জুটিত) তাঁহার তৈজস পত্র বা সামগ্রী হইয়া থাকিলেও এবং কালিদাস, ভবভূতির কাব্য-পুস্তক তাঁহার জপ তপ হইলেও ঐ সকল প্রাচ্য শিক্ষার সময় তিনি যেরূপ বাধাবিঘ্ন পাইয়াছিলেন, বিজাতীয় ধর্ম্ম সাহিত্য ও ভাব অনুকরণে তাঁহার তেমনি অযাচিত সুবিধা হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বাস অবধিও তাঁহার ভাগ্যে হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দেশের উপর অনুরাগ বা দেশীয় সাহিত্যের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পারে নাই। নব্যযুগের শিক্ষিতা স্ত্রী, চমকপ্রদ সালঙ্কারা সংসার লক্ষ্মীর সহিত মিলিয়া নিজস্ব হারাইয়া থাকেন, তাহার পরিবর্ত্তে শুভ্র-বসনা সাহিত্য দেবীর আশ্রয় লইতে যে ত্যাগ স্বীকার তাহা সামান্য নহে। প্রত্যেক সাধনার সাধারণ কণ্টকাদি সওয়ায় নিক্ষিপ্ত কণ্টকাদি সকল অতিক্রম করিয়া শ্রীমতী লীলা দেবী আরাধ্য মন্দিরের সন্নিধান হইয়াছেন। ভাগ্যসুন্দরী বহুদূর হইতে পারে, কিন্তু তাড়না নীরবে সহ্য করার ফল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী

ইতিমধ্যেই তাঁহার লেখনী হইতে অনেকগুলি রচনা বাহির হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত পুস্তকাকারে প্রস্তুত হইলে অনেকগুলি পুস্তক হইত। উপরোক্ত কারণে ঐ সকল প্রকাশ করিবারও এতদিন অবসর দেয় নাই। তাঁহার বাল্যাবস্থার কতকগুলি কবিতা পড়িয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে, "লীলার কল্পনা-লীলা এবং রচনা-লীলা আমার ভাল লেগেছে।" দুইখানি পুস্তক উপস্থিত প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহার 'কিশলয়' নামক পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া অনারেবল ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই, ই যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেরূপ শিক্ষাপ্রদ তেমনি মনোরম। তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারা গেল না।

আজকাল সাধারণতঃ যে সকল কবিতা প্রকাশ হইতেছে, তাহার অধিকাংশ শব্দচাতুর্য্যের সমষ্টি অথবা বিলাস-লালসার উত্তেজক,—প্রাণে শান্তিপ্রদ মধুর ভাবের অবতারণা হইবার বড় অবকাশ দেয় না। কতকগুলি কবিতা এমনি ভাব-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন যে তাহা প্রহেলিকার নামান্তর মাত্র। আনন্দের বিষয় এই যে শ্রীমতী লীলা দেবীর কবিতাগুলিতে সেরূপ অস্পষ্টতা ও ভাবের "আবছায়া" পরিলক্ষিত হয় না, সর্ব্বত্রই তাহা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণীর ন্যায় কমনীয় লীলাভঙ্গীর সহিত ইঁহার কবিতা সুমধুর কলনাদে প্রবাহিত হইয়া শ্যামল শস্যে ও পুষ্পে ফলে দুই কূল স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ভাষা ও ভাবের মণি-কাঞ্চন সংযোগে তাঁহার কবিতার মধ্যে যে মাধুর্য্য স্বতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কবির বিশেষত্ব বেশ উপলব্ধি করা যায়; বর্ত্তমান যুগে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। বিশ্বপ্রেমে কবির হৃদয় কিরূপ পূর্ণ তাহা তাঁহার "আত্মানুভব" কবিতায় সহজেই উপভোগ্য,—

"আমার যা কিছু হারায়ে গিয়েছে
ফুরায়ে গিয়াছে দানে
ছড়ায়ে গিয়াছে নিখিল ভুবনে
হাজার হাজার প্রাণে।

আমার যা কিছু বিলায়ে দিয়েছি
ভিক্ষা কাতর করে
সুবাসের মত উবিয়া গিয়াছে
সমবেদনার ঝড়ে।
তাই আজ আমি কাঙ্গাল হে স্বামী
শূন্য আমার সব
সবার মাঝারে আমার প্রাণের
পাই আজ অনুভব।"

"সবার মাঝারে আমার প্রাণের পাই আজ অনুভব" এই এক ছত্রে আমরা তাঁহার সাধনার সিদ্ধি-সূচনা দেখিতে পাই; এবং তিনি যে স্বভাব কবি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। "শ্রমণী" "সাকার ও নিরাকার" "নিরদয়," "দৌরাত্ম্য," "সুখ" "বিভ্রম," "তীর্থসঙ্গম" ও "স্বর্ণ" প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার শক্তি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি পৌরাণিক বিষয় লইয়া কবি নূতন ছাঁচে যে আলোকচিত্র দিয়াছেন তাহাও বড়ই মনোরম; "উর্ম্মিলা" "পুরুরবা" প্রভৃতি এই শ্রেণীর। দেশ-মাতৃকার সুন্দর ছবিও বহুস্থানে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার রচনায় ধর্ম্মপ্রবণতা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবহমানা; তাঁহার তুলিকায় কবিজনোচিত প্রাকৃতিক ইন্দ্রজাল ও মায়াচিত্রের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রেখায় রেখায় ঝলমল করিতেছে।

উদারপ্রাণ মুক্তহস্ত প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা ও ব্যবহারবিশারদ দেশনায়ক স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধু শ্রীমতী লীলাদেবী স্বভাব কবিত্বে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার উপযুক্ত, একথা পাঠক, কষ্ট ও ধৈর্য্য স্বীকার করিয়া তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিলেই অকপট চিত্তে স্বীকার করিবেন। বড়মানুষের মেয়ে, বড়লোকের বউ অর্থব্যয় করিয়া বই ছাপাইয়াছেন, আর সহানুভূতি বায়ুগ্রস্ত আত্মীয়
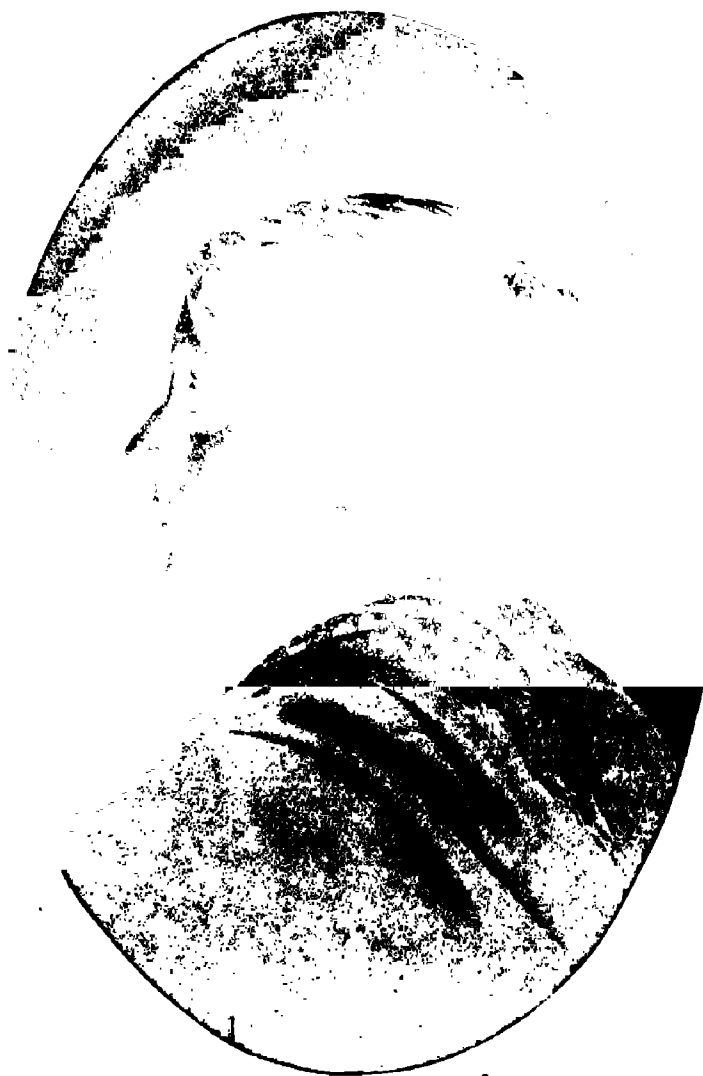
শ্রীমতী লীলা দেবী

বন্ধুগণ উপহার পাইয়া কষ্ট সৃষ্ট প্রশংসার মুষ্টি বিতরণ করিয়া লেখিকাকে ধন্য করিবেন এ দুরাশা এ কবিতাগুলি প্রকাশের কারণ নহে। লেখিকার ন্যায় নিভৃত শান্তি অন্বেষী বিদূষী মহিলা ধনী সংসারে অল্পই দেখা যায়। তাঁহার মর্ম্মস্থানে দারুণ আঘাতে অপূর্ব্ব অমৃতের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে; আঘাত ঘর্ষণ দহন এ অদ্ভুত সৃষ্টির বড় উপযোগী।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যেষামহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ

অন্তর জ্বালায় পরম ঔষধ জ্ঞানে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে কায়মনোবাক্যে শরণ লওয়াই শ্রেষ্ঠ অথচ "শ্রেয়ঃ" ব্যবস্থা বুঝিয়াছেন। এ কবিতাগুলি সে সমর্পণের ফল। পাঠক তদ্গতচিত্তে পরম সুখানুভূতি লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

প্রচলিত শ্রেণীর আবর্জ্জনা এ কবিতাবলীর মধ্যে স্থান পায় নাই। সাহিত্যানুশীলনের নামে শীলতার উপর যে নিত্য পদাঘাতের আয়োজন হইতেছে, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ভাষা ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া যাদুকরীর ব্যবস্থা হয় নাই, ঘন "স বুজ" ছায়ার সান্নিধ্যেও এ প্রলোভন ত্যাগ বড় সহজ সংযমের চিহ্ন নহে।

সংযম, সারল্য ও স্বাভাবিকতা এ কবিতাগুলির মূল মন্ত্র। ইহাই কবিতাগুলির বিশেষত্ব। চর্ব্বিত চর্ব্বনের চেষ্টামাত্র নাই, গতানুগতিক ভাবের সম্পূর্ণ বর্জ্জন হইয়াছে। যাহা মনে আসিয়াছে তাহা লিখিয়াছেন; তাহা বলিয়া যথেচ্ছ লিখেন নাই। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আজ গদ্যে, পদ্যে, গদ্যে-পদ্যে ও পদ্যে-গদ্যে বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্য ও সমাজের যে সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহার কণামাত্রও এ কবিতাগুলিতে স্থান পায় নাই। ভাবের খাতিরে ভাষার বলিদান হয় নাই, ভাষার অনুরোধে ভাব জগদ্দল "পাথরে চাপা পড়িয়া" পঙ্গু নহে। অথচ সকল কবিতাগুলিই সরল, সহজ, সরস—স্থানে স্থানে "দাঁতের কথা টানিয়া" আনিয়াছে, স্থানে

স্থানে মধুবৃষ্টি করিয়াছে, কবি আপনাকে আপনি চিনিয়াছেন এবং পরকেও "আত্মানুভূতির" সাহায্য করিয়াছেন। মানুষকে মানুষ হইবার পথ দেখাইয়াছেন। পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা সহজ শ্লাঘা ও কম কৃতিত্ব নহে। শ্রীভগবান তাঁহার এই সাধু উদ্যমের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এবং তাঁহার চেষ্টা বহুতর কৃতিত্ব মণ্ডিত করুন, তাঁহাকে উত্তরোত্তর সুনৈপুণ্য দান করুন। ভবিষ্যৎ এই মহিলা—কবির অক্ষয় যশঃ অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

উপেন্দ্রমোহন ৺অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুরকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। অতীন্দ্রনন্দন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার যত্নে কয়লাহাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠাতাদের অগ্রণী নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্ম্মদাস সুর কোন কোন প্রহসনের ভূমিকায় সাধারণের সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হন। অতীন্দ্রনন্দনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺সুখেন্দ্রমোহন পরোপকারী ও রসাভাষী বিশেষ সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি কলিকাতার কটন ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কালিকানন্দন ঠাকুর এখনও বর্ত্তমান। অতীন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ৺গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দুইটি কিশোর পুত্র শ্রীমান হৃদিকানন্দন ঠাকুর ও শ্রীমান কৃত্তিকানন্দনকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রমোহনের একমাত্র পুত্র আনন্দনন্দন ঠাকুর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আনন্দলাভ করিতেন। তিনি "রমণীরঞ্জন" প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মুরারিমোহন ও পৌত্র অতনুনন্দন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন.

স্বর্গীয় সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর

দর্পনারায়ণের পঞ্চম পুত্র প্যারিমোহন অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দর্পনারায়ণের ষষ্ঠ পুত্র লাড্‌লীমোহন শ্যামলাল ও হরলাল নামে দুইপুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লাড্‌লীমোহন

শ্যামলালের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। হরলালের পুত্র ত্রৈলোক্য-মোহন। ইহার পুত্র নটেন্দ্র মোহন ঠাকুর; ইনি একজন সুকবি ও নাট্যকার ছিলেন। ইহাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে জীবিত। ইহাঁর নাম ডাক্তার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি এক্ষণে চাঁদনি সাধারণ চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ।

দর্পনারায়ণের সপ্তম পুত্র মোহিনীমোহন পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর পরগণা ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি কানাই লাল ও গোপাল লাল নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন। লাডলীমোহন এই দুই নাবালক ও বিশাল জমিদারীর ভার লইয়া অতি নিঃস্বার্থভাবে তাহার কার্য্য পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কানাইলাল সাবালকত্বে উপনীত হইয়া যখন লাডলী-মোহনের নিকট হইতে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি দেখেন যে লাড্‌লী মোহন জমিদারীর পরিমাণ অনেক বাড়াইয়াছেন এবং নগদ টাকা কড়িও কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন।

মোহিনী মোহন।

কানাইলাল অমিতব্যায়ী ছিলেন, তাহার ফলে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কাজেই দুই ভাইয়ের সম্মিলিত জমিদারী পৃথক করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। গোপাললাল তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ইদিলপুরে তাঁহার ভ্রাতার অংশ পত্তনি গ্রহণ করেন এবং ঋণের অংশও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে এই ঋণ পরিশোধ

করিলেন। গোপাললাল শুধু যে কেবল এই ক্ষেত্রেই সহৃদয়তা গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি আজীবন বিপদাপন্নের আশ্রয় ও দরিদ্রের বান্ধব ছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র স্বনামধন্য কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

গোপাললালের পুত্র কালীকৃষ্ণ অনুমান ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়নের পর তিনি ডভ্‌টন্ কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকায়, তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং বাটীতে সুদক্ষ ইংরাজ গৃহ-শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন। বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলে কালীকৃষ্ণ আপন জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুতঃ তাঁহার মত প্রজাহিতৈষী জমিদার তৎকালে বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিল।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয় আপন পুত্রের বিবাহে যথেষ্ট দান করিয়াছিলেন। যথার্থ অভাবগ্রস্ত তাঁহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হইত না। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনেক টাকা দান করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার দুই পুত্র—শরদিন্দ্রমোহন ও শৌতীন্দ্রমোহন উভয়েই পরলোক গমন করেন। শৌতীন্দ্রমোহন নিঃসন্তান ছিলেন; শরদিন্দ্রমোহন তিন কন্যা ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া যান। তন্মধ্যে দুইজনের সহিত কাশ্মীরের ভূ-পূর্ব্ব জজ ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁহার বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

চোর বাগানের ঠাকুর বংশ।

এ পর্য্যন্ত ঠাকুর বংশের যতগুলি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই শাখার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এমন কি, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার কাহারও কাহারও ধারণা যে চোরবাগানের ঠাকুরেরা পৃথক বংশ। কিন্তু স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দলিলাদি দৃষ্টে যে সকল প্রমাণ ও চোরবাগানের ঠাকুর বংশের রক্ষিত বংশ তালিকার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উক্ত খগেন্দ্র বাবুর সৌজন্যে আমাদের দেখিবার সুযোগ হওয়ায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, জোড়াসাঁকোর, কয়লাহাটার, পাথুরিয়াঘাটার এবং চোর-বাগানের ঠাকুরেরা সকলেই এক বংশসম্ভূত। যখন জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটা ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদিগের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চানন কলিকাতায় আসেন, তাঁহার সহিত প্রায় সমান বয়ঃ তাঁহার পিতৃব্য শুকদেবও আসিয়া কলি-কাতায় বাস করেন এবং একই কারণে তাঁহাদেরও "ঠাকুর" উপাধি লাভ হয়। তখন তাঁহারা এক সংসারভুক্ত ছিলেন। এই শুকদেবের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে পঞ্চাননের পিতৃব্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর চোরবাগানে গিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবাগান তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তীকালে এই কৃষ্ণবাগানে অনেক তন্তুবায় বাস করিয়া বস্ত্র শিল্পের উন্নতি করায়, কলিকাতার মধ্যে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন এবং ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য নিজে অনেক নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহারপুত্র তাঁহার জীবদ্দশায় গত হন এবং শিশু পৌত্র রামরতন ঠাকুরকে রাখিয়া তিনি পরলোকে গমন করেন।

রামরতন ঠাকুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেকালের কলিকাতার ধনীসমাজে দান ও পরোপকারের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এই রামরতন ঠাকুরের নাম ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত কোন কোন ঠাকুর গোষ্ঠীর বংশলতায় নীলমণির পুত্র বলিয়া দেখান হইয়াছে। এরূপ উল্লেখ যে ভ্রান্তিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ রামরতন, নীলমণি ও দর্পনারায়ণের ভ্রাতৃপর্য্যায়-ভুক্ত। রামরতনের পাঁচ পুত্র, হরচন্দ্র, রাজীবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, তিলকচন্দ্র এবং মধুসূদন। ইঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য ও সামাজিকতার জন্য তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। হরচন্দ্রের পুত্রসন্তান হয় নাই, তাঁহার অন্যতম দৌহিত্র মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকিল হইয়াছিলেন; পরে সবজজ হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যশের সহিত কার্য্য করিয়া পেন্সন ভোগ করেন। ইনি অবসর লইয়া কাশীতে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শশিভূষণ কলিকাতা ছোট আদালতে ওকালতি করিতেন। হরচন্দ্রের অন্যতম কন্যাকে পাথুরিয়াঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র অযোধ্যার তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন। রাজীবচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের তিন পুত্র ক্ষেত্রনাথ, যদুনাথ, শ্রীনাথ। তন্মধ্যে ক্ষেত্রনাথ ও যদুনাথ অবিবাহিত অবস্থায় অকালে পরলোকগমন করেন। শ্রীনাথের সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া এক পুত্র হয়। তিলকচন্দ্রের তিন পুত্র, নীলমাধব, বেণীমাধব ও নবীনমাধব। নীলমাধব অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বেণীমাধব কলিকাতার মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তার হইয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে পঞ্জাব-ঝিন্দ হইতে কলিকাতা এবং মেদিনীপুরে নানা স্থানে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর ১৮৬৪ খ্রীঃ তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একটি খেলাত দিয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার এক-মাত্র কন্যার সহিত পাথুরিয়াঘাটার রাজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নবীনমাধব ঠাকুরের পুত্র নিকুঞ্জ-নাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটী পুত্রই এক্ষণে চোরবাগান শাখার স্মৃতি জাগাইয়া কাশীধামে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুনীতকুমার এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ। রামরতন ঠাকুরের সর্ব্বকনিষ্ঠ-পুত্র মধুসূদনের তিন পুত্র। চন্দ্রমোহন, বনমালী ও প্যারিমোহন। বনমালি ও প্যারিমোহন অবিবাহিত অবস্থায় পরলোক গমন করেন। চন্দ্রমোহন মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের এক ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করেন। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এনড্রুলারের একখানি জীবনচরিত বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া তিনি প্রকাশিত করেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়াও নিজেকে চন্দ্র খৃষ্টান বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় প্রদান করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। যখন গৃহবিবাদ ও ব্যবসায়ের নানারূপ ক্ষতিতে এই শাখার দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তখন ইনি শেষ জীবন বরাহনগরে যাপন করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

পর পৃষ্ঠায় কলিকাতার ঠাকুর বংশের বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।

বংশ তালিকা।

ভট্টনারায়ণ
|
নান্নু বা নৃসিংহ
|
আদিম
|
প্রভূর্য্য
|
মথ
|
উমাপতি
|
গাভো
|
বিদ্যাধর
|
ধরণীধর
|
তারাপতি
|
পশু বা ধনঞ্জয়

হলায়ুধ
|
বিভু
|
মহেন্দ্র (বড় কুমার) | গুণেন্দ্র (ছোট কুমার)

মহেন্দ্র (বড় কুমার)
|
বিষ্ণু
|
হরি
|
গোবর্দ্ধন
|
মহাদেব

জগন্নাথ (পিরালী কন্যা বিবাহে পিরালী)
সদাশিব
পুরুষোত্তম
হৃষিকেশ
মনোহর
বলরাম
হরিহর
রামানন্দ
মহেশ্বর
শুকদেব (চোরবাগান ঠাকুর বংশ আদিপুরুষ)
পঞ্চানন
জয়রাম
সন্তোষ রাম
(জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটা ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশের আদি পুরুষ)
আনন্দীরাম
নীলমণি
দর্পনারায়ণ
গোবিন্দরাম
রামনিধি
রামতনু
রামলোচন
রামমণি
রামবল্লভ
(জোড়াসাঁকো বংশের আদি পুরুষ)
গৌরহরি
স্বরূপচন্দ্র
রাধাবল্লভ
দ্বারকানাথ (দত্তক)
মদনমোহন
বিশ্বম্ভর
শ্যামসুন্দর
দেবেন্দ্রনাথ
গিরীন্দ্রনাথ
নগেন্দ্রনাথ
১
২

১
২
গণেন্দ্র
গুণেন্দ্র
গগনেন্দ্র
সমরেন্দ্র
অবনীন্দ্র সি-আই-ই
গেহেন্দ্র কনকেন্দ্র নবেন্দ্র সমীরেন্দ্র সুরীন্দ্র ব্রতীন্দ্র অলোকেন্দ্র অরুণেন্দ্র মণীন্দ্র
গীতিন্দ্র
কবীন্দ্র
সুজনেন্দ্র
সুজীতেন্দ্র
দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
সোমেন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথ
সুরেন্দ্র
বলেন্দ্র
হিতেন্দ্র
ঋতেন্দ্র
রথীন্দ্র
ক্ষিতীন্দ্র
সুধীন্দ্র
ক্ষেমেন্দ্র সুভেন্দ্র
সিদ্ধিন্দ্র
বাসবেন্দ্র
সুধীরেন্দ্র
প্রবীরেন্দ্র
মিহিরেন্দ্র
দ্বীপেন্দ্রনাথ অরুণেন্দ্রনাথ নীতিন্দ্রনাথ
সুধীন্দ্রনাথ
কৃতীন্দ্রনাথ
দীনেন্দ্রনাথ অজয়েন্দ্রনাথ
সৌম্যেন্দ্র
স্বরীন্দ্র
রামমণি
রাধানাথ
দ্বারকানাথ (দত্তক প্রদত্ত)
রমানাথ
নৃপেন্দ্রনাথ

মথুরানাথ
ব্রজনাথ
শশীন্দ্রনাথ
হরেন্দ্রনাথ
বরেন্দ্রনাথ
শ্রীনাথ
শৈলেন্দ্র
শরতীন্দ্র
জগদীন্দ্র
নিত্যেন্দ্র
সুরথনাথ
সরিদিন্দ্র
সুজনেন্দ্র
সজনেন্দ্র
অরবিন্দ্র
রতীন্দ্র
সরোজনাথ
অম্বুজনাথ
নীরজনাথ
অব্জনাথ
রমেন্দ্র
অরুণেন্দ্র
দর্পনারায়ণ
রাধামোহন
গোপীমোহন
কৃষ্ণমোহন
হরিমোহন
প্যারীমোহন
লাড্‌লিমোহন
মোহিনীমোহন
কানাইলাল
গোপাললাল
কালীকৃষ্ণ
শরদীন্দ্রমোহন
সৌতীন্দ্রমোহন
প্রফুল্লনাথ
পূর্ণেন্দুনাথ
প্রবোধেন্দুনাথ
প্রশান্তনাথ
প্রভাতেন্দু
কুণালেন্দ্র
শ্যামলাল
হরলাল

ভুবনমোহন ত্রৈলোক্যমোহন

নরেন্দ্রনাথ

রথীন্দ্র সুনীথনাথ

মোহনলাল মদনলাল

উমানন্দন

ললিতমোহন উপেন্দ্রমোহন ব্রজেন্দ্রমোহন

অতীন্দ্রনন্দন (দত্তক) আনন্দনন্দন

যদুনাথ রঘুনাথ

মুরারীমোহন

সত্যেন্দ্রমোহন রণেন্দ্রমোহন সুরেন্দ্রমোহন গোপেন্দ্রমোহন

অতুলনন্দন

কালিকানন্দন

হৃদিকানন্দন কৃত্তিকানন্দন

কেতকীমোহন

যোগেন্দ্রনন্দন কৌশিকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণনন্দন উমানন্দন

সুনীতীন্দ্রমোহন ব্রহ্মমোহন শঙ্করমোহন দক্ষিণামোহন

সূর্য্যকুমার চন্দ্রকুমার নন্দকুমার কালীকুমার হরকুমার প্রসন্নকুমার

রাজেন্দ্রমোহন জ্ঞানেন্দ্রকুমার

সুরেন্দ্রমোহন যোগেন্দ্রমোহন যতীন্দ্রমোহন সৌরীন্দ্রমোহন

প্রদ্যোৎকুমার (দত্তক)
প্রবীরেন্দ্রমোহন
প্রমোদকুমার
প্রদ্যোৎকুমার (দত্তক প্রদত্ত)
শ্যামাকুমার
শিবকুমার
অবনামোহন
কৌশিকীমোহন
শক্তীন্দ্রমোহন
ক্ষেমেন্দ্রমোহন
প্রদীপ্তমোহন
সুদীপ্তমোহন
শুকদেব
কৃষ্ণচন্দ্র
পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত)
রামরতন
রাজীবচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
মধুসূদন
ক্ষেত্রনাথ
শ্রীনাথ
চন্দ্রমোহন
বনমালী
প্যারিমোহন
সুরেন্দ্রনাথ
নীলমাধব
বেণীমাধব
নবীনমাধব
নিকুঞ্জনাথ
সুনীতকুমার
সুমাধব
নৃপেন্দ্রনাথ
পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত)

বলিহার রাজবংশ।

ওঝা উপাধিক দামোদরের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রাম নাথ, কনিষ্ঠ অনন্ত; এই অনন্তের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ বলিহারের বর্ত্তমান জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু রায়। দামোদরের প্রথম পুত্র রাম নাথের বংশধরগণ অধুনা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মুক্তাগাছার এবং ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর এবং বরিশালের অন্তর্গত বাঁকাই ও রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় বাৎস্য গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ নিরাবিলপটীর কুলীন।

বিমলেন্দুর ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষ অনন্তের প্রথম প্রপৌত্র রামদেবের বংশধরগণ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সমস্পাড়া ও খাজুরা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। অনন্তের চতুর্থ প্রপৌত্র গোপালের বংশেই বিমলেন্দু জন্মগ্রহণ করেন, এই গোপালের পিতার নাম নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী। এই নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী বলিহারের তদানীন্তন জমিদারদিগের বংশের জনৈক দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া বলিহার পরগণার অধীনস্থ কুড়মৈল (Kurmail) গ্রামের একাংশ তালুকী স্বত্ব লাভ করিয়া ঢাকা-বিক্রমপুর হইতে বলিহার আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এই নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী সান্ন্যাল উপাধি প্রাপ্ত হন। নৃসিংহের চতুর্থ পুত্র গোপাল। গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকান্ত। রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্রের শাখায় বিমলেন্দু রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই রামচন্দ্র সান্ন্যালই মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার হইতে তাঁহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন, উপাধির নিদর্শন স্বরূপ বাদসাহী পাঞ্জা এখনও বলিহার রাজগৃহে বর্ত্তমান আছে। এই বংশ রায় বংশ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। রামকান্তের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ দাস সুপ্রসিদ্ধা রাণী সত্যবতীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া রঙ্গপুর জেলার অধীন স্বরূপপুর

পরগণার অন্তর্গত লক্ষ্মণপুরের জমিদারী যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাঁহারই বংশধরগণ লক্ষ্মণপুরের বর্ত্তমান জমীদার। দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণের এবং তৃতীয় পুত্র রাম রামের বংশধরগণ বলিহার ও ভিতরবন্দের বর্ত্তমান জমিদার। রামকান্তের চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুরামের বংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ তিনি অপ্রাপ্ত বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

রাম রাম উত্তর বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধা রাণী সত্যবতীর এষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তদীয় ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণও ঐ এষ্টেটের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণী সত্যবতী প্রথমতঃ একটী গ্রাম তাঁহাদিগকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন, ঐ গ্রামটী "দেওয়ান জায়গীর" নামে অভিহিত। কথিত আছে, রাম রাম ঐ গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। রাম রাম অতিশয় বুদ্ধিমান, নিরলস, সত্যপরায়ণ এবং কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎকালে অনেক জমিদারই নিয়মিত-ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রেরণ করিতে সক্ষম হইতেন না এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সময়ে সময়ে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। রাণী সত্যবতীর এষ্টেটের দেয় রাজস্ব রাম রাম যথানিয়মে মুর্শিদাবাদ পাঠাইতেন। কোনও দিন এই কাজে তাঁহার কোনরূপ শৈথিল্য না দেখিতে পাইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব নাজিম মোয়াতামান উল মুলুক সুজাউদ্দৌলা নবাব সুজা খাঁ বাহাদুর আসাদজঙ্গ তাঁহার উপর পরম প্রীত হইয়া ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বংশানুক্রমিক "রায় চৌধুরী" সাহেব উপাধি প্রদান করেন।

রাম রাম অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি দিলালপুরে স্পর্শ প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃশ্য সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক ভোগ ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া যান। পূজা প্রতিদিনই ষোড়শোপচারে হইয়া থাকে, বলিও প্রত্যহই হয়। দিলালপুর অঞ্চলে এই দেবী সিদ্ধেশ্বরী

জাগ্রত দেবতা বলিয়া আজও পূজিত। বলিহার ও ভিতরবন্দের জমিদারগণ এ যাবৎ নিয়মিত ভাবে তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক এবং পর্ব্বাদিপূজা রাম নাম কর্ত্তৃক প্রচলিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। বহুলোক প্রতিদিন সিদ্ধেশ্বরীর প্রসাদ পাইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ পর্য্যটক ডাক্তার টেলর সিদ্ধেশ্বরী সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন :—"সিদ্ধেশ্বরী দেবী মন্দির চেকলিনদীর উত্তরপূর্ব্ব পারে অবস্থিত। প্রাচীনকালে ইহা একটী পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বহুলোক এখানে সমবেত হইত এবং ছাগ বা মহিষ বলি দিয়া দেবীর পূজা সম্পন্ন করিত। প্রত্যহ ২৫ হইতে ৫০ টী ছাগ এবং ৫ হইতে ১০টী মহিষ ইহার মন্দির সম্মুখে বলি হইত। এই সকল পশুর রক্ত অপসারিত করিবার জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত প্রণালী বিদ্যমান ছিল। দেবীর পূজার জন্য মন্দিরে ১৮ জন ব্রাহ্মণ ছিলেন ইত্যাদি"।

রাণী সত্যবতী বাহেরবন্দ, ভিতর বন্দ এবং স্বরূপ পুরাদি পরগণার জমিদার রঘুনাথ রায়ের স্ত্রী এবং চাঁদ রায়ের পুত্রবধূ। কথিত আছে, ইনি বিবাহের পর এক বৎসর মধ্যেই বিধবা হন, তাঁহার কোনও সন্তানসন্ততি ছিল না। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলার অন্তর্গত বাহেরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়া, স্বরূপপুর, পাতিলাদহ, ইসলাম বাড়ী, সুজানগর এবং আমবাড়ী এই আটটি পরগণার বিস্তৃত জমীদারীর তিনি অধিশ্বরী ছিলেন। তিনি অতীব মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁহার নাম ও খ্যাতি এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও লোকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ১১৮৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১১৩০ বঙ্গাব্দ হইতে ঐ সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারীর কার্য্য পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপ্রাণ রামরাম রায় মহাশয়ের মন্ত্রীত্বে অতীব দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। রাণী সত্যবতী ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিতরবন্দ পরগণার জমীদারী রামরাম ও তদীয় ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ রায়ের কার্য্যতৎপরতার পুরষ্কার স্বরূপ প্রদান করিয়া

যান। রামকান্তের নামে দান পত্র হইয়াছিল। রামকান্তের দ্বিতীয়পুত্র প্রাণকৃষ্ণ এবং তৃতীয়পুত্র রামরাম উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত ভিতরবন্দ পরগণা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পর রাণী সত্যবতী বর্ত্তমান রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দিলালপুর, আমরুলবাড়ী, বাঘাচারা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি মৌজা প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রায়কে তালুক স্বরূপ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রাণী সত্যবতী ১ ৪০ বঙ্গাব্দে আরও কতকগুলি নিষ্কর সম্পত্তি প্রাণ কৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করেন। এই সকল সম্পত্তি বলিহার রাজ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ গণের রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার জমিদারীর মূল ভিত্তি।

রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ হইতে বলিহার রাজবংশ, এবং তৃতীয় পুত্র রামরাম হইতে ভিতরবন্দের অন্যতম জমিদার বংশের উৎপত্তি। রামচন্দ্রের পুত্র নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের পুত্র রাজেন্দ্র। রামরামের পর ইনি এই বংশে সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজেন্দ্র রায়ই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহিমান্বিতা মহারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা কাশীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে নাটোর রাজসরকার হইতে বগুড়া জেলার অন্তর্গত ডিহি দারীগাছা ও চুপিনগর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ডিহি চন্দননগর ও সিপুরা, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালগোলা ডোমকল ও মৃদাৎপুর প্রভৃতি এবং পাবনার অন্তর্গত পিদিরপুর প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হন। লালগোলার প্রজাগণ মহারাণী ভবানীর প্রজা ছিল। এই অহঙ্কারে রাজেন্দ্রের প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন না করায় তিনি উহা হস্তান্তরিত করেন। পত্নী মহারাজ কুমারী কাশীশ্বরী দেবীর গর্ভে রাজেন্দ্রের একটি পুত্র এবং শিবেশ্বরী দেবী নাম্নী একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটী শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রাজসাহী জেলার অধীন খাজুরা নিবাসী কাশীপ্রসাদ লাহিড়ীর সহিত কন্যা শিবে-শ্বরীর বিবাহ হয়। ইহাদের বংশধরগণ অধুনা খাজুরাও পুঠিয়াতে বাস

করিতেছেন। কাশীশ্বরী দেবীর পরলোক গমনের পর রাজেন্দ্র রায় যথাক্রমে উমাময়ী ও আনন্দময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। উমাময়ীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়া অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। অন্য কোন পুত্রসন্তান না জন্মায় এবং পত্নী উমাময়ীও পরলোক গমন করায় রাজেন্দ্র তদীয় অন্যতমা পত্নী আনন্দময়ী দেবীকে তাহার মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া যান। রাজেন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা এবং দেবতার প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বলিহারে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পিত্তল নির্ম্মিত দশভুজা রাজরাজেশ্বরী দেবী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার দৈনিক পূজা, বলি ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া যান এবং তাঁহারই ব্যবস্থানুসারে তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণ যথাযথভাবে অদ্যাপিও উক্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন। এই রাজরাজেশ্বরী দেবীর নিত্য ও পর্ব্বপূজাদি উপলক্ষে বৎসর বৎসর বহুটাকা রাজসরকার হইতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র রায় মহাশয় ইহার সেবা পরিচালনের জন্য পৃথক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেবা পরি চালন জন্য নায়েব মোহরার, পুরোহিত, পরিচারক, চাকর চাকরাণী প্রভৃতি অনেক লোক নিযুক্ত আছে। প্রতিদিন ভোগ ও বলির বিহিত ব্যবস্থা আছে। ভোগের প্রসাদ দ্বারা অনেক লোকের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। অতিথি, অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ ও ইতর জাতীয় নানা শ্রেণীর লোক অন্ততঃ দৈনিক ৬০ জন করিয়া ইহার প্রসাদ দ্বারায় প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। রাজেন্দ্র রায় মহাশয় এতদ্ব্যতীত দুইটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। লক্ষ্মীনারায়ণ গণেশাদি আরও অনেক দেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাহাদের পৃথক পৃথক পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া যান। এই সকল দেবতার প্রসাদও যথানিয়মে অতিথি অভ্যাগতের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। ১২২৬ বঙ্গাব্দে উক্ত রাজেন্দ্র রায় মহাশয় অতি সুদৃশ্য প্রকাণ্ড

একটী পিত্তল নির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে বলিহারে মেলা বসে। নানা স্থান হইতে ক্রেতা বিক্রেতাগণের সমাবেশ হইয়া বলিহারকে কিছুদিনের জন্য সহরে পরিণত করে। যাত্রা, কীর্ত্তনাদি নানাবিধ সঙ্গীতে সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করে, এই উপলক্ষেও বহুলোক খাওয়ান হয়। রথের ৯ দিন ধরিয়া নানারূপ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। বলিহারের রথযাত্রা একটি প্রসিদ্ধ উৎসব। শ্রীশ্রী গোপাল দেবের রথ যাত্রা বলিয়া অভিহিত এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় বলিহার রাজ এষ্টেট বহন করিয়া থাকেন। ইহাতে অপর অংশীদার ভিতরবন্দ জমিদারগণের কোনও অংশ নাই। গোপাল ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত। বলিহার রাজবংশ এবং ভিতরবন্দের জমিদারগণ পালাক্রমে রথ ব্যতীত অন্যান্য পর্ব্ব ও নিত্য পূজার ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গোপাল বাড়ীতেও প্রতি দিন ২৫ জন দরিদ্র নারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। এই রথ ও রাজ-রাজেশ্বরী আজিও রাজেন্দ্রের অচলা কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

১২৩০ বঙ্গাব্দে রাজেন্দ্র রায় মহাশয় মালদহ জেলার অন্তর্গত কানসাট গ্রামে পুণ্যসলিলা গঙ্গাতীরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে ইহ লোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যশোভাতি এখনও বিদ্যমান আছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা পত্নী আনন্দময়ী দেবী পরিত্যক্ত এষ্টেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধি-মতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ইহাঁর আমলে জমিদারীর আয়তন আরও বর্দ্ধিত হয়। জমিদারী কার্য্যে ইনি অতি নিপুণা ছিলেন, দেব দ্বিজেও ইহাঁর ভক্তি অচলা ছিল। ইনি ইহাঁর পরলোকগত ধর্ম্মপরায়ণ পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আনন্দকালী নাম্নী প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি বলিহারে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার দৈনিক পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়

যান। এই দেবতার পূজা এখনও যথা নিয়মে হইতেছে। পুরাকালে পুরাণাদি পাঠ করিয়া সনাতন ধর্ম্মভাব সাধারণে বিস্তারের একটি সুন্দর প্রথা ছিল যাহা অধুনাতন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। আনন্দময়ী লোকের প্রাণে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব প্রনোদনের অভিপ্রায়ে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বহুদিন ব্যাপী মহাভারত পাঠ করান। এই ব্যাপার উপলক্ষে নানাস্থান হইতে বলিহারে শাস্ত্রদর্শী বহু পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। আনন্দময়ীর মহাভারত এখনও সাধারণে একটি প্রচলিত প্রবাদরূপে পরিগণিত হইয়া আছে। আনন্দময়ী তাঁহার পরলোকগত পতির অভিপ্রায়ানুসারে শিবপ্রসাদ রায়কে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বলিহারনিবাসী ত্রিলোচন লাহিড়ী মহাশয়ের কন্যা পরমা সুন্দরী হরসুন্দরী দেবীর সহিত শিব প্রসাদের বিবাহ হয়। শিবপ্রসাদ অপুত্রক অবস্থায় যৌবনের প্রারম্ভেই কালগ্রাসে পতিত হন। আনন্দময়ীর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার জীবিত কালেই হরসুন্দরী কৃষ্ণেন্দ্র রায়কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর।

কৃষ্ণেন্দ্ররায় ১২৪১ বঙ্গাব্দে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জনকের নাম শিবচন্দ্র লাহিড়ী। কৃষ্ণেন্দ্র ১২৫২ বঙ্গাব্দে বলিহারের রাণী হরসুন্দরী দেবীর দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন হয় নাই; তিনি গৃহ শিক্ষকের নিকটই পাঠ সমাধা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পার্শী ভাষাও গৃহে মৌলবীর নিকট শিক্ষা করেন। পার্শী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইংরাজী জ্ঞান তাঁহার অতি পরিমিত ছিল, তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর

বাঙ্গালা গদ্য পদ্য রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অনন্য সাধারণ ছিল। তিনি "এখন আসি" ও "সুখভ্রম" নামক গদ্য গ্রন্থ এবং "সীতা চরিত" নামক পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া তদানীন্তন সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিনামূল্যে অমূল্য উপদেশপূর্ণ ঐ সকল গ্রন্থ লোক শিক্ষার্থ সাধারণে বিতরণ করিতেন; তিনি সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। সুর ও তালে তাঁহার জ্ঞান গভীর ছিল। তিনি গীতাবলী নামে ধর্ম্মভাবপূর্ণ সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহাও বিনামূল্যে বিতরিত হইত। তাঁহার শিক্ষা ও প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি সর্ব্বদা কোননা কোন কাজে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসিতেন। অনলসতা তাঁহার একটী প্রধান গুণ ছিল। অতি প্রত্যূষে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া নিত্য প্রাতঃভ্রমণ তাঁহার অভ্যস্থ ছিল। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন, শিকারে তাঁহার লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল। জেলার ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, বিভাগীয় কমিশনারগণ আনন্দে তাঁহার সহিত ব্যাঘ্রাদি শিকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বহু লোকহিতকরকার্য্য করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা, পূজা ও অর্ঘ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি সামান্য পাঠশালা ব্যতীত বলিহারে অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। তিনিই প্রথম একটী ফ্রি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বলিহারে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি পত্তন করেন। ম্যালেরিয়া এবং নানাবিধ ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধিতে দরিদ্র লোকসকল উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া তিনিই প্রথম নিজনামে একটী এলোপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসালয় বলিহারে স্থাপন করেন। এই চিকিৎসালয় প্রথমতঃ একজন নেটিভ ডাক্তারের অধীন থাকে, ক্রমে উহা এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জেনের তত্ত্বাবধানে আসে। বহু দরিদ্র রোগী এখানে বিনামূল্যে ঔষধ পাইতেছে এবং চিকিৎসিত হইতেছে। ইনি বহু জলাশয় খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করিয়াছেন। রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া লোকের চলাচলের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার

নির্ম্মিত রাস্তার পার্শ্বে নানা শ্রেণীর ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন। উহা হইতে পথশ্রান্ত পথিকগণ ছায়া ও ফল পাইয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহামহিমান্বিত পূর্ব্ব পুরুষগণের পদানুসরণে একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণকালী নাম্নী একটী প্রস্তরময়ী রমণীয়া কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার দৈনিক সেবা ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আস্থা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। তাঁহার খনিত জলাশয়ের মধ্যে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তাপ্রান্তে সরস্বতীপুরে ও বর্দ্দপুরে বলিহার হইতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইমাইল ব্যবধানে ক্ষণিত ইষ্টক নির্ম্মিত সুন্দর সোপানাবলী পরিশোভিত স্বচ্ছ সলিলা দুইটী পুষ্করিণী সমধিক প্রসিদ্ধ। বলিহারে ও প্রসাদপুরে যে দুইটী বাগান তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা দর্শন ও উল্লেখযোগ্য। আম্রাদি যে সকল ফল এই বাগানে উৎপন্ন হয় তাহাও সাধারণে বিতরিত হইয়া থাকে। ইনি এই বংশে সর্ব্বপ্রথমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে ইহার সৎকার্য্য সমূহের পুরস্কার স্বরূপ মহামান্য ইংরেজ সরকার হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। মহামহিমান্বিতা ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ বর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জুবিলি উপলক্ষে রাজা উপাধির সহিত "বাহাদুর" উপাধি সংযুক্ত করিয়া দিয়া ইঁহার সম্ভ্রম আরও পরিবর্দ্ধিত করা হয়। ঐ উপলক্ষে সরস্বতীপুর গ্রামে একটী মেলা স্থাপিত হয়; ঐ মেলা অদ্যাবধিও বৎসর বৎসর হইয়া থাকে। তিনি নিজে বারেন্দ্র শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কুলীন। দেশে কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী কুফল স্বরূপ পণপ্রথা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কন্যাদায়গ্রস্থ কুলীন ব্রাহ্মণগণের দুর্দ্দশা সম্যক উপলব্ধি করিয়া তিনি বহুব্যয়ে বলিহারে দুইবার নানাদেশীয় কুলীনগণকে আহ্বান করিয়া পণের পরিমাণ কম করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত সীমাবদ্ধ পণপ্রথা বিদ্যমান থাকিলে আজি আর কন্যাদায়গ্রস্থ কুলীনগণকে কন্যাদায়ে ঘোর বিব্রত

কুমার শরদিন্দু রায়

হইয়া হা হতোস্মি করিতে হইত না। সমাজের অবস্থাও এত হীন ও নিন্দনীয় হইত না। তাঁহার ঐ চেষ্টা সমাজ সংক্রান্ত সূক্ষ্মজ্ঞানেরও ভবিষ্যদর্শীতার পরিচায়ক। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরের দুই বিবাহ :— প্রথমা রাণী শিব সুন্দরী দেবী। ইহাঁর গর্ভে কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় রাজা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রাণী গণেশ জননী দেবী ছিল। ইহার গর্ভেও কোনও সন্তান হয় না। রাণীদ্বয়ের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রাজা কৃষ্ণেন্দ্র সন্তান লাভে নিরাশ হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের ২০শে শ্রাবণ তারিখে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু রায় বাহাদুরকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কুমার শরদিন্দু ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৬ই আশ্বিন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্রের স্ববংশীয় রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দ পরগণার অন্যতম জমিদার স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় মহাশয় ইহার জনক। কৃষ্ণেন্দ্র ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ৩রা ফাল্গুন তারিখে রাজসাহী নাটোর মহাকুমার অধীন হরিশপুর গ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কন্যা কুসুমকামিনী দেবীর সহিত শরদিন্দুর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। এই বিবাহের পর কৃষ্ণেন্দ্র আর বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ২০ শে বৈশাখ তারিখে ৬৪ বৎসর বয়সে স্বনামধন্য রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর বলিহারবাসী প্রজা ও আত্মীয়স্বজনগণকে শোকে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বলিহার যে রত্ন হারাইয়াছে তাহা পুনঃ লাভ করা যাইবে কিনা তাহা ভগবানই জানেন।

তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি বলিহার রাজবংশের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ ছিলেন। দরিদ্রে তাঁহার দয়া অসাধারণ ছিল, তাঁহার জনহিতকর কার্য্য সমূহ এখনও তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে ; এত দীর্ঘকাল পরেও তাঁহার কীর্ত্তি কিছু মাত্র লোপ পায় নাই। তাঁহার কথা লোকের মুখে মুখে আজিও ঘোষিত হইয়া থাকে।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৩১ শে আশ্বিন তারিখে শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দু রায়ের সুযোগ্য পুত্র বলিহার রাজষ্টেটের বর্ত্তমান মালিক শ্রীযুক্ত কুমার বিমলেন্দু রায় রাণী কুসুম কামিনী দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। রাণী কুসুম কামিনী দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী, দয়াবতী, শিক্ষিতা এবং ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। কুমার শরদিন্দু রায় বাহাদুর গৃহ শিক্ষকের নিকট বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই; তাঁহার মধ্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই ডাক্তারদিগের মতানুসারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে কাটাইতে হইয়াছে। সামান্য কিছুদিন St. xavier college এ অধ্যয়নের পর স্বাস্থ্য ভাল হওয়ায় এবং তদ্ধেতুই তদীয় সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণা রাণী কুসুম কামিনী কুমার বিমলেন্দুর বাল্য অবস্থায় তাঁহার স্থলে অতীব দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া এষ্টেটের বিস্তর আয় বৃদ্ধি করেন। নিরক্ষর প্রজাগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে রাণী কুসুম কামিনী ডেমাজানিতে নিজ ব্যয়ে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন. উহা অদ্যও বিদ্যমান থাকিয়া বহুলোকের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিতেছে। তাঁহার অপর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ডেমাজানীর দাতব্য চিকিৎসালয়। ইহাতেও তাঁহার দুস্থ প্রজাগণের এবং অপর সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত হইয়া থাকে। এই চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি বহু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার দয়ার কার্য্যের প্রশংসা আজিও ঘরে ঘরে হইয়া থাকে। তাঁহার নিকট হইতে দীন, দুঃখী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ, কোন প্রার্থী বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সকলের সহিত তিনি সমান ও নিরহঙ্কার ব্যবহার করিতেন। সকলেই
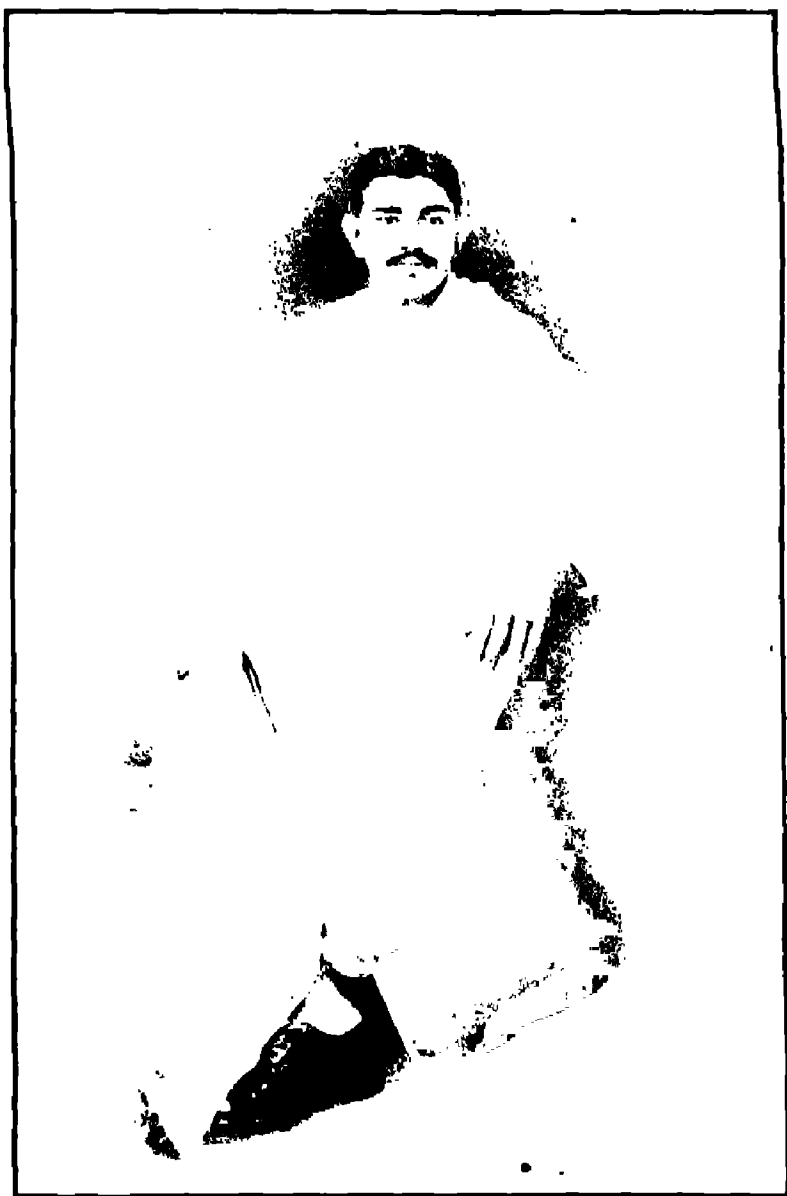
কুমার বিমলেন্দু রায়

তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ও দয়াবতী তেমনি তেজস্বিনীও ছিলেন। তাঁহারও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। দিবসের কার্য্যান্তে যতটুকু সময় পাইতেন তাহা পুস্তক পাঠেই সাধারণতঃ ব্যয়িত হইত।

কুমার বিমলেন্দু রায়।

কুমার বিমলেন্দু কুমার শরদিন্দু রায় বাহাদুরের ও রাণী কুসুম কামিনী দেবীর সুযোগ্য একমাত্র পুত্র। ইনি ১৩০৫ সালের আশ্বিন মাসে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইনি বয়সে প্রবীণ না হইলেও বিদ্যা বুদ্ধিতে ইঁহার সমবয়স্ক ও অধিক বয়স্ক অনেককে অতিক্রম করিয়াছেন। শৈশব হইতেই ইনি ধর্ম্মপ্রাণ, সুবিজ্ঞ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ, মহোদয়ের শিক্ষকতায় থাকিয়া কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই·এ এবং ইং ১৯২০ সনে কৃতীত্বের সহিত বি, এ পাশ করিয়াছেন। নিজে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই প্রজাগণ মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার কল্পে তদীয় পরমপূজ্য পিতামহ প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়কে ইনি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং অপূরণ সম্পূর্ণ ব্যয় নিজেই বহন করিতেছেন। ইনি ১৩২১ সালে পূজ্যপাদ পিতা কুমার শরদিন্দু রায় বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে এবং দান পত্র মূলে সম্পত্তি পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদবধি প্রধান কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে ও পরামর্শে নিজ গ্রামের ও এষ্টেটের নানাবিধ উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষালব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ইহাঁর প্রশংসনীয়। ইনি প্রত্যহ ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া যেমন শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যা চর্চ্চা ও ধর্ম্মাচরণ দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে

পেয়াদ পাইতেছেন। ইনি অনলস, সর্ব্বদাই কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসেন। ইঁহার স্বভাব সুন্দর। ধনবান যুবক হইলেও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। পূর্ব্বপুরুষগণের পূত আচরণে ইনি শ্রদ্ধাবান। পিতৃপিতামহের পুরাতন কীর্ত্তি সকল অব্যাহত রাখিতে ইঁহার যত্ন যথেষ্ট। ইনি ১৩২৮ বঙ্গাব্দে মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু মাতার সদ্‌গুণাবলী ইঁহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া দীপ্ত তেজে দেদীপ্যমান আছে। দয়া ইঁহার পিতৃপুরুষাগত প্রধান ধর্ম্ম। ইনি মাতার মতই সর্ব্বজীবে সমদর্শী এবং দয়াবান। ইনি ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে রাজসাহীর অন্তর্গত চৌগ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত রমণী কান্ত রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভাবতী ইন্দুপ্রভা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারই গর্ভে কুমার বিমলেন্দুর চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিমলেন্দু তাঁহার স্বনামধন্য পিতামহ স্বর্গীয় রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরের সদ্দৃষ্টান্ত সকল অনুসরণ করিয়া দেশের ও সমাজের সর্ব্ববিধ দুঃখ দৈন্য অভাব অভিযোগ অচিরে অপসারিত করিতে পারিবেন বলিয়া সকলেই আশা করিতেছেন। ইনি বিলাসী নহেন, বিলাস ব্যসন ইঁহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। ইনি ধনী রাজপুত্র হইয়াও সর্ব্বদা মিতাচারী এবং পরিমিত ব্যয়ী। সৎব্যয়ে ইঁহার বিরতি নাই। উচ্চ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলীন সমাজের শীর্ষ দেশে অবস্থান করিয়াও কৌলিন্য প্রথাগত কোনরূপ কলঙ্ক ইঁহাতে প্রবেশ করে নাই। বৃথা কৌলিন্য গৌরব ইঁহার নাই। বংশ গৌরবের জন্য ইঁহার অহঙ্কার নাই, ধন গৌরবেও ইঁহাকে স্ফীত করিতে পারে নাই; ইনি নিরহঙ্কারী, ভগবৎ কৃপায় অধুনা নওগাঁ মহকুমার বৃহৎ জমীদারীর একমাত্র মালিক।

টাকীর মুন্সী বংশ

সম্রাট্ আকবরের শাসনকালে যখন পাঠান বংশের শেষ রাজা দাউদ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হইতেছিল, তখন পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপ, দক্ষিণে কোচবিহার হইতে হিজলীর উত্তরাংশ দ্বাদশ ভূমিয়ার আক্রমণে অত্যন্ত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভূমিয়ারা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিল। দাউদ খাঁয়ের পরাজয়ের পর একাদশ জন ভূমিয়া দ্বাদশ ভূমিয়ার নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। এই দ্বাদশ ভূমিয়া আর কেহ নহে, যশোহরের মহারাজা প্রতাপাদিত্য। এই ভূমিয়াদের অধিকাংশ কায়স্থ ছিলেন। ইহাঁরা বিজেতা প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল—বঙ্গদেশ হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া একটী স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব গড়িয়া তোলা।

এই দ্বাদশ ভূমিয়ার মধ্যে পাঁচ জন বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ইহাঁদের নেতা ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের রাজত্ব সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়া একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন সমাজের সহিত বাঙ্গালার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের কেন্দ্রস্থল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কোন সম্বন্ধ ছিল না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়া যে সমস্ত কুলীন কায়স্থেরা একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে ভবানী দাস রায় চৌধুরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিরাট গুহ হইতে চতুর্দ্দশ বংশধর। মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, বিরাট গুহ সেই পাঁচজন কায়স্থের অন্যতম। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভবানী দাস নামে

একজন বড় জমিদার যমুনা ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী শ্রীপুর নামক গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন।

* Vide Glimpses of Bengal by A. Campbell age 241.

রামকান্ত।

ভবানী দাসের মৃত্যুর পর তাঁহার কৃষ্ণদাস নামক এক পুত্র টাকীতে বাসস্থান স্থানান্তরিত করেন। ভবানী দাস হইতে পঞ্চতম বংশধর রামকান্ত টাকীর মুন্সী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায় টাকীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পার্শী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পার্শী ও উর্দ্দু এই দুই ভাষায় তাঁহার জ্ঞান যথেষ্টই ছিল। পার্শী ভাষায় তিনি রীতিমত চিঠি পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অসামান্য অধ্যবসায় ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর যুবক রামকান্ত তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের উৎপীড়নে টাকী পরিত্যাগ করেন এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অর্থোপার্জ্জনের মানসে কলিকাতায় আগমন করেন। এই কলিকাতায় ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মুর্শিদাবাদ হইতে রাজ্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামকান্ত আপন প্রতিভার গুণে শীঘ্রই ওয়ারেন হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গঙ্গা গোবিন্দ রামকান্তের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগ বা খাস দপ্তরখানার একটী কেরাণীগিরি প্রদান করেন। শীঘ্রই তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্য দক্ষতা দর্শনে ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহাকে সেটেলমেণ্ট অফিসার পদে উন্নীত করেন এবং তাহার পর গবর্ণর জেনারেলের সাক্ষাৎ অধীনে "মুন্সী" পদে নিযুক্ত করেন। এখন বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারীকে যে কাজ করিতে হয় ব্রিটিশ

শাসনের প্রারম্ভে "মুন্সীকেও" ঠিক সেই কাজ করিতে হইত। এ কার্য্যেও রামকান্ত বিশেষ পারদর্শীতার পরিচয় দেওয়ায় হেষ্টিংস্ রামকান্তকে রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই দুইটি জেলা দেবী সিংহের বে বন্দোবস্তে বিশেষ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। রামকান্ত আপন অর্থনৈতিক প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে এমন সুন্দরভাবে এই দুইটি জেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে প্রজাবর্গ ও গবমেণ্ট উভয়েই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

গোরক্ষপুর ও কাশী জেলা লইয়া গোলমাল চলিতে থাকিলে রামকান্তকে তথায় জরীপ করিবার জন্য পাঠান হয়। এই দুই জেলার জরীপ শেষ করিয়া রামকান্ত তাঁহার পুত্র শ্রীনাথকে গোরক্ষপুরের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন। বঙ্গে ফিরিয়া আসিবামাত্র তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে মধ্য প্রদেশের মহারাট্টা নৃপতির সহিত একটী সন্ধি করিবার জন্য একটি ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের সহিত যাইবার নিমিত্ত নিয়োগ করেন। প্রখর রাজনীতি বুদ্ধির প্রভাবে তিনি ব্রিটিশ মিশনের কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

তাঁহার এই সমস্ত কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণর জেনারেল তাঁহাকে নাম মাত্র রাজস্বে নদীয়া জেলায় তালবাড়িয়া ও পালগাড়িয়া পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন এবং মণিমুক্তা-খচিত একখানি শিরপ্যাচ, পাগড়ি ও রৌপ্য-খচিত তরবারি প্রদান করেন। এই তরবারি এই পরিবারে অতি সমাদরের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

নাগপুর হইতে রাজকার্য্য সমাধান্তে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রামকান্ত সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট অংশ তিনি ধর্ম্মচিন্তা, দানধ্যানে অতিবাহিত করিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের নিকট পরলোক গমন করেন এবং তথা হইতে তাঁহার মৃতদেহ বরাহনগর গঙ্গাতীরে লইয়া চিতানলে ভস্মীভূত করা হয়। বাট বৎসর বয়ঃক্রম-

কালে রামকান্ত স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র শ্রীনাথ ও গোপীনাথ তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

দেওয়ান শ্রীনাথ রায়।

শ্রীনাথ রায় অতি অল্প বয়সে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং তাঁহার পিতার অধীনে গোরক্ষপুরে দেওয়ানী করিতেন। তিনি নিজে গোরক্ষপুরে আর একবার জরীপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি সরকারী কর্ম্ম করিতে পারিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ পরিত্যক্ত বিশাল জমিদারীর কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে হইল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজের জমিদারী অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি একখানি উইল করিয়া তাঁহার বিশাল জমিদারী তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া যান। তাঁহার চারি পুত্র :—কালী নাথ, বৈকুণ্ঠ নাথ, মথুরানাথ ও কৃষ্ণনাথ। এই চারিপুত্রের পক্ষে কনিষ্ঠ ভাই গোপীনাথ তাঁহার জমিদারী পরিচালনা করিতে থাকেন।

গোপীনাথ রায়।

গোপীনাথ বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি যদিও কোন দিন সরকারী চাকুরী করেন নাই, তথাচ তিনি আপন প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যদিও বয়সে নবীন, তথাচ তখনকার দিনের হিন্দু সমাজের তিনি নেতা ছিলেন। তিনি কায়স্থ সমাজের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন যে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বিবাহের সময় সিমলার প্রসিদ্ধ রামদয়াল দেব তাঁহাকে সহস্র সহস্র দাক্ষিণাত্যীয় কায়স্থের সমক্ষে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ও স্রক্ চন্দনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

জমিদারীর কার্য্য পরিচালনে গোপীনাথ এরূপ পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিলেন যে যখন পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বনাম লালা বাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের পক্ষে জমিদারী চালাইবার জন্য গোপীনাথের উপর তাঁহার জমিদারীর সমুদয় কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিয়া যান।

তখন কলিকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হওয়ায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, হুগলীতে কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, মফঃস্বলেও কতকগুলি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডাক্তার ডফ এই সমস্ত স্কুল প্রতিষ্ঠার অগ্রণী ছিলেন। শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীনাথের সহিত ডাক্তার ডফের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তিনি ডাক্তার ডফের সহিত মিশিয়া টাকীতে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। তাহাতে পার্শী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই স্কুলটী বর্ত্তমানে টাকী গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পরিণত হইয়াছে। বহু বৎসর যাবত তিনি আপন তহবিল হইতে স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড ম্যাকি, ফাইফ, ক্রিষ্ট, শেল ও অন্যান্য খ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাঁহার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। শেল তাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। টাকী হইতে এক মাইল দূরে তিনি এই সমস্ত মিশনারীদের জন্য "বাঙ্গালো" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং এই বাঙ্গালোর সমীপবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপিও শেলের কনিষ্ঠা কন্যার প্রস্তর নির্ম্মিত কবর রহিয়াছে।

টাকীর এই জমিদার বংশ অনেক দাতব্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নগদ এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ও বহু পরিমাণ জমি দিয়া বারাসত হইতে সোলাডাঙ্গা পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কালীনাথের আর একটি মহৎদানের বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একদা এক ব্রাহ্মণের ফাঁসির আজ্ঞা হয়, কালীনাথ সেই ব্রাহ্মণের

প্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বা সরকারী তহবিলে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়া ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করেন।

কালীনাথ দানধ্যান না করিয়া জলস্পর্শ করিতেন না। তিনি একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই অতিথিশালার নাম ছিল "সদাব্রত"। যে কোন আগন্তুক টাকীতে আসিত, সদাব্রতে তাহার জন্য দ্বার উন্মুক্ত থাকিত। কালীনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের আর একটি দানের কথাও উল্লেখযোগ্য। বরাহনগর ঘাটে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যত যাত্রী আসিত, কালীনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সমস্ত যাত্রীকেই প্রচুর আহার্য্যাদি দানে পরিতৃপ্ত করিতেন।

কালীনাথের ব্যক্তিগত গুণের কথা আর কি বলিব? তিনি ইংরাজী, পার্শী, আরব্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিদ্যাসুন্দরের আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি ছিল। তিনি নিজে অনেক পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে এখনও তাঁহার কতকগুলি গান সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই সমস্ত সঙ্গীতের অধিকাংশই ধ্রুপদ ও খেয়ালী; তাঁহার আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিলে ভগবদ্ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত সমূহ অত্যন্ত ভক্তি রসাত্মক।

তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেরও একজন একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। স্বর্গীয় কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তকে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যগুরু ছিলেন। ঈশ্বর চন্দ্র হাফ আখড়াই ও পাঁচালী গানের প্রবর্ত্তক ছিলেন।

কালীনাথ সাঁতার খেলিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি এত কার্য্য সত্বেও তাঁহার বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনি নানাবিধ সৎকার্য্য করায় তাঁহাকে "রায়" উপাধি দেওয়া হয়। ১৮৪০

খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর কালীনাথের মৃত্যু হইলে স্কটল্যাণ্ড হইতে ডাক্তার ডফ কালীনাথের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রেরণ করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বাণী খোদিত আছেঃ—

"To the memory of Babu Kali nath Roy choudhury, Zaminder of Taki, this tablet erected by the committee of the General Assembly of the church of Scotland in token of their warm appreciation of his distinguished liberality in founding the Taki Academy and in otherwise promoting the cause of native improvement."

(Edinburgh 1841) Requiseat in peace may his soul rest in peace. "

রায় বৈকুণ্ঠ নাথ মুন্সী।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ নাথ সংসারের কর্ত্তা হন। যৌবনকালে তিনি ইংরাজী সংস্কৃত, ও পার্শী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং পরে তিনি ফরাসী ভাষায়ও সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। কটক জেলায় পাট্টামুণ্ডীতে অবস্থান কালে তিনি উর্দ্দু ও উড়িয়া ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও দরিদ্রের প্রতি দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হারান নাই এবং কনিষ্ঠ ভাই মথুরা নাথের উপর জমিদারীর পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া নিজে আধ্যাত্মিক চিন্তায় ও দানধ্যানে কালযাপন করিতে থাকেন। তিনি সঙ্গীত অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে যে কোন গায়ক কলিকাতায় আসুক না কেন তাঁহার বাটীতে একবার গান না করিয়া যাইত না। তাঁহার নিকট অনেক সঙ্গীতজ্ঞ লোক থাকিত। তাঁহার জীবন কালে গোপাল লাল

ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বনাম ছাতু সিংহ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশ চন্দ্র, কাশীপুরের রাজা কালীকৃষ্ণ, চিৎপুরের নবাব, সিন্ধুর আমীর তাঁহার বরাহনগর বাটীতে আসিয়া সঙ্গীতাদি শুনিতেন।

তিনি এরূপ দানশীল ছিলেন যে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন প্রার্থীই রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইতেন না। তিনি সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। নগদ টাকা হাতে না থাকিলে তিনি অলঙ্কার পত্র পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া কিংবা বিক্রয় করিয়া প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতেন। বারাসত হইতে সোলাডাঙ্গা পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রাস্তা আছে তাহা নির্ম্মাণের জন্য বৈকুণ্ঠনাথ কালীনাথের নামে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। চিৎপুর বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যখন দোকান পাঠ সমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তখন বৈকুণ্ঠনাথ তত্রত্য দরিদ্র দোকানদার ও অধিবাসিগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সরকারে রাজস্ব দিবার জন্য টাকা রাখিয়াছিলেন, সেই টাকা তিনি চীৎপুরের অগ্নিকাণ্ডের পর দান করেন। নিজের পরিণাম একটুও চিন্তা করেন না। অথচ যেদিন তিনি টাকা গুলি দান করেন সেদিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব না দিতে পারিলে তাঁহার সমস্ত জমিদারী নীলামে বিক্রীত হইবে। কিন্তু গৃহ শূন্য অধিবাসীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি এতটা অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জমিদারীর পরিণাম কি হইবে তাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিলেন না। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল। লর্ড ডালহাউসী ঘোষণা করিলেন, বৈকুণ্ঠনাথকে এক পক্ষ কালের জন্য রাজস্ব দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহার সমসাময়িক সমস্ত আন্দোলন ও অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। তিনি প্রায় প্রত্যেক সভা সমিতিতে নিজে উপস্থিত হইতেন এবং বক্তৃতা করিতেন। লর্ড মেট্‌কাফ অবসর গ্রহণ করিলে

তিনি তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছিলেন এবং মেটকাফ্ হল নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মেট্কাফ্ হল বর্ত্তমানে "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" নামে বিখ্যাত।

গবর্ণমেণ্ট যে বৈকুণ্ঠনাথের উপর অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করিতেন তাহা আর একটা ঘটনায় বেশ বুঝা যায়। তখনকার দিনে কোন ফৌজদারী আদালতে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত অবমাননা-জনক বলিয়া বিবেচিত ছিল। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তিনি একটা ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হন। কিন্তু আদালতে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মানের লাঘব হইবে এই বিবেচনায় বৈকুণ্ঠনাথ বাড়ী ছাড়িয়া ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় নদীতীরে একটি রাজ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় অবস্থান কালে তিনি একজন ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ গৃহ শিক্ষক রাখিয়া ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফরাসী চন্দননগরের গবর্ণর, মেয়র ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁহাদের সহিত অনায়াসে ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। তাঁহার সচ্চরিত্রা দেখিয়া তাঁহারা এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে যখন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয় তখন সেই সন্ধিপত্রে এরূপ একটি ধারা ছিল যে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বৈকুণ্ঠনাথকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সীমানায় পাঠাইতে বাধ্য হইবেন না। চন্দনগরে অবস্থান কালেও তিনি অনেক দানধ্যান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাধারণের স্নানের সুবিধার্থ তিনি যে পাকা ঘাট তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়াও তাঁহার অতুল কীর্ত্তির সাক্ষ্য দান করিতেছে। চন্দননগরে অবস্থান কালে তিনি প্রতিদিন গরীব দুঃখীদিগকে চাল, পয়সা ও বালক বালিকাগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর, বাঙ্গালা ১২৬২ সালের আশ্বিন মাসে চন্দন-

নগরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, দুইটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সকল লোকই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রায় মথুরানাথ ও কৃষ্ণনাথ।

বৈকুণ্ঠনাথের মৃত্যুর পর মুন্সী পরিবার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য দুই শাখায় বিভক্ত হয় বড় তরফের কর্ত্তা হইলেন বৈকুণ্ঠনাথের ভ্রাতা রায় মথুরানাথ ও রায় কৃষ্ণনাথ। আর ছোট তরফের কর্ত্তা হইলেন তাঁহার পিতৃব্যপুত্র রায় প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ গোপীনাথের পুত্র। মথুরানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দার্শনিক কিংবা সাহিত্যক ছিলেন না, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অসূয়া পরবশ জ্ঞাতিবর্গের সহিত তাঁহাকে দীর্ঘকাল মামলা মোকদ্দমা চালাইতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু রমাপ্রসাদ রায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া যদিও তিনি দীর্ঘকাল জমিদারী রক্ষার জন্য মামলা মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন, তথাচ তাঁহাকে হুগলী, নদীয়া, যশোহর, কটক, মালদহ প্রভৃতি জেলার অনেক মূল্যবান পরগণা হারাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এই ক্ষতিপূরণের জন্য শীঘ্র আর একটী উপায় অবলম্বন করিলেন এবং বেলিয়াঘাটার নিকট যত পতিত জমি ও জলাজমি "লীজ" লইয়া তিনি শীঘ্রই ক্ষতি পূরণ করিয়া কয়েকটী মহল প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রায় কৃষ্ণনাথ।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণনাথ সাংসারিক কর্য্যে অতি সুনিপুন ছিলেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন তাহার ফলে তিনি জয়েণ্ট এষ্টেটের যেমন উন্নতি বিধান করিয়া ছিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতিও সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একেবারে ঘোর সাংসারিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি সঙ্গীতাদিও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার টাকীর বাড়ীতে একটী অপেরার দল গঠন

করিয়া বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাকে টাকীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জনসাধারণ এরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস করিত যে, প্রজারা সামান্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত এবং তিনি এমন নিরপেক্ষ ভাবে মামলা মোকদ্দমার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন যে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই পরম সন্তুষ্ট হইত। এই ভাবে তিনি প্রজা ও প্রতিবেশিগণের বহু টাকা বাঁচাইয়া দিতেন। তিনি অনেক নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নীলের কারবার হইতেও তাঁহার প্রভূত টাকা আয় হইত। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি কর্ম্ম জীবন ত্যাগ করিয়া সপরিবারে নৌকাযোগে বৈদ্যনাথ, গয়া প্রভৃতি তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথায় তিনি মুক্ত হস্তে গরীব দুঃখী, কাঙ্গাল, পুরোহিত, ব্রাহ্মণগণকে টাকা কড়ি দান করেন। বরাহনগরে তিনি মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রায় মথুরা নাথ তাঁহার জমিদারীর মালিক হন।

রায় মথুরানাথ।

রায় মথুরা নাথের জীবনের শেষকালে তাঁহার খুড়তুতোভাই প্রিয়নাথের সহিত গোলযোগ হওয়ায় অত্যন্ত অশান্তিতে কাটিয়াছিল। প্রিয়নাথ তাঁহার খুল্লতাত গোপীনাথের পুত্র। রায় মথুরা নাথ ১২৭০ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি বিধবা পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া তাঁহার বংশ রক্ষার জন্য পোষ্য গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া যান এবং তালতলার স্বর্গীয় রামধন বোসকে তাঁহার জমিদারীর পরিচালক নিযুক্ত করেন।

রায় সুরেন্দ্র নাথ ও রায় যতীন্দ্র নাথ।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় সুরেন্দ্রনাথকে ও যতীন্দ্রনাথকেপোষ্য গ্রহণ করা হয়। ইহাঁদিগকে পোষ্য গ্রহণ করিবার পর রামধন অবসর গ্রহণ করেন।

এই দুই নাবালক পোষ্যের সময়ে মুন্সীগঞ্জের দুই তরফের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদের ফলে ছোট তরফ একেবারে ধ্বংস হয়। প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র রায় নরেন্দ্র নাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী গ্রহণ করেন। তদানীন্তন ছোট লাট স্যার এ অ্যাডেন তাঁহাকে এই পদ প্রদান করেন। বড় তরফেরও যে এই বিবাদে ক্ষতি হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু বড় তরফ শীঘ্রই আপনাদের ক্ষতির পরিমাণ পূরণ করিয়া লন।

রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রায় সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাদের তৎকালীন অভিভাবকের হাত হইতে জমিদারী পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও তিনি বিশেষ বিবেচনাশক্তিসম্পন্ন ও উন্নতমনা ব্যক্তি ছিলেন। জমিদারী কার্য্য পরিচালনে তাঁহার যেমন দক্ষতা ছিল, দুঃস্থ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে অকাতরে দান করিবার প্রবৃত্তিও তেমনি প্রবল ছিল। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ অধীর হইত এবং পরদুঃখ মোচনে ও শরণাগত রক্ষণে তিনি জ্যেষ্ঠতাত রায় কাশীনাথ ও বৈকুণ্ঠ নাথের ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন। বৈকুণ্ঠ নাথের ন্যায় তিনি সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও নাট্যকলার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্ত্তমান সুন্দর গৃহনির্ম্মাণের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা এবং প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন নির্ভীক শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন ও প্রচুর শারীরিক শক্তির সহিত প্রভূত মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন। এই অসাধারণ মানসিক বল এবং অনন্তসুলভ হৃদয়ের প্রশস্ততা তাঁহার অল্পায়ু জীবনেই তাঁহাকে সাধারণের প্রশংসা ও শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার অকাল মৃত্যু

রায় সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাবু শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ;
বি, এল; এম, এল, সি,

হইলেও মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মাচরণে তাঁহার বিশেষ আস্থা দেখা গিয়াছিল। ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া নবীন বয়সেই তিনি কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি অসাধারণ সংযম ও ত্যাগ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া রায় সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে তাহার দুই দিন পরে ১২৯৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে (ইং ১৮৮৯, নবেম্বর মাসে) তাঁহার একমাত্র পুত্র রায় হরেন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। রায় সুরেন্দ্র নাথের অকাল মৃত্যু জনিত নিদারুণ দুঃখ শোকের মধ্যে মুন্সী বংশের শ্রীনাথ প্রমুখ জ্যেষ্ঠের ধারার বংশ রক্ষার যে শুভবার্ত্তা লইয়া হরেন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন তাহা পারিবারিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বটে। কিন্তু ঘটনা চক্রে তাঁহার জন্মের কিছুদিন পর হইতে তাঁহার মাতৃদেবী তাঁহাকে লইয়া তাঁহার মাতুলগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাস করিতে বাধ্য হয়েন। রায় হরেন্দ্র নাথের শৈশবের প্রথম সাত বৎসর এমনি করিয়া সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের অনুরূপ অবস্থা ও প্রভাবের মধ্যে অতিবাহিত হয়। পরে যখন তাঁহাকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহকাল আসন্ন হইয়া আসিল তখন তাঁহার মাতৃদেবী তাঁহাকে লইয়া বরাহনগরের ভদ্রাসন বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও তথায় পুনরায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজী ১৮৯৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রায় হরেন্দ্র নাথ বরাহনগর ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের ৭ম শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করেন। তদবধি তাঁহার মাতৃদেবীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে ও পিতৃব্য রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের শিক্ষাধীনে তিনি শিক্ষালাভে উত্তরোত্তর

উন্নতি করিতে থাকেন। ১৩০৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে টাকী সৈদপুর নিবাসী ৺সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী আশাময়ীর শুভ বিবাহ হয়। চারু বাবু এম, এ, বি, এল, পাশ করিবার পরে বর্ত্তমানে মুন্সেফি কার্য্য করিতেছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে বরাহনগর স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রায় হরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ক্রমশঃ এফ-এ, ও বি-এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইউনিভারসিটির নূতন বিধান মতে দর্শন শাস্ত্রে এম-এর affiliation না থাকায় হরেন্দ্রনাথ স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে এম-এ, অধ্যয়ন করেন। এম-এ, অধ্যয়নের সময় বিশেষভাবে তিনি হিন্দুদর্শন আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ইংরেজী ১৯১১ সালে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নূতন বিধান অনুসারে ইউনিভারসিটি ল কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পঠদশা শেষ হইবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই রায় হরেন্দ্রনাথকে বিষয় কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিতে হয় এবং তৎসংক্রান্ত নানা জটিলতার মধ্যে পতিত হইতে হয়। তত্রাপি অবসর ও সুযোগ কমিয়া গেলেও একদিনের জন্যও তিনি পড়াশুনায় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। একদিকে বিদ্যাচর্চ্চা অপরদিকে বিষয় কার্য্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা সমভাবেই তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে অবকাশ বড় বেশী না থাকিলেও যে স্বল্প অবসর তিনি পাইতেন তাহা সাহিত্যচর্চ্চায়ই অতিবাহিত করিতেন। ধনী জীবনের ব্যসন ও বিলাস কোনদিন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই এবং তাঁহার পিতার শেষ জীবনের বিশুদ্ধ ত্যাগের আদর্শ তিনি বরাবরই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার হিসাবে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু শিক্ষা অর্জ্জন করিয়া রায় হরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত নহেন, পরন্তু শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিবার সংকল্পও তাঁহার খুবই দৃঢ়। তাই নিজের কার্য্যের

মুন্সী হাউস—বরাহনগর।

মধ্যেও দেশের সেবাও তিনি যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার (Reform) আইন পাশ হইবার পরে ১৯২০ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধ তিনি বসিরহাট, বারাসত, ব্যারাকপুর মহকুমাত্রয়ের অ-মুসলমান কেন্দ্রের প্রতিনিধিপদ প্রার্থী হইলে অত্যাধিক সংখ্যক ভোটের দ্বারা উক্ত মহকুমাত্রয়ের গ্রাম্য হিন্দু অধিবাসিগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েন। তদনুসারে ১৯২১—১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত প্রথম সংস্কৃত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হিসাবে তিনি যথাসাধ্য দেশের জনমত অনুসারে প্রতিনিধির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথম কাউন্সিলে যে মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি জন সাধারণের মত অনুসরণ ও ভাব ব্যক্ত করিয়া কর্ত্তব্য নিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন হরেন্দ্রবাবু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কৃতকার্য্য সাধারণের এতদূর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে ১৯২৩ সালে উক্ত কেন্দ্র হইতে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ব্যববস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন। দ্বিতীয়বার এই সুযোগ লাভ করিয়া হরেন্দ্রবাবু দেশ সেবায় অধিকতর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ফলে তিনি স্বতন্ত্র দলের একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত। তিনি সংস্কৃত কলেজ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটীর ও Donald কমিটির মেম্বর স্বরূপেও কার্য্য করিতেছেন।

রায় হরেন্দ্রনাথের আর একটী বিশেষত্ব এই যে বৃহৎ দেশের সেবা করিতে গিয়া তিনি তাঁহার ‘ক্ষুদ্রতর” “দেশ” বা স্বগ্রামকে বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার তরুণ জীবনে ইহারই মধ্যে তিনি তাঁহার স্বগ্রাম টাকীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছেন। টাকাতে শ্মশান ঘাটের একটী বিশেষ অভাব ছিল। ইংরাজী ১৯২২ সালে তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নামে যমুনা ইছামতীর তীরে “স্বর্ণময়ী” শ্মশান ঘাট নামে একটী শ্মশান ঘাট ও প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাহা টাকী মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে অর্পণ

করিয়াছেন। টাকীতে বহুদিন হইতে সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব ছিল। তাঁহারই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে টাকী গ্রামে একটী সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগার পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি টাকী গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ উদ্দেশ্যে তিনি ২।৩ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ নলকূপ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন এবং এবম্প্রকারে তিনি স্বগ্রামের অভাব অভিযোগ দূরীকরণে বিশেষ যত্নবান।

পঠদ্দশায় বি-এ, অধ্যয়নের সময়েই কাড়াপাড়া জমিদার বংশের ৺মাধবচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রায় হীরেন্দ্রনাথ বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুলের ২য় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ।

রায় সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় যতীন্দ্রনাথ এই বংশের প্রধান পুরুষ বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার শৈশব ও বাল্যে রায় যতীন্দ্রনাথের অভিভাবকগণ যদিও তাঁহার শিক্ষাদি বিষয়ে উদাসীন ছিলেন, তথাপি যতীন্দ্রনাথ আপন অসাধারন মেধা ও বুদ্ধির বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যখন তিনি কলেজে পড়িতেন তখন প্রিন্সিপাল পার্শিভাল, মিঃ এন্ এন ঘোষ ও প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের ন্যায় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়-দিগের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কলেজ ত্যাগ করিবার পর যতীন্দ্রনাথ বাড়ীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন এবং মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের মত লোক তাঁহাকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্র পড়াইতে থাকেন। তিনি প্রাচ্যদর্শনে এতদূর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন যে তিনি ন্যায় দর্শনের একটি সুন্দর সংস্করণ প্রস্তুত করাইয়া প্রকাশ করেন যে রায় সুরেন্দ্রনাথ ও রায় যতীন্দ্রনাথের সাহায্যেই কবিরাজ ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরক ও

রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ ; বি, এল

শ্রীযুক্ত রায় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, শ্রীমান্ শ্রীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীমান্ সুচিত্তমোহন রায় চৌধুরী।

সুশ্রুতের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন। রায় যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় "চিকিৎসা দম্মিলনী" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় এবং সেই মাসিকপত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সমন্বয় করিবার চেষ্টা প্রথমে আরম্ভ হয়।

রায় যতীন্দ্রনাথ বঙ্গ সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভিত্তিস্থাপন, তাহার সৃষ্টি ও পুষ্টির মূলে রায় যতীন্দ্রনাথের সাহায্য নিহিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনী লেখনে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলনেও তিনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেরুদণ্ড। কখনও পরিষদের সহকারী সভাপতি, কখনও সম্পাদক, কখনও ধনাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি সাহিত্য পরিষদকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রের সহিতও তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তিনি একজন গণ্যমান্য সভ্য। ১৯১০সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গ ব্যাপারে তিনি তিলক ও মধ্যপন্থী-দলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী। কি করিলে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের উন্নতি হইতে পারে তিনি সর্ব্বদা কেবল সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। দান ও পরোপকারিতায় তিনি সর্ব্বদা মুক্ত হস্ত। অনেক স্কুল কলেজের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁহার দান, টাকী গবমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং গৃহ নির্ম্মাণ, সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা, বরাহনগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং তাঁহার জমিদারীর নানাস্থানে স্কুলাদির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ে তিনি যে কতটা উৎসাহী তাহার পরিচয় দিতেছে। তিনি দেশের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও জ্ঞানানুশীলনে কষ্ট

উদাসীন নহেন। তিনি এখনও ছাত্রের স্থায় অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা দর্শন শাস্ত্রই যে শুধু তিনি অধ্যয়ন করেন তাহা নহে, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির অনুশীলনেও তিনি প্রভূত আমোদ পাইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের অনুশীলনেও তাঁহার প্রগাঢ় আনুরক্তি আছে। মূল্যবান গ্রন্থ পাইলে তাহা ক্রয় করা তাঁহার একটা নেশা। তাঁহার বাড়ীতে যে পারিবারিক লাইব্রেরী আছে, তাহার মত বৃহত্তম লাইব্রেরী বঙ্গদেশে বোধ হয় অধিক নাই; তিনি দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পরিবারবর্গকে অস্ত্র আইনের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। ছয়টি বন্দুক,ছয়খানি তরবারি ও কতকগুলি সৈন্য সামন্ত রাখিবার অধিকার তাঁহার আছে। দেশের শিক্ষা বিষয়ে তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তজ্জন্য দেশের লোক মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া থাকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের একটি মাত্র পুত্র, নাম রায় ধীরেন্দ্র নাথ। ধীরেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। বর্ত্তমানে সিটী কলেজে আই, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছেন।

মোহিতচন্দ্র বসু।

এই প্রসঙ্গে রায় কালীনাথের যোগ্য দৌহিত্র, হাইকোর্টের উকিল মোহিতচন্দ্র বসু এম্ এ, বিএল মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করিলে এই বংশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি প্রবেশিকা হইতে বিএ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এম্ এ ও বি এল পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন পড়িতে বিশেষ ভালবাসেন এবং এই দুই সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায়চৌধুরী

স্বর্গীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার সঙ্গ সর্ব্বদাই থাকিতে পছন্দ করিতেন। তাঁহার মহৎগুণে তিনি সকল লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী।

রামদেবের এক পৌত্র দয়ারাম রায় চৌধুরীর ধারায় সূর্য্যকান্তের জন্ম। সূর্য্যকান্তের পিতার নাম ৺শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী। তিনি উদারচেতা, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালক ও নিম্মন স্বভাব ছিলেন। শ্রীকান্তের পিতার নাম দেওয়ান কমলাকান্ত। দেওয়ান কমলাকান্ত রায় সন্তোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়ারামের দ্বিতীয় পুত্র। দেওয়ান কমলাকান্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইংরেজের অধীনে গোরক্ষপুরের দেওয়ান ছিলেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলে আধিপত্যকালে তিনি কাশীনরেশের রাজ্যের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কাশীর গুণ্ডাদিগের অত্যাচার দূর করিবার জন্য তিনি তথায় নানাস্থানে তোরণ দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাশী-বাসিগণ অদ্যাপি কোন কোন প্রধান তোরণ "দেওয়ান কমলাপতিকা ফটক" নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কাশীতে তিনিই কুমারী পূজার প্রবর্ত্তক, তদবধি আজ পর্য্যন্ত কাশীধামে এবং অন্যত্র অনেক স্থানে এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তিনি কাশীধামে অবস্থানকালে ৺চৌষট্টি যোগিনীর ও ভদ্রকালীর মন্দির এমন সুন্দরভাবে সংস্কার করিয়াছিলেন যে তাহা তিনি পুনঃ স্থাপন করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হন এবং সেই শোক ভুলিবার জন্য মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়া লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। তাৎকালিক লক্ষ মুদ্রা বর্ত্তমানে পাঁচ লক্ষ মুদ্রার সমান।

সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। ইঁহার মাতা

স্বামী-শোকে বিধূরা হইয়াও নিজ কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। শোকাবেগ কিঞ্চিত প্রশমিত হইলে তিনি বহুগুণে গুণবান্ নিজ জামাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বসুকে নিজ আলয়ে আহ্বান করিলেন। বাবু দুর্গাচরণের বয়ঃক্রম তখন পঞ্চ বিংশতি বৎসরের অধিক নহে। তিনি অল্প বয়স্ক হইলেও লোকের নিকট তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বহুগুণবত্তা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। শ্বশ্রূ দেবী পূর্ব্ব হইতেই জামাতার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধার্ম্মিকতার নানা পরিচয় পাইয়া নিঃশঙ্কে নাবালক পুত্র ও জমীদারীর সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পন করিলেন ও সুপাত্রে ভার অর্পণ করিলেন ভাবিয়া একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

বাবু দুর্গাচরণ নাবালক শ্যালকের ও জমীদারীর ভার লইয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কিসে শ্যালককে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট করিবেন ও জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করিবেন সেই কার্য্যেই সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতীও হইয়াছিল। ধনবানের পুত্রকে জ্ঞানী করিতে পারিয়া ও জমীদারীর আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া তিনি আপনার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের ব্রত যেরূপ প্রশংসাময় সূর্য্যকান্তের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাও তদনুরূপ হয়। বাবু দুর্গাচরণ পীড়িত হইলে রায় সূর্য্যকান্ত পরিচর্য্যার্থ ভৃত্য নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং পরিচর্য্যা করিতেন। একদিন তাঁহার বমনোদ্রেক দেখিয়া নিকটে পাত্র না থাকাতে স্বয়ং অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন না।

সূর্য্যকান্ত ভগিনীপতির যত্নে শিক্ষা ও সংসঙ্গ লাভ করিয়া ধনীগৃহে একটি উচ্চ রত্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অমায়িকতা ও সৌজন্য দর্শনে লোকে এরূপ বিমুগ্ধ হয় যে তিনি যে ধনীর সন্তান ও স্বয়ং ধনবান ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ সাধারণতঃ ধনীর ধনগর্ব্ব কোন

না কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহার গুণগ্রাম ধন-মত্ততা জনিত গর্ব্ব হইতে একেবারেই সুদূরে অবস্থিত।

তাঁহার বিনয় নম্র সহাস্য মূর্ত্তিখানি যেমন রমণীয় তাঁহার হৃদয় খানিও সেইরূপ অতি মহৎ। বিপন্নের দুঃখ দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়েন। মানুষের কথা দূরে থাক, পশুদিগেরও কষ্ট দেখিলে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন। একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহার এক জমীদারীতে অত্যন্ত জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে তাপিত হইয়া ভীষণ পিপাসা শান্ত করিবার জন্য জলের আশায় গরুগুলি ছুটিয়া গিয়া শুষ্ক পুষ্করিণীর মধ্যে নামিয়া জল না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, এই সংবাদে সূর্য্যকান্ত ও বাবু দুর্গাচরণের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি জমিদারের নায়েবের উপর আদেশ হইল যত টাকা লাগে একমাসের মধ্যেই যেন পুষ্করিণী খাত হয়। খনন কার্য্যে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উঁহাদের প্রাণে যে তৃপ্তি হইল তাহা অনির্ব্বচনীয়। তিনি যে কেবল এই একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া বিরত হন তাহা নহে, তিনি চারি স্থানে চারিটি বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া জলাভাব-ক্লিষ্ট অধিবাসিগণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। দরিদ্র ভদ্রসন্তানগণ অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিতেছে না, সূর্য্যকান্ত তাহাদের পাঠের সুবিধার জন্য ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র ছাত্রগণের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, তিনি নিজের কলিকাতা আলয়ে থাকিবার ও আহার করিবার ব্যবস্থা করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কন্যাদায়ে কাতর হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার আংশিক দায় উদ্ধার করিয়া থাকেন। তিনি কাশীধামে শাস্ত্রের আলোচনার জন্য তাঁহার পিতৃদেবের নামে "শ্রীকান্ত চতুষ্পাঠী" স্থাপন করিয়া দিয়াছেন এবং কয়েকটী ভদ্রসন্তান হরিসভা করিয়া কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া সূর্য্যকান্ত দরিদ্র-

দিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য সমস্ত মিষ্টান্নের ভার গ্রহণ করিলেন, ও দরিদ্রদিগের তৃপ্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যখন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া যে জয়ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহা কখনও ভুলিবার নহে। রামকৃষ্ণ-সেবা-সমিতি কি মহৎ কার্য্যই অনুষ্ঠান করিতেছেন! তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি তিন সহস্র মুদ্রা দান করিলেন। বস্তুতঃ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ যদি কেহ উদ্যোগী হইয়া উৎসাহ পাইবার আশয়ে সূর্য্যকান্তের নিকট উপস্থিত হন, তিনি কখনও উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হন না। এতদুপলক্ষে তিনি শত, সহস্র, দশ সহস্র করিয়া প্রায় পঞ্চাশত সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের ত গণনাই নাই।

বিদ্যার অনুশীলনে তিনি "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" "সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের" এবং "কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে"র Life Member হইয়া বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি চন্দ্রনাথ তীর্থে ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতে বড় ভালবাসেন। ভগবান এরূপ একটি রত্নকে দীর্ঘজীবি করুন।

লক্ষ্মণনাথের মহাশয় বংশ।

লক্ষ্মণনাথের মহাশয় বংশের ইতিহাস আদিশূরের রাজত্বকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইঁহারা বাঙ্গালা দেশের এক অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ। ঘটকদের কুলজী পঞ্জিকায় বংশ তালিকার মধ্যে ইঁহাদের বংশাবলীর ইতিহাস পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য আনয়ন করেন, সেই সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসেন। এই কায়স্থদের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ নামে একজন ছিলেন। এই মকরন্দ ঘোষই মহাশয় বংশের আদিপুরুষ। মকরন্দ ঘোষের বংশধরদিগের নাম এই স্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা কুলপঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত নাম কায়স্থ কারিকা নামক পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম ব্যতীত তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

রামচন্দ্র খাঁ।

এই বংশ রামচন্দ্র ঘোষের আমলে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠে। এই রামচন্দ্র ঘোষ "খাঁ" উপাধি পান। ইনি মকরন্দ ঘোষ হইতে চতুর্দ্দশ বংশধর। রামচন্দ্র ঘোষ বালির অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থানের উপর বালি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে সেই কাগজের কলের স্থানে পাটের কল স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি প্রথমে বালি কুত্রাঙ্গের কোট আকড়িয়ারপুরের ওহাদাদার ছিলেন। তিনি পুরন্দর বসু, ওরফে গোপীনাথ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। পুরন্দর বসু "খাঁ" উপাধি পান, তিনি হুসেন সাহের অধীনে রাজস্ব সচিব ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বাঙ্গালার নবাবের অধীনে অনেক দায়িত্ব পূর্ণ পদ পান। তাঁহাকে উড়িষ্যার

উত্তরে ও মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে পাঠানদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল।

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পুরী যাইবার পথে উড়িষ্যায় আসেন। রামচন্দ্র মহাপ্রভুকে নিরাপদে পুরী পৌছিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া দেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—

"স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতি প্রেমজলে।
পৃথিবীতে বহে এক শত মুখী ধার
প্রভুর নয়নে বহে শত মুখী আর।
অপূর্ব্ব দেখিয়া হাসে যত ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন।
সেই প্রেম অধিকারী রামচন্দ্রখান
যত্তপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান।

* * * * *

জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র খানেরে কে তুমি
সম্ভ্রম করিয়া দণ্ডবৎ করযোড়ে।
বলে প্রভু দাসানুদাস মুই তোর,
অবশেষে সর্ব্বলোক লাগিল কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে
প্রভু বলে তুমি অধিকারী বড় ভাল
নীলাচলে আমি যাই কি মতে সকাল।

* * * * *

রামচন্দ্র খান বলে শুন মহাশয়
যে আজ্ঞা তোমার তাহা কর্ত্তব্য নিশ্চয়

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়
সে দেশে এদেশের কেহ পক্ষ নাহি রয়।
রাজার ত্রিশূল পড়িয়াছে সর্ব্বস্থানে
পথিক পাইলে প্রায় বধিবেক প্রাণে। *

*　　*　　*　　*　　*

হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান
নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হইল বিদ্যমান।

*　　*　　*　　*　　*

প্রবেশ হইল জঁহু শ্রীউৎকল দেশে—
উত্তরিল গিয়ে পঁহু শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।

(চৈতন্য ভাগবত অন্ত্য খণ্ড)

উড়িষ্যার অবস্থা তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। পথে ঘাটে দস্যু তস্করের উপদ্রব যথেষ্ট ছিল। কাজেই রামচন্দ্র চৈতন্য মহাপ্রভুকে স্থল পথে একলা পাঠান সমীচীন বোধ করিলেন না। রামচন্দ্র মহাপ্রভুকে নৌকায় করিয়া গঙ্গা দিয়া সাগরে পাঠাইলেন, তথা হইতে মহাপ্রভু কাঁথীতে আসিলেন। সেখান হইতে স্থলপথে আসিয়া মহাপ্রভু সুবর্ণরেখা পার হইলেন। তথা হইতে মহাপ্রভু জলেশ্বরে আসেন এবং জলেশ্বরনাথ শিবকে পূজা করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ সমস্ত বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্যামাসুন্দরী ঠাকুরাণীর পূজা করিতেন এবং একজন অকপট ভক্ত ছিলেন। এই বংশে এখনও বিশেষ যত্নের সহিত শ্যামাসুন্দরীর পূজা হইয়া থাকে।

হোসেন সাহের মৃত্যুর পর সের সাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কনৌজের নিকট হুমায়ুনকে পরাজিত করেন এবং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাঙ্গালার নবাবের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসেন। তিনি বাঙ্গালাদেশকে

কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক সুবায় এক একজন গবর্ণর নিযুক্ত করেন। রামচন্দ্রও একটি সুবার গবর্ণর হন। বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগস্থ প্রদেশে সমগ্র ভূভাগ তাঁহার অধিকারে ন্যস্ত হয়।

রামচন্দ্র বালির অধিবাসী হইলেও, তিনি রাজস্ব আদায়াদির সুবিধার জন্য জলেশ্বরে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে থাকিয়া তিনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিতেন এবং চৌধুরী, জমিদার, কানুনগো প্রভৃতির নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। কিন্তু সর্ব্বদা ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া থাকিতেন বলিয়া তিনি জীবনে টাকা কড়ি তেমন আয় করিতে পারিতেন না। বার্দ্ধক্যাবস্থায় তাঁহাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁ সুবার রাজস্ব সময়মত দিতে না পারায় তাঁহাকে জেলে যাইতে হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"নিত্যানন্দ গোঁসাই গৌড়ে যবে আইলা
প্রেম প্রচারিতে তার ভ্রমিতে লাগিলা।
আসিয়া বসিল দুর্গা মণ্ডপ ভিতরে
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল।
সেবক বলে গোঁসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমার দিতে বাসস্থান।
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহার সঙ্কীর্ণ স্থান তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিলা শুনি ক্রোধে বাহির হইলা।
সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা

* * * * *

ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাহা বসিলা তার মাটি খোদাইলা।
গোময় জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গন।

* * * * *

দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ম্লেচ্ছ উজির আইলা তার ঘর।
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈলা।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধিলা।
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বাঁধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া।

—শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেন, মহাপ্রভু নিত্যানন্দের অভিসম্পাতে রামচন্দ্রকে এই অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব রামচন্দ্রকে জেলে বন্দী করেন।

দেবী শ্যামাসুন্দরী স্বয়ং কারাগারে আবির্ভূত হইয়া রামচন্দ্রকে মুক্ত করেন। কিরূপে করেন সে কথার সবিস্তার উল্লেখ এখানে করিব না। তবে কেমন করিয়া "মহাশয়" উপাধি তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইল কেবল সেই কথারই উল্লেখ এখানে করিব।

রামচন্দ্রের সহিত আরও অনেক লোকে কারাগারে পচিতেছিল, রামচন্দ্র নবাব সরকারে টাকা দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নিজে কারাগারে পচিতে থাকেন। নবাব রামচন্দ্রের এই মহানুভবতা দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হন যে তিনি রামচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে "মহাশয়" উপাধি দেন এবং দুইখানি সনন্দের দ্বারা তাঁহাকে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সদর কানুনগো পদে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে এই

বংশের ইতিহাসে অনুরূপ কথা লিখিত আছে। ইঁহাদের বংশাবলীর ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে সের সাহ রামচন্দ্রকে "মহাশয়" উপাধি ও সনন্দ প্রদান করেন। রামচন্দ্র কারামুক্ত হইয়া ও ইত্যাকার সম্মান লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় সেওড়াফুলীর নিকট গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিলেন। তীরে সেই সনন্দ দুইখানি ছিল। হঠাৎ একটা শঙ্খচিল ছোঁ মারিয়া বাঙ্গালা দেশের জন্য যে সনন্দ সেই সনন্দখানি লইয়া সেওড়াফুলীর একজন অধিবাসীর বাড়ীতে ফেলিয়া দেয়। শঙ্খচিল হিন্দু শাস্ত্র মতে খুব পবিত্রশালী বলিয়া রামচন্দ্র সেই লোকটীর বাড়ী হইতে আর সনন্দ ফিরাইয়া লইলেন না। সেই লোকটী কাজে কাজেই বাঙ্গালা দেশের সদর সুবাদার হইলেন। আজও তাঁহার বংশধরগণ সেওড়াফুলীর "মহাশয়" বংশ বলিয়া পরিচিত। রামচন্দ্র উড়িষ্যা দেশের সনন্দ লইয়া জলেশ্বরে আসিলেন। কিন্তু তথাকার বাড়ী মুসলমানদের অখাদ্য রন্ধনে কলুষিত হইয়াছে বলিয়া তিনি বালিতে ফিরিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, তবে রাজস্ব আদায়ের জন্য মধ্যে মধ্যে জলেশ্বরে যাইতেন। নবাব রামচন্দ্রকে উড়িষ্যার সদর কানুনগোর পদের সনন্দ দিলেও, সেই সনন্দ বিশেষ কোন কাজে আইসে নাই, রামচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় সদর কানুনগোর পদে কাজ করিতে পারেন নাই, যদি করিয়া থাকেন তাহা অতি অল্প কালের জন্য। ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহন করেন। সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্বকালে বাঙ্গালার নবাব স্বাধীন হইয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে কোন রাজস্ব পাঠাইতেন না, কিংবা দিল্লী সম্রাটের অধীনতাও স্বীকার করিতেন না। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর মুনিরাম খাঁর নেতৃত্বে দাউদখাঁকে পরাস্থ করিবার জন্য একটী অভিযান প্রেরণ করেন। দাউদ পরাজিত হইয়া উড়িষ্যায় পলাইয়া যান, মুনিরাম খাঁও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। বালির নিকট গেলে মুনিরামের সৈন্যসামন্তের খাদ্য-সামগ্রী সমস্ত ফুরাইয়া

যায়। ঝড় বাতাসের জন্যও তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন না। এই সময়ে রামচন্দ্র বালিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এক সপ্তাহ কাল খাদ্য সম্ভার দিয়া সৈন্যদিগকে সাহায্য করেন।

ইহাতে মোগল সেনাপতি মুনিরাম খাঁ রামচন্দ্রের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুনিরাম খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত মোগল সৈন্যের সহিত এবং দায়ুদের নেতৃত্বে পরিচালিত পাঠান সৈন্যের যুদ্ধ হয়। দাঁতন ও বালেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। এখানে পাঠানেরা সম্পূর্ণ পরাস্থ হয়। যুদ্ধান্তে মোগল সেনাপতি রামচন্দ্র খাঁকে জলেশ্বরে থাকিতে অনুরোধ করেন। মুনিরাম খাঁ কটকে যান, তথায় দায়ুদ খাঁয়ের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। দায়ুদ মোগলদিগকে বঙ্গ ও বিহারের দাবী ছাড়িয়া দেন, আর মোগলেরা তৎপরিবর্ত্তে দায়ুদকে উড়িষ্যার রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশ আক্রমন করেন এবং মুনিরাম খাঁর মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক দায়ুদ খাঁ নিহত হন এবং হুগলী চন্দনেশ্বরের নিকট পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে রামচন্দ্র মোগল সম্রাট্‌কে সহায়তা করেন। মোগল সেনাপতি তাঁহাকে "পঞ্চসতী মনসবদার" পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে স্থায়ীভাবে জলেশ্বরে থাকিতে আজ্ঞা করেন এবং পাঠানদের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলেন। এ বিষয়ে ২৫ বর্ষের সাহিত্য পত্রিকার ১১শ সংখ্যায় "আকবরের হিন্দু সেনাপতি" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে, "রাজা রামচন্দ্র খাঁন আকবরের পাঁচশতী মনসবদার ছিলেন"।

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র খান স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পৌত্র জগন্নাথ রায় সদর কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নিস্কর মৌজা কুমারকুল ও অন্যান্য মৌজা নবাব আহাতসাম খাঁয়ের নিকট হইতে পান। কোন্

তারিখে, কোন্ সময়ে তিনি এই অধিকার পান তাহা জানা যায় না। তবে ১০০৭ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত রায়ত, জমিদার, কর্ম্মচারী, জাইগীরদার, চৌধুরী ও কানুনগোদের প্রতি এই মর্ম্মে এক পরোয়ানা জারী হয় যে কুমারমণ্ড ও অন্যান্য মৌজা রামচন্দ্র খাঁয়ের পৌত্র জগন্নাথ রায়কে জাইগীর দেওয়া হইয়াছে। এই পরোয়ানায় আলমগীর আহাত সাম খাঁয়ের শীল রহিয়াছে।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তখন জগন্নাথ রায় রাজত্ব করিতেছিলেন। জগন্নাথ তাঁহার ভ্রাতা চণ্ডিচরণ রায়কে রাজা মানসিংহের সৈন্য সামন্তকে খাদ্য সম্ভারাদি দিয়া সাহায্য করিতে প্রেরণ করেন। চণ্ডীচরণ জকপুর মহাশয় বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা কানুচরণ রায় কাউপুর মহাশয় বংশের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। আফগানেরা এবারেও পরাস্ত হয় এবং রাজা মানসিংহের সৈন্য জলেশ্বর হইতে কটক পর্য্যন্ত জয় করে।

১০৬২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একখানা পরোয়ানা ইঁহাকে নবাব সিরাজুদ্দীনের আদেশে দেওয়া হয়। ১০৬৮ হিজরীতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার গবর্ণর সৈয়দ মকিম খাঁয়ের অনুজ্ঞানুসারে ঐ একই প্রকারের পরোয়ানা ইঁহাকে দেওয়া হয়। এই সমস্ত পরোয়ানা দেখিয়া বোধ হয় যে একজনের অবর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরকে পিতৃপদে উপবেশন করিতে গেলে নূতন করিয়া পরোয়ানা লইতে হইত। ১০৬৮ হিজ্রী অর্থাৎ ইংরাজী ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাদিগকে আর একখানি পরোয়ানা দেওয়া হয়, তাহা পাঠে দেখা যায় যে. মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় ইঁহাদিগকে ৪ হাজার ২০ বিঘা জমি নিষ্কর দেওয়া হইয়াছে। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে আফগানেরা ওসমান খাঁয়ের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহাদের শেষ চেষ্টা করে, তাহারা এবারও পরাজিত হয়, এবং তাহাদের নেতা জলেশ্বরের নিকট নিহত হয়। জগন্নাথ রায়

সরদার ও পাইক প্রভৃতি দিয়া মোগল সৈন্যকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জগন্নাথের অধীনে সর্দ্দার ভীমসিংহ মোগলদিগের স্বপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথ রায় মহাশয় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র রাজীবনারায়ণ রায় মহাশয় সদর কানুনগো হন। তাঁহাকে উপরোক্ত জমির জন্য পুনরায় সনদ লইতে হইয়াছিল। তিনি মোগল সরকারের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে খোয়াব, লোকনাথপুর, দাড়রদা, মিরগোদা, এই কয়টি গ্রাম ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া হয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় পিতৃ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ও ৩২ কাটির জমির সত্বের নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন, হাবলি, জলেশ্বর, ভেলোরাচর, অগ্রচর এবং মিরগোদাচর পরগণায় এই জমি পান। প্রত্যেক কাটির জন্য এক টাকা করিয়া মাত্র খাজনা নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার ও তাঁহার দুই খুল্লতাতের নাম টয়নবির উড়িষ্যার ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

জয়কৃষ্ণ সরকার ভদ্রক ও সরকার সরোর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণের উপর সরকার বাস্তা, জলেশ্বর ও মৌজ কুরীর ভার দেওয়া হইয়াছিল। রাম জীবনের উপর সরকার জোয়ালিপুর ও সরকার মালঝিটানের ভার দেওয়া হইয়াছিল।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার গবর্ণর এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন মহম্মদ উড়িষ্যার ডেপুটী গবর্ণর হন। তাঁহার সেক্রেটারীদের মধ্যে একজন কেশোরচন্দ্র রায় কন্দর্প নারায়ণের ভাগিনেয় ছিলেন। এইবার মেদিনীপুর জেলা যাহা উড়িষ্যার অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহা বাঙ্গালার অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার জলেশ্বরের সমস্ত উত্তরাংশ ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার অন্তর্ভূক্ত হয়। ঐ বৎসর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর হন। তাঁহার দাসী পুত্র মহম্মদ তোকি উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্ণর হইয়াছিলেন।

মিঃ টয়নবি আরও বলেন, বাঙ্গালা হইতে সদর কানুনগোরাই যে কেবল উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন তাহা নহে। পরন্তু গবর্ণরদের গোমস্তাদের তিন চতুর্থাংশ বাঙ্গালা দেশ হইতেই গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা তাঁহাদের অধীনে হিসাব পত্র রাখিবার জন্য উড়িয়াদের নিযুক্ত করিতেন। ফলে প্রত্যেক বাঙ্গালী ডেপুটীর অথবা সদর কানুনগোর একজন না একজন উড়িয়া সহকারী ও মুহুরী ছিল। (P x vii appendix Toynbi's History of Orissa.) এখানে এই সমস্ত কানুনগোদের কি কর্ত্তব্য ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মোগল বন্দি চাক্‌লা বা বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। কটক, ভদ্রক ও বালেশ্বর —এই কয়েকটি চাক্‌লার মধ্যে ১৫০টী পরগণা ছিল। প্রত্যেক পরগণা আবার দুই তিনটি মহলে বিভক্ত হইয়াছিল

(১) তালুক চৌধুরী

(২) তালুক কানুনগো ওয়াল লাতি

(৩) তালুক কানুনগো—

(৪) তালুক সদর কানুনগো

(৫) তালুক মোজকারি বা মোকদমী

কোন কোন স্থলে তালুককে তাপ্পা বলিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে চৌধুরী ও কানুনগো অর্থে একই অর্থ বুঝাইত। প্রত্যেক চাকলার সদর কাননগো নামে একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন, তাঁহারা আপন আপন এলেকার রাজস্ব আদায় করিতেন। তাঁহারা ইহা ছাড়া ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁহাকে "ননকর" জমি দেওয়া হইয়াছিল, ইহা তিনি নিষ্কর ভোগ করিতেন। তাঁহার প্রধান সহকারী ছিল একজন গোমস্তা, এই গোমস্তারা প্রত্যেক পরগণায় থাকিতেন। প্রত্যেক গোমস্তার অধীনে একজন কিংবা দুইজন করিয়া গোমস্তা থাকিতেন। গোমস্তারা অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন আর মুহুরেরা

উড়িয়া ছিল। তাল পত্রে তাহারা হিসাবপত্র রাখিত, জমি সম্বন্ধে জরিপ প্রভৃতি করিত এবং জমি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য ও বিবরণ প্রকাশ করিত। ১১৩২ হিজরী (১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে) কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায় সদর কানুনগো হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কন্দর্প নারায়ণের পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ রায় সদর কানুনগো নিযুক্ত হন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (১১৫৩ হিজরীতে) আলীবর্দ্দী খাঁয়ের রাজত্ব কালে কাজী কামালুদ্দীন আলীবর্দ্দীর আদেশে লক্ষ্মী নারায়ণকে ৩০১ কাঠি জমি নির্দ্দিষ্ট করে দান করেন।

গোবর ঘাটা	১০৪ কাটি	১৭৭৲
মিছিরপুর	৩৪ কাটি	৪৫৲
মহেশপুর	৩৪ কাটি	৩৮৲
নারায়ণপুর	২০ কাটি ও ১৫ মান	১৬৲
বেরেশপুর	৪২ কাটি ও ১৭ মাণ	১৬৸৴

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মী নারায়ণ রায় আলালপুর চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে বর্গী সর্দ্দার চুলিয়া ও মুলিয়াকে পরাজিত করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই বর্গী সর্দ্দারেরা মহাজনিয়া পাটনায় বাস করিতেছিল।

"চুলিয়া মুলিয়া দুই ভাই
ঘর আছে কিন্তু দুয়ার নাই।"

তাহারা যে বাড়ীতে বাস করিত সে বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর ছিল, কিন্তু কোন গেট ছিল না। তাহারা প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত। উপরোক্ত চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষগণ কয়েক খানি গ্রাম পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন, আজও তাহাদের বংশ-ধরগণ সেই গ্রামগুলি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ের আমলে জলেশ্বরের জলেশ্বরনাথ শিবমন্দিরে মহম্মদ টোকীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ প্রবেশ করিয়া মন্দিরটী দূষিত করে। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে যে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব এই মন্দিরে যাইয়া লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা মন্দির দূষিত করায় লক্ষ্মী নারায়ণ জলেশ্বর হইতে বাসভবন লক্ষ্মণনাথে সরাইয়া আনেন। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দ্বারা একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন মসজিদটি স্বর্ণ রেখার জলপ্রবাহে ধ্বংস হইয়াছিল। তবে প্রাচীন মসজিদের উপরিস্থিত খোদিত বাক্য আজিও নুতন মসজিদের উপর দেখা যায়।

লক্ষ্মণ নামে একজন জুগীর নামানুসারে লক্ষ্মণ নাথ গ্রাম উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ "নাথ" উপাধি শুধু জুগী জাতির মধ্যে দেখা যায়। তিনি একটি শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন, সে বিগ্রহকে লক্ষ্মণেশ্বর বলিত। এই লক্ষ্মণেশ্বর বিগ্রহটি আজিও উক্ত গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর জেলার কেশিয়ারীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিরের সম্মুখস্থ অংশটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ১১৬১ হিজরীতে লক্ষ্মী নারায়ণ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র জয় নারায়ণ রায় মহাশয় তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উত্তিরাধিকারী হন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার ডেপুটী গবর্ণর হন। তাঁহার দেওয়ান অথবা রাজস্ব সচিব ছিলেন—মীর হবিব খাঁ। একটি পরোয়াণা দ্বারা জয় নারায়ণ রায় সদর কানুনগো হন।

দিলুল্লা আহম্মদ সাহা বাদশাঃ ফিদবী সৈয়দ হবিব খাঁন।

তারিখ ১১৬১ হিজরী অথবা খ্রীষ্টাব্দে ১৭৪৩ এই পরোয়াণার বলে জয় নারায়ণ সদর কানুনগো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

মহারাজ রঘুজী ভোঁসলা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা জেলা অধিকার করেন। তিনি পরলোকগত সুজাউদ্দীনের দেওয়ানকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। একখানি তাম্র পাত্র জয় নারায়ণকে ২ হাজার ২৩ বিঘা জমি দুর্গাপূজা, কালীপূজা, ও শ্যাম সুন্দরের দৈনিক পূজার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই সনদে এই কথা লেখা ছিল যে যদি কোন হিন্দু এই দেবোত্তর জমি নষ্ট করিতে চেষ্টা করে তবে সে শূকর খাদক হইবে। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একখানি পরোয়ানা জারি করা হয়, সেই পরোয়াণায় জয় নারায়ণকে উড়িয়াদের নব বর্ষোৎসব ও দুর্গাপূজা সম্পন্ন করিবার জন্য আবওয়াব সংগ্রহ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক উড়িষ্যার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন একখানি আদেশপত্রের দ্বারা জয় নারায়ণকে সদর কানুনগো পদে পাকা করিয়া নিযুক্ত করা হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জয় নারায়ণকে নিষ্কর আসল ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য ১২০০ শত টাকা মঞ্জুর করা হয়।

সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ পাড়ে, রায়বোনিয়া, কুনহস্থা ও বড়দিয়া নামক তিনটি দুর্গ ছিল। ধরিসিং, নিরিসিং ও জগৎসিং নামক তিন জন মহারাট্টা সেই দুর্গ অধিকার করেন। তাহারা প্রতিবেশীদিগের উপর সতত জোর জুলুম করিত। তাহারা প্রতিবেশীদিগের যাহা পাইত তাহাই লুট করিত। তাহাদের অধীনে কিছু সৈন্যও ছিল। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে স্যার হুসিয়ার জঙ্গ ভ্যান্সিটার্ট বাহাদুর জয় নারায়ণকে ঐ মহারাষ্ট্র সেনাকে পরাজিত করিতে আদেশ করেন, জয় নারায়ণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গড় বা দুর্গ তিনটি অধিকার করেন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ মৃন্ময় প্রাচীর ও পরীখা প্রস্তরময় ফটক এখনও দুর্গের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হুসিয়ার জঙ্গ ভ্যানসিটার্ট বাহাদুর এক পরোয়ানার দ্বারা ঐ গড়

ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ জয় নারায়ণকে প্রদান করেন; এই জমিদারীকে ফতিয়াবাদ পরগণা বলিত। ১৭৭৫ খৃঃ অঃ এই জমিদারী জয়নারায়ণকে দেওয়া হয়। জয়নারায়ণ নগেনেশ্বর শিবের মন্দিরের কার্য্য সমাধা করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য জয়নারায়ণের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ শিবের পূজার জন্য গৌরীপুর মৌজা নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সনদ এখনও মন্দিরের সেবাইতদের হাতে রহিয়াছে।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জয়নারায়ণ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রূপনারায়ণ রায় সদর কাননগো হন। কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই সদর কাননগোর পদ তুলিয়া দেওয়া হয়। তখন রূপনারায়ণকে আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত নিষ্কর জমি ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রূপনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণ নাবালক; কাজেই জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অন্তর্ভূক্ত হয়। নিষ্কর জমি জরিপ করা হয়। সিপাই বিদ্রোহের সময় শিবনারায়ণ উষ্ট্র, অশ্ব, এবং হস্তীর দ্বারা ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেন এবং তজ্জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানা সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন। হেরম্বনারায়ণ রায় ও হরেন্দ্রনারায়ণ রায় নামক নাবালক পুত্র রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই বংশের অদ্যাপি মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলায় ১১০টি মহল আছে। এই বংশের কন্যাগণকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দেওয়া হইত না, পরন্তু জামাতাকে ভূসম্পত্তি দিয়া আপন বাড়ীতেই রাখা হইত। এই বংশ হইতে এই কন্যা প্রতিপালন প্রথা উঠিয়া গেলেও এই কারণে ইহাদের অধিকৃত মহাল অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। মহাশয় বংশের লোক মেদিনীপুর জেলার জাকপুর, মালুচ্চা, মারগুদা প্রভৃতি স্থানে ও বালেশ্বর জেলার লক্ষ্মণনাথ, কানপুর, সোরো, দেহরদায় দেখা যায়। কটকের কুশীনগর মহাশয় বংশের বংশ লোপ হইয়াছে।

বংশ তালিকা।

মকরন্দ
পুরুষোত্তম
(দক্ষিণরাঢ়ী)
সুভাষিত
(বঙ্গজ)
ভবনাথ
মহাদেব
প্রভাকর
(আকনাসমাজ)
নিশাপতি
(বালিসমাজ)
ঊষাপতি
প্রজাপতি
শিব
নিমু
বিভাকর
মন্ত্রী
ভানু
হংস
তপন
মধু
বীর
পুরন্দর
অনিরুদ্ধ
রঘুনাথ
পদ্মলাভ
অঙ্কার
কৃত্তিবাস
কৃষ্ণ
হেড়ম্ব
শ্রীধর
ভৈরব
মাধব
দুর্য্যোধন
শিব
পরাশর
ভুবন
দৈত্যারি
কঙ্কমান

রামচন্দ্র খাঁ
হংসনারায়ণ রায়
মালক চণ্ডিচরণ রায়
মালক কানুচরণ রায়
জগন্নাথ রায়
রাজীবলোচন
জয়কৃষ্ণ
রামজীবন
কন্দর্পনারায়ণ রায় ওরফে পুরন্দর রায়
চাঁদ্ রায়
উদয়নারায়ণ রায়
মুকুন্দবল্লভ রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
কাত্যায়ণী
তারিণী
দর্পনারারণ রায়
জয়নারায়ণ রায়
রাজনারায়ণ রায়
রূপনারায়ণ রায়
ব্রজবল্লভ রায়
জীবনারায়ণ রায়
নন্দকুমার রায়
কন্যা বেচু রায়
শিবনারায়ণ রায়
মহেন্দ্রনারায়ণ রায়
হেরম্বনারায়ণ রায়
হরেন্দ্রনারয়ণ রায়
যদুনাথ রায়
রামনাথ রায়
রামকানু রায়
ভৈরব রায়
শিরোমণি রায়
উমাবল্লভ রায়
কন্যা হলা রায়
স্বর্ণ রায় (লক্ষ্মণ নাথ)

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
গৌরীবল্লভ রায়
গোবিন্দবল্লভ
দেবকৃষ্ণ রায়
কামদেব রায়
(স্ত্রী উর্ব্বসী ঠাকুরাণী, (সুভদ্রা ঠাকুরাণী)
কালী প্রসন্ন রায়
(স্ত্রী সন্দর প্রিয়াঠাকুরাণী)
শ্যামাপ্রসাদ রায়
চন্দ্রশেখর রায়
মহেশচন্দ্র
গণেশচন্দ্র
গিরিশ
প্রতাপ
অভয়
নিরঞ্জন
মিরগদা, পরগনা কস্‌বা (জে॰ মেদিনীপুর)
চাঁদ রায়
হরিনারায়ণ রায়
মহাতাপ প্রতাপচন্দ্র রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
মনোহর রায়
সুবুদ্ধি রায়
সদানন্দ রায়
নিত্যানন্দ রায়
রাজবল্লভ রায়
রঘুনাথ রায়
কাশীনাথ রায়
দুর্গাচরণ রায়
ভৈরবানন্দ
পূর্ণানন্দ
গোকুলানন্দ
নিলমনি রায়
ঠাকুরদাস
সৃষ্টিধর রায়
নয়ানন্দ
কৈলাশচন্দ্র রায়
গিরীশ রায়

কৈলাশচন্দ্র রায়
অবিনাশ
উপেন্দ্র
শরৎ
চারু
রাম
বিমল
দেহুড়দা (বালেশ্বর)
ভবানীচরণ
কিশোর
মহাদেব
রামচরণ
যুগল
শ্যামাচরণ
চণ্ডীচরণ
রামসুন্দর
শঙ্কর রায়
(কন্যা)
হলা রায়
(কন্যা)
করুণা রায়
আকলাবাদ
(মেদিনীপুর)

বর্দ্ধমান্ রাজগঞ্জ অস্থল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যে সময়ে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের গৌরব ও প্রাধান্য ভারতে ক্রমশঃ বিস্তারিত হইতেছিল, ঐ সময় পাঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্ত্তী থাড়া নামক স্থান হইতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত নরহরি দেব নামক জনৈক সিদ্ধ মহাপুরুষ বর্দ্ধমানে আগমন করতঃ রাজগঞ্জের সন্নিকট বাঁকা নদীর তীরে অবস্থান করেন এবং তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউ শীলা যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহা উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বর্ত্তমান অস্থলের ভিত্তি স্থাপন করেন। উক্ত নরহরি দেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী যোগীপুরুষ ছিলেন। ঐ সময় রাজগঞ্জ ও তাহার সন্নিকটস্থ কাজীর হাট, কোটালহাট প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণের প্রাধান্য ও প্রাদুর্ভাব ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বর্দ্ধমানের তৎকালীন মুসলমান সুবেদার উক্ত স্থানের মধ্যে শঙ্খধ্বনি করা নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নরহরি দেব উক্ত আদেশ প্রতিপালন না করিয়া প্রতিদিন ৺দামোদর জীউর পূজার সময় শঙ্খবাদন করিতেন। তজ্জন্য সুবেদারের অনুচরগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশে আসিয়া দেখেন যে তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে কেহ বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া হত্যা করিয়াছে।

পরদিবস যথাসময়ে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তাহারা পুনরায় ঐ স্থানে আসিয়া ঐরূপ দৃশ্য অবলোকন করেন। উপর্য্যুপরি কয়েকবার ঐরূপ ঘটনা হইবার পর তাহারা সুবেদারকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলে তিনি স্বয়ং উক্ত স্থানে আগমন করতঃ উক্ত মহাত্মার অলৌকিক কার্য্য কলাপ দর্শন করিয়া ও উক্ত বাঁকা নদীর অপর পার্শ্বে যে একজন সাধু ফকির বাস করিতেন তাঁহার নিকট উক্ত মহাত্মার দৈবশক্তির বিষয়

জ্ঞাত হইয়া তিনি উক্ত স্থানে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া আপন ইচ্ছামত পূজাদি করিবেন ও নিরাপদে বাস করিবেন এইরূপ আদেশ স্থানীয় মুসলমানগণকে প্রদান করেন। উক্ত ফকিরের সহিত নরহরি দেবের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে বাঁকা নদীর প্রবল বন্যার সময়েও তিনি কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার পূর্ব্বক বাঁকানদীর জল স্রোতের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে পার হইয়া উক্ত ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। নরহরিদেব ১০১ বৎসর কাল উক্ত স্থানে অবস্থান করতঃ তাঁহার দুই শিষ্য সুখদেব ও দয়ারাম দেবের মধ্যে সুখদেব গোস্বামীকে মহান্ত আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার উপর শ্রীশ্রী৺ দামোদর জীউ ঠাকুরের সেবা পূজাদির ভার অর্পণ করেন ও তাঁহাকে উক্ত সেবা পূজাদির পদ্ধতি ও মহান্ত নিয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করিয়া নিরুদ্দেশ হয়েন। উক্ত নরহরি দেবের দ্বিতীয় শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলার উখড়া নামক স্থানে যাইয়া ঘৃতাদির ব্যবসা করতঃ অর্থ সংগ্রহ দ্বারা উখড়া অস্থল স্থাপন করেন ও তথায় শ্রীশ্রী৺গোপাল মূর্ত্তি বিগ্রহ ও শালগ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন।

(১)

সুখদেব গোস্বামী—পশ্চিম দেশীয় জনৈক ধনাঢ্য গৌড় ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি বহু অর্থ সহ বর্দ্ধমানে আসিয়া উক্ত নরহরি দেবের তপোবল ও দৈব শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করেন এবং তিনি তাঁহার সহিত যে অর্থ আনিয়াছিলেন তাহা তেজারতি ব্যবসায় দ্বারা বৃদ্ধি করেন। উক্ত অর্থ সাহায্যে তিনি তাঁহার গুরুদেবের উপদেশ মত শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত তেজারত কারবার অদ্যবধি রাজগঞ্জ অস্থলে বর্ত্তমান আছে ও ইহা একটী প্রধান আয় হইতেছে। ইনি বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী তরফ কৃষ্ণপুর প্রভৃতি অনেক মহল ইজারা গ্রহণ করিয়া
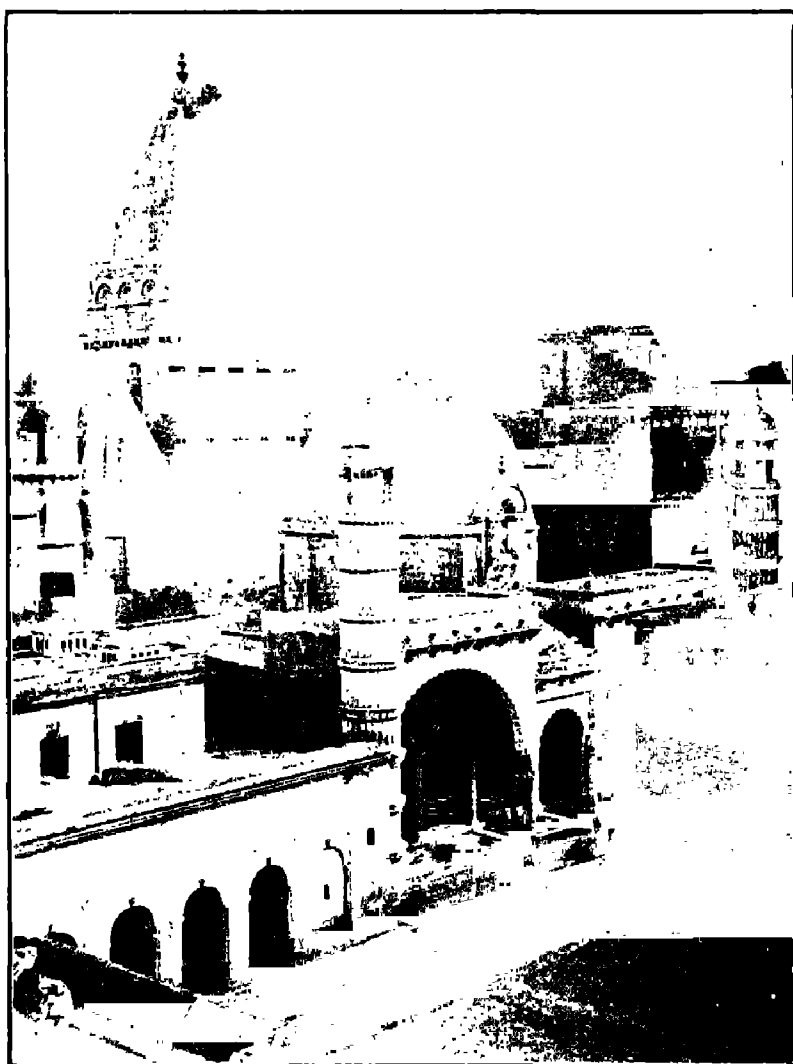
শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

তাহার আয় হইতে দেবসেবা ও অতিথি সেবাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমশঃ তিনি উক্ত ইজারা মহালের মধ্যে তরফ কৃষ্ণপুর ৪১৷৷০ মৌজা বৰ্দ্ধমানের তৎকালীন মহারাজাধিরাজ কীৰ্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের নিকট মোকররী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। ইনি একজন ব্রহ্মচারী বাক্‌সিদ্ধ মহান্ত ছিলেন। মহারাজ কীৰ্ত্তিচাঁদ বিষ্ণুপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে উক্ত মহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি মহারাজ কীৰ্ত্তিচাঁদকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে "আপনি যে কার্য্যে যাইতেছেন তাহাতে অভিলষিত ফললাভ করিবেন," এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য তিনি উক্ত মহারাজ বাহাদুরকে কতক নাগাসৈন্য তাঁহার সহিত দিয়া সাহায্য করেন। মহারাজ কীৰ্ত্তিচাঁদের বাসনা পূর্ণ হইলে তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকালীন উক্ত মহান্ত মহারাজকে তাঁহার ইজারা সূত্রে দখলি নলা মহালের মধ্যে ১০০০ বিঘা ভূমি লাখরাজ ভোগ করিবার সনন্দ প্রদান করেন। তিনি ১০১৬ সাল হইতে ১১৫৯ সাল পর্য্যন্ত রাজগঞ্জ অস্থলের গদিনসীন মহান্ত ছিলেন। তাঁহার বসন্তরাম, গোপালদেব ও গঙ্গারাম নামে তিনজন শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বসন্তরাম দেব গোস্বামীকে রাজগঞ্জ অঞ্চলের গদিনসীন মহান্ত পদে নিয়োগ করিয়া গঙ্গাতীরে সাধন ভজন জন্য চুঁচুড়া নামক স্থানে গমন

চুঁচুড়া অস্থল।

করেন ও তথায় একটী অস্থল স্থাপন করেন। উক্ত আখড়া এখনও সুখদেবের আখড়া বলিয়া খ্যাত। তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য গোপাল দেব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া নামক স্থানে যাইয়া মধু ও দধির ব্যবসা

চেতুয়া বৈকণ্ঠপুরে অস্থল।

করতঃ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা তথায় চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর নামক অস্থল স্থাপন করেন ও উক্ত অস্থলে শ্রীশ্রী৺বিহারী জীউ নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সুখদেব গোস্বামীর তৃতীয় শিষ্য গঙ্গারাম দেব নদীয়া জেলার চুর্ণী

আরংঘাটা অস্থল।

নামক নদীর তীরবর্ত্তী আরণ্য ঘাটা নামক স্থানে যাইয়া (যাহা এক্ষণে আরং ঘাটা নামে খ্যাত আছে) বুট মুগ প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করতঃ ঐ স্থানে শ্রীশ্রী৺যুগোলকিশোর নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অস্থল স্থাপন করেন।

সুখরাম দেব রাজগঞ্জ অস্থল পরিত্যাগকালীন তাঁহার স্বর্গীয় গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার শিষ্যগণকে অন্যান্য বিস্তারিত উপদেশ সহ এই উপদেশ দিয়া যান যে রাজগঞ্জ অস্থলের মন্ত্র শিষ্যগণের মধ্যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভূক্ত সংসার ত্যাগী গৌড় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ এই অস্থলে মহান্ত হইতে পারিবেন না এবং শঙ্খ চক্র চিহ্নিত মন্ত্র গ্রহণকারী সংসারত্যাগী মন্ত্র শিষ্য গৌড় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ এই অস্থলের দেব সেবা ও পূজাদির ও ভোগরন্ধন কার্য্য করিতে পারিবে না।

(২)

মহন্ত বসন্তরাম দেব।

বসন্ত রামদেব গোস্বামী—১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত রাজগঞ্জ অস্থলের গদীনসীন মহান্ত ছিলেন। ইনি বাল্যকালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস নামক স্থানে বাস করিয়া কারবার করিতেন এবং উপার্জ্জিত অর্থে তথায় একটী অস্থল স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জীউ নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক্ষণে "ইন্দাস বড় অস্থল" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি মহান্ত হইয়া বহুতর সম্পত্তি খরিদ করতঃ অস্থলের আয় করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে বিষ্ণুপুরের মহারাজা চৈতন্য সিংহদেব ও দামোদর সিংহদেব উক্ত মহান্তের পূর্ব্ব দখলী জাগন দীপ ও ফতেপুর নামক দুইটী গ্রাম লাখরাজ স্বরূপে ভোগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ইনি আপন শিষ্য উদ্ধব দেবকে মহান্ত পদে মনোনীত করিয়া ১১৯৫ সালে পরলোক গমন করেন।
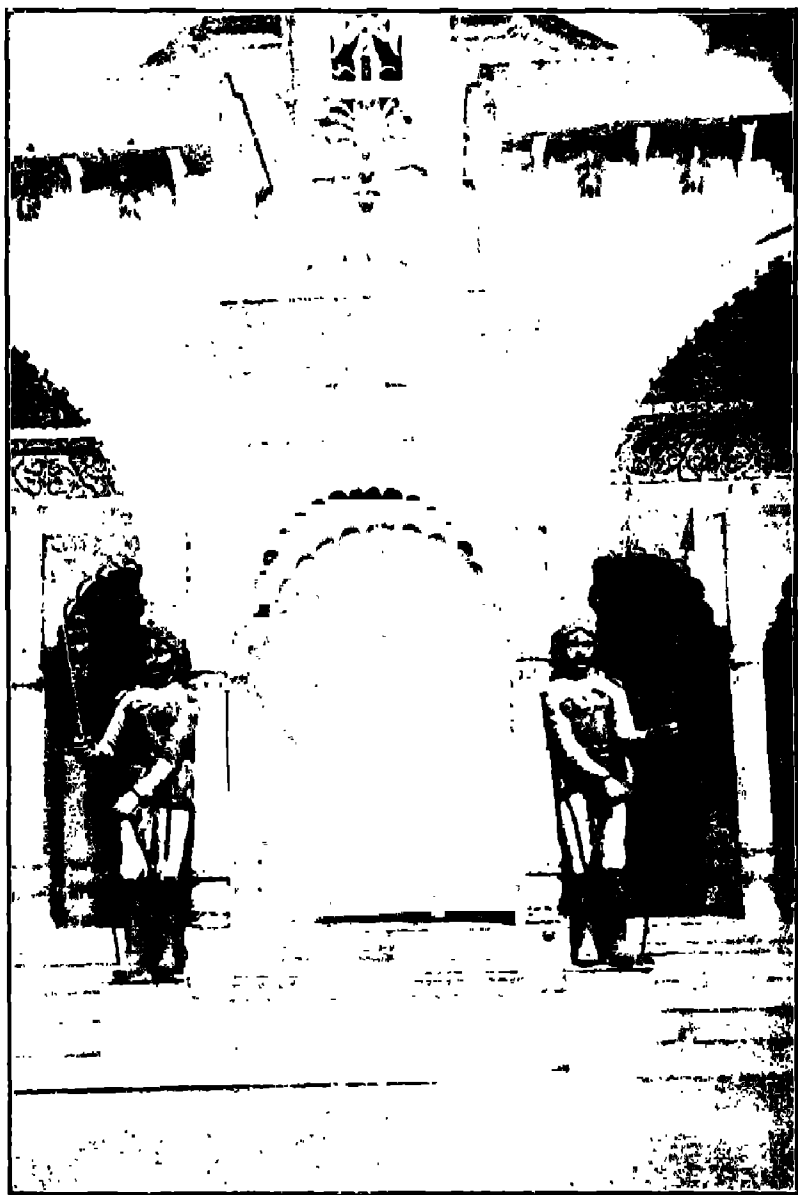
শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগের দৃশ্য

(৩)

উদ্ধব দেব—সন ১১৯৫ সাল হইতে ১২১৮ সাল পর্য্যন্ত রাজগঞ্জ অস্থলের গদিনসিন মহান্ত ছিলেন। ইনি শ্রীশ্রী৺নন্দকিশোর জীউ নামক একটী নূতন বিগ্রহ রাজগঞ্জ অস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সময়ে

মহান্ত উদ্ধব দেব।

অনেক খুচরান সম্পত্তি খরিদ হয়। ইনি আপন প্রিয় শিষ্য পুরুষোত্তম দেবকে পরবর্ত্তী মহান্ত পদে নিযুক্ত করিয়া সন ১২১৮ সালে ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

(৪)

পুরুষোত্তম দেব—সন ১২১৮ সাল হইতে ১২৫১ সাল পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর কাল গদিনসিন মহান্ত ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অতিথি সেবা ও গো-সেবায় তিনি সর্ব্বদাই অনুরক্ত থাকিতেন। তিনি স্বয়ং গো-শালায় যাইয়া গো-সেবা করিতেন। রাত্রিকালে অস্থলের প্রত্যেক অতিথি ও সাধুর নিকট যাইয়া তাহাদের সেবার কোন ত্রুটির সংবাদ পাইলে তিনি স্বয়ং তাহা সরবরাহ করিতেন। এক সময় পুরুষোত্তম দেব কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইলে তিনি এক বৎসরের জন্য আপন শিষ্য সুখরাম দেবকে মহান্ত পদ প্রদান করেন, কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া সুখরাম দেবের হস্ত হইতে পুনরায় মহান্তপদ গ্রহণপূর্ব্বক ১২৫১ সাল পর্য্যন্ত অস্থলের কার্য্যাদি পরিচালনা করেন এবং তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোপাল দেবকে ভাবি মহান্ত মনোনীত করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

মহান্ত গোপাললাল দেব।

গোপাল দেবজী—১২৫১ সাল হইতে ১২৬৪ সাল পর্য্যন্ত মহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বহু সম্পত্তি খরিদ করিয়া অস্থলের

দ্বিগুণ আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ তেওয়ারী বংশের আদি পুরুষ গদাধর তেওয়ারী মহাশয়ের পুত্র কন্যা না হওয়ায় তিনি উক্ত মহান্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সপরিবারে দেশত্যাগ করতঃ বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। মহান্ত মহারাজ তৎশ্রবণে উক্ত তেওয়ারী বাবুকে বলেন যে তোমার পুত্র কন্যা হইয়া বংশ রক্ষা হইবে। মহান্ত মহারাজের উক্ত আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল এবং এক্ষণে উক্ত গদাধর তেওয়ারী বাবুর বংশধরগণ বহু বিস্তৃত হইয়া বর্দ্ধমানের প্রসিদ্ধ জমীদার স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউর মন্দির সংস্কার কালে মন্দিরের কড়ি কাষ্ঠ লাগাইবার সময় মাপে কম হওয়ায় মিস্ত্রিগণ তাঁহাকে জানাইলে তিনি কড়িকাষ্ঠগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "যখন তোমরা জঙ্গলে বাড়িতে পার আজ আমার শ্রীমন্দিরের উপকার জন্য এখানেও তোমাদিগকে বাড়িতে হইবে।" এই ঘটনার পর, পরদিবস মিস্ত্রিগণ আসিয়া দেখে যে বাস্তবিকই কাষ্ঠগুলি বর্দ্ধিত হইয়া কার্য্য উপযোগী হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, নিষ্ঠাবান, যোগীপুরুষ ছিলেন। তিনি ভূমি ব তে অন্য কোন শয্যায় শয়ন করিতেন না। কাষ্ঠই তাঁহার একমাত্র উপাধান ছিল। তিনি তাঁহার গুরুভাই লাড়লী দেব ও তাঁহার শিষ্য গিরিধারী দেব উভয়কে এক রেজিষ্টারী উইল দ্বারা ক্রমান্বয়ে মহান্ত মনোনীত করিয়া ১২৬৪ সালে দেবধাম গমন করেন।

(৬)

মহান্ত লাড়লী শরণ দেব।

লাড়লী শরণ দেব—তিন বৎসরকাল মহান্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সন ১২৬৭ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্য নন্দকিশোর শরণ দেবই গদিনসিন মহান্ত হয়েন।

স্বর্গীয় মহান্ত গিরিধারী শরণ দেব

(৭)

মহান্ত নন্দকিশোর শরণ দেব।

নন্দকিশোর শরণ দেব—১২৬৭ সাল হইতে ১২৭৭ সাল পর্য্যন্ত মহান্ত ছিলেন। তিনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। বঙ্গদেশে ১২৬৭ সালে দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি রাজগঞ্জ অস্থলে অন্নছত্র খুলিয়া বহু লোককে অন্নদান করতঃ তাহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারকে ধান্য ও চাউল বিতরণ করিয়া তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সৎকার্য্যের জন্য তিনি সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে বহু প্রশংসা লাভ করেন। তিনি দানশীল থাকিলেও বিষয় কার্য্যে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহার সময়ে অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তজ্জন্য গিরিধারী দাস মহান্ত মহারাজ তাঁহার বিরুদ্ধে খেসারতের মোকদ্দমা করিয়া তাঁহাকে গদীচ্যুত করেন ও সন ১২৭৭ সালে স্বয়ং রাজগঞ্জ অস্থলের গদিনসিন মহান্ত হয়েন।

মহান্ত—গিরিধারী শরণ দেব।

চারিগ্রাম অস্থল।

গিরিধারীশরণ দেব মহান্ত মহারাজ অসাধারণ অধ্যবসায় সম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ ও লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি যে সময় গদী প্রাপ্ত হয়েন, ঐ সময়ে অস্থলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তহবিলে কেবলমাত্র একটি দুয়ানী ব্যতীত আর কিছুই তিনি নগদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। অধিকন্তু অনেক সম্পত্তি বন্ধক অবস্থায় ছিল ও কতক সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল এইরূপ অবস্থাতেও তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় এবং স্বীয় পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা অস্থলের সম্পত্তি সকল উদ্ধার করতঃ বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। বাঁকুড়া

জেলায় ইন্দাস থানার অন্তর্গত চারিগ্রাম নামক স্থানে একটী অস্থল বিশৃঙ্খল হওয়ায় মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অস্থল স্বয়ং অধিকার করতঃ তথায় দেব সেবা ও পূজাদির সুশৃঙ্খলা স্থাপন করেন এবং অদ্যাবধি উক্ত অস্থল রাজগঞ্জ অস্থলের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া তথাকার দেব সেবাদির কার্য্য যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইতেছে। ইঁহার সময়ে রাজগঞ্জ অস্থলের তেজারৎ কারবার যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি বর্দ্ধমান রাজগঞ্জ অস্থলে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺বলরাম দেব জীউ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন; এক্ষণে তাহা দাউজীর মন্দির নামে খ্যাত আছে। কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে ইনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন এবং মহালের প্রজাগণের হিতসাধন জন্য স্থানে স্থানে জলাশয় খনন ও নদীতে বাঁধ নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনসাধারণের বহু হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে তাঁহার মহালের নানাস্থানে নিজ ব্যয়ে কৃষিকার্য্য দ্বারা অস্থলে বহু ধান্য প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে অনেক বলশালী বৃষ ও দুগ্ধবতী উৎকৃষ্ট গাভী প্রভৃতি বহুসংখ্যক গোধন অস্থলে প্রতিপালিত হইত। এই বহু গুণান্বিত পুরুষ তাঁহার প্রিয় শিষ্য মধুসূদন দাস মহান্ত মহারাজকে ভাবি মহান্ত মনোনীত করিয়া সন ১৩০৫ সালে স্বর্গলাভ করেন।

(৯)

মহান্ত—মধুসূদন শরণ দেব।

মধুসূদন শরণ দেব মহান্ত মহারাজ সন ১৩০৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে গদিপ্রাপ্ত হন। ইনি মহান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই ইঁহাকে ইঁহার গুরুভ্রাতা যমুনাদাসের সহিত অস্থল সংক্রান্ত অনেক মোকদ্দমাদি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইনি স্বীয় কার্য্যদক্ষতা গুণে
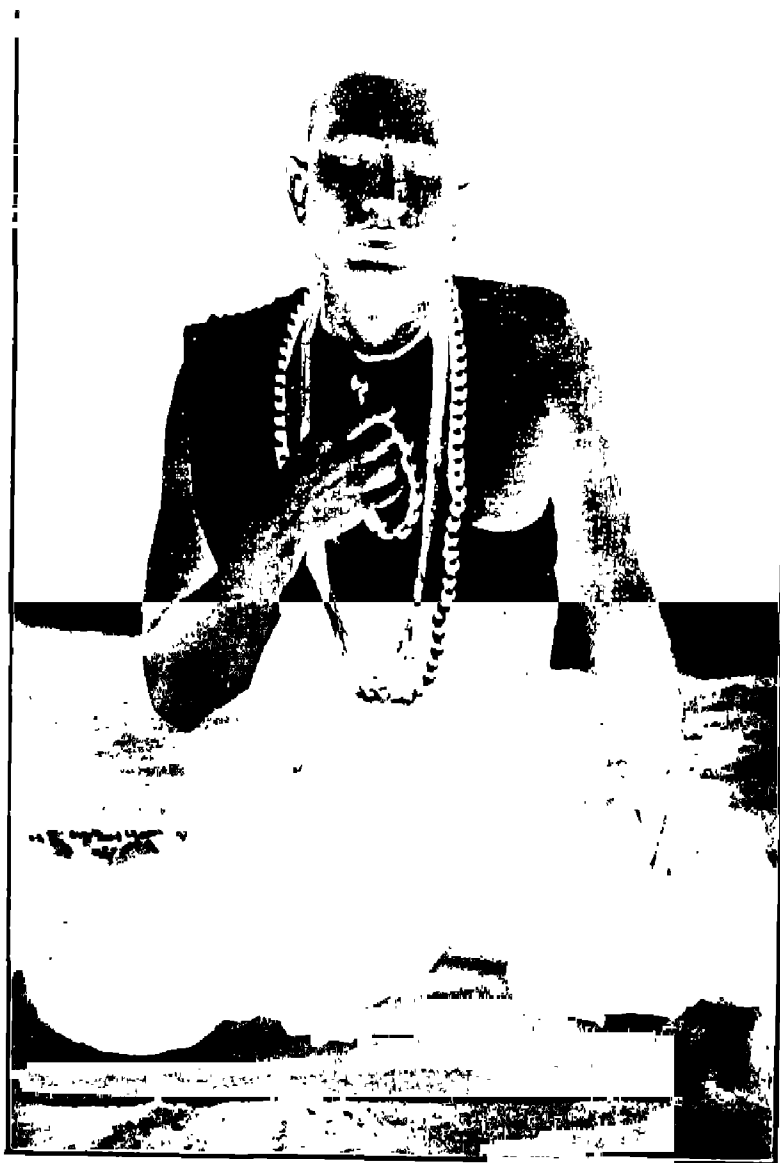
স্বর্গীয় মহান্ত মধুসূদন শরণ দেব

সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক অস্থলের অনেক আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত মহান্ত মহারাজ প্রায় ২০০০০৲ বিশ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। রাজগঞ্জ অস্থলে শ্রীশ্রী৺দামোদর জীউর যে স্থানে পুরাতন মন্দির ছিল তাহা ভগ্ন হওয়াতে ঐস্থানে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ মনোরম নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত শ্রীমন্দিরের কলস সমুদয় সুবর্ণ মণ্ডিত ও বিবিধ কারুকার্য্য-শোভিত। ইনি ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় তীর্থ কয়েকবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বারকায় অবস্থান কালে তথায় শ্রীশ্রী৺ শ্রীকৃষ্ণ জীউর "রণ ছোড়" মূর্ত্তির যে শ্রীমন্দির আছে তাহার আদর্শে তিনি রাজগঞ্জ অঞ্চলে এই মন্দির গঠন করেন। এই শ্রীমন্দিরের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে তিনি কোন ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত মন্দিরের একাংশে শ্রীশ্রী৺হংস ভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলীকে অহ্বান করিয়া এবং স্থানীয় মহারাজা ও জমিদার ও প্রজাবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠার কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলায় চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানের শাখা অস্থল জনৈক আশারাম দাস কর্ত্তৃক নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তিনি বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া উহা পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক সন ১৩১৫ সালে পৌষ মাসে তাঁহার গুরু ভাই শ্রীযুক্ত বলদেব দাসকে উক্ত অস্থলের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া অস্থলের সুশৃঙ্খলা স্থাপন, করেন। ঐ সময় নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লোহাগঞ্জ নামক স্থানের অস্থল ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তি নাটোর মহারাজা অন্যায় মতে অধিকার করিয়া লইলে এই মহান্ত মহারাজ বহুকাল যাবত

মোকদ্দমা করিয়া উক্ত অস্থল উদ্ধার করেন ও শ্রীযুক্ত মদনমোহন শরণ দেবকে উক্ত অস্থলের গদিনসিন মহান্ত পদে অভিষিক্ত করেন। এই মহান্ত মহারাজ প্রজারঞ্জক, দানশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন। প্রজাগণের জল কষ্ট নিবারণ জন্য তিনি স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জলাশায় খনন করান। তাঁহার উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস নামক স্থানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। উক্ত চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের অধিকাংশ ব্যয় তিনি নিজে বহন করিয়াছিলেন এবং উক্ত চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক ১৪৪৲টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় ইনি সরকার বাহাদুরের অভিপ্রায় অনুসারে বাষট্টি হাজার টাকার 'ওয়ার বণ্ড" খরিদ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশে সৈনিক গঠন সময়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। গত সন ১৩২০ সালে দামোদর নদের ভীষণ বন্যার সময়, বন্যা-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে তিনি "রিলিফ ফণ্ডে" ২০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধমান সহর জলমগ্ন থাকা সময়ে অনেক নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে কয়েক দিবস অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন ও নিজ হস্তী সাহায্যে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করেন। উক্ত দামোদর নদী তীরস্থ গ্রামবাসিগণের ক্লেশ নিবারণ জন্য অর্থ ও ধান্যাদি সাহায্য করিয়াছিলেন ও তাঁহার ঐ সকল মহালের প্রজাগণের খাজনা অব্যাহতি দিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় সন ১৩২২ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ইনি বহু অর্থ ধান্যাদি সাহায্য করিয়া স্থানীয় লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গীতার ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় পণ্ডিতগণকে লইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থিগণকে বিশেষ আগ্রহের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেন।

শ্রীভগবান নিম্বার্কাচার্য্যের "সবিশেষ নির্ব্বিশেষ," "শ্রীকৃষ্ণস্তব" নামক গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সহ মুদ্রিত করায় তাহা আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশের লোক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন ধামে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী ছাত্রগণের বিদ্যাধ্যয়ন জন্য একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসিক ১৮০৲ টাকা করিয়া প্রদান করিতেন। সন ১৩১২ সালে তিনি প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় গমন করিয়া তথায় সাধু, সন্ন্যাসী ও সমাগত দরিদ্রগণকে প্রায় ২০০০০৲ হাজার টাকার অন্ন বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদ্যকারগণকে আনাইয়া তিনি সঙ্গীত বিদ্যা আলোচনা করিতেন এবং রাজগঞ্জ অস্থলে শ্রীশ্রী৺জীউকে সঙ্গীত শ্রবণ করাইবার জন্য জনৈক গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজগঞ্জ অস্থলে প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালীন হরিনাম সংকীর্ত্তন হইবার নিয়ম তিনি সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে "চব্বিশ প্রহর হরি সংকীর্ত্তন" হইবার প্রথাও ইনি সর্ব্ব প্রথম প্রচলন করিয়া উহার স্থায়ীত্ব জন্য বৰ্দ্ধমান রাজগঞ্জে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত হরিমন্দির নির্ম্মাণ করান।

রাজগঞ্জ অস্থলের আদি পুরুষ মহান্ত শ্রীশ্রী৺নরহরি দেব তাঁহার শিষ্য সুখদেব গোস্বামীকে এই অস্থলের রীতিনীতি, আচার পদ্ধতি ও মহান্ত নিয়োগ সম্বন্ধে যে সকল বাচনিক উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এতাবৎ কাল শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে, রাজগঞ্জ ও তাহার শাখা উখরা, আড়ংঘাটা ও চেতুয়া প্রভৃতি অস্থলে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ না থাকায় এবং সময়ে সময়ে মহান্তগণ তাহা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করায় সময়ে সময়ে রাজগঞ্জ ও অন্যান্য শাখা অস্থলে নানাপ্রকার বিশৃখল ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঐরূপ বিশৃখলা যাহাতে ঘটিতে না পারে তজ্জন্য তিনি সমুদয় শাখা অস্থলের মহান্তগণকে

একত্রিত করিয়া এবং তাঁহাদের সহিত একযোগে উক্ত অস্থলের চির-প্রচলিত প্রথা সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া উহা চিরস্থায়ী করিবার জন্য "নিয়মাবলী পত্র" নামক একটি দলিল, সকল মহান্তগণ কর্ত্তৃক সন ১৩২২ সালে সম্পাদিত ও রেজেষ্টারী করেন।

এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত খ্যাতনামা মহান্ত মধুসূদন শরণ দেব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীযুক্ত মনোহর শরণ দেবকে রাজগঞ্জ অস্থলের ভাবী মহান্ত মনোনীত করিয়া সন ১৩২৭ সালের ৩রা মাঘ তারিখে স্বর্গধামে গমন করেন।

(১০)

শ্রীযুক্ত **মনোহর শরণ দেব** বর্দ্ধমান রাজগঞ্জ অস্থলের বর্ত্তমান মহান্ত। ইঁহার গুরুদেবের স্বর্গারোহণকালে রাজগঞ্জ অস্থলের গদি প্রাপ্ত হইবার সময় ইনি নাবালক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার গুরুদেবের অভিপ্রায় মত উক্ত ষ্টেটের প্রাচীন ও কার্য্যদক্ষ দেওয়ান শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা ষ্টেটের সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ইনি সন ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সাবালক হইয়া অস্থলের সমুদয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ও ষ্টেটের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছেন।

ইনি বিদ্যানুরাগী, শান্ত মূর্ত্তি, সদাচারী মহান্ত। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ জন্য ইনি সুযোগ্য শিক্ষক রাখিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই ইনি সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার জন্য তাঁহার গুরুদেবের নাম করণে 'মধুসূদন চতুষ্পাঠী" নামক একটী টোল স্থাপন করিয়াছেন।

ইনি প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রী৺জীউর পূজার সময় দেব সেবাদির কোন ত্রুটী হইতেছে কিনা তাহার স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করেন। ইনি বাহ্যাড়ম্বর শূন্য, চরিত্রবান, সংযমী ও ব্রহ্মচর্য্যানুরাগী।

মহান্ত শ্রীমনোহর শরণ দেব

বাল্যকাল হইতে ইহার উদার প্রকৃতি ও সরল ব্যবহার সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এই সকল সদ্‌গুণাবলী দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভবিষ্যতে ইনি ধর্ম্ম ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি সর্ব্বগুণ বিভূষিত হইয়া প্রকৃত মহান্ত স্বরূপে রাজগঞ্জ অস্থলের কীৰ্ত্তি কলাপ আরও সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন।

ভূসম্পত্তির আয় হইতে এই অস্থলের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ভূসম্পত্তির আয় ব্যতীত এই অস্থলের আর কোন প্রকার আয় নাই। উক্ত আয়ের অধিকাংশই দৈনিক দেব সেবার, অতিথি সেবার ও গো সেবার যে পদ্ধতি আছে তাহাতে ও দান কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বৰ্দ্ধমান রাজগঞ্জ অস্থলে অতিথি অভ্যাগত সমেত প্রায় ২০০ শত লোক দৈনিক ভোজন করিয়া থাকেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অভ্যাগত সাধু ও দরিদ্রগণকে তাহাদের আবশ্যক মত আটা, ঘৃত, চাউল, দাইল ও লবণ প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীত বহু সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্থলে আসিয়া পৌছিলে তাহাদের উপযুক্ত রূপ আহারাদির ও থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং সাধু সন্ন্যাসী-গণের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা আছে। এই রাজগঞ্জ অস্থলে ও ইহার অন্তর্ভুক্ত কাঞ্চননগর, চুচুড়া, ইন্দাস, চারিগ্রাম, গোপীনাথপুর প্রভৃতি স্থানের দেবালয়ে, ভোগ ও সদাব্রতের জন্য মোট দৈনিক প্রায় ৭ সাত মন চাউল ও অৰ্দ্ধ মণ ময়দা ও তদুপযুক্ত ঘৃতাদি ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই অস্থলে গো সেবার সুচারুরূপ বন্দোবস্ত আছে এবং প্রায় ২ দুই শত গোধন প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই গো সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ কারণ বাৎসরিক দশ হাজার টাকা খরচ হয়। এই অস্থলে শ্রীশ্রী৺জীউগণের রথ যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, বিজয়া দশমী, অন্নকোট, রাস যাত্রা, দোল যাত্রা, হরিসংকীর্ত্তন (চব্বিশ প্রহর) প্রধান উৎসব হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মাসে

মাসে দেবতাগণের জন্মতিথি, কর্ণাগত বর্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব ও ক্রিয়াদিতে বহু টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

এই অস্থলের ও ইহার অধীনস্থ উথ্‌রা, জয়দেব, কৈঁহুলি, আড়ংঘাটা, চেতুয়া ও লোহাগঞ্জ শাখা অস্থল সমূহের মহান্তগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত। এই শ্রীশ্রী৺নিম্বার্ক দেব শ্রীশ্রী৺হংসভগবানের শিষ্যানুশিষ্য এই অস্থল স্থাপক শ্রীশ্রী৺নরহরি দেব উক্ত হংস ভগবান হইতে পর্য্যায়ক্রমে একচত্বারিংশ শিষ্য। উক্ত হংস ভগবান হইতে ৺নরহরি দেব পর্য্যন্ত ৪১ জন মহাপুরুষের শিষ্যানুশিষ্য পর্য্যায় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তালিকা।

১। শ্রীশ্রীহংস ভগবান
২। ,, সনকাদি ভগবান
৩। ,, নারদ ভগবান
৪। ,, নিম্বার্ক ভগবান
৫। ,, নিবাসাচার্য্য
৬। ,, বিশ্বাচার্য্য
৭। ,, পুরুষোত্তমাচার্য্য
৮। ,, বিলাশাচার্য্য
৯। ,, স্বরূপাচার্য্য
১০। ,, মাধবাচার্য্য
১১। ,, বলভদ্রাচার্য্য
১২। ,, পদ্মাচার্য্য
১৩। ,, শ্যামাচার্য্য
১৪। ,, গোপালাচার্য্য
১৫। ,, কৃপাচার্য্য
১৬। ,, দেবাচার্য্য
১৭। শ্রীসুন্দর ভট্ট
১৮। শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট
১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট
২০। শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট
২১। শ্রীবামন ভট্ট
২২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভট্ট
২৩। ,, পদ্মাকর ভট্ট
২৪। ,, শ্রবণ ভট্ট
২৫। ,, ভূরি ভট্ট
২৬। ,, মাধব ভট্ট
২৭। ,, শ্যাম ভট্ট
২৮। ,, গোপাল ভট্ট
২৯। ,, বলভদ্র ভট্ট
৩০। ,, গোপীনাথ ভট্ট
৩১। ,, কেশব ভট্ট
৩২। ,, গঙ্গল ভট্ট
৩৩। ,, কেশব কাশ্মির ভট্ট
৩৪। ,, শ্রীভট্ট
৩৫। ,, হরিব্যাস দেব
৩৬। ,, স্বভূরাম দেব
৩৭। ,, কন্থর দেব
৩৮। ,, মথুর দেব
৩৯। ,, শ্যাম দেব
৪০। ,, সেবা দেব
৪১। ,, নরহরি দেব

এই অস্থলের স্থাপক নরহরি দেব হইতে এই অস্থলে ও ইহার শাখা উখড়া, জয়দেব, কেঁদুলি, চেতুয়া, আড়ংঘাটা ও সোহাগঞ্জ অস্থলে যাঁহারা ক্রমান্বয়ে গদিনসীন মহান্ত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে যাঁহারা মহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের একটী তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

রাজগঞ্জ অস্থলের স্থাপক।

উখরা অস্থল

বর্দ্ধমান অস্থলের স্থাপক শ্রীশ্রী৺নরহরিদেব জীউর দুই শিষ্য ছিলেন, দয়ারামদেব ও সুখরামদেব। দয়ারামদেব তাঁহার গুরুর আদেশানুসারে ব্যবসাদি করিবার উদ্দেশ্যে সন ১১১০ সালে তাঁহার শিষ্য পূর্ণদেব সমভিব্যাহারে জেলা বর্দ্ধমান সেরগড় পরগণার অন্তর্গত উখরা নামক স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তিনি উখরা আসিবার কালীন একটী শালগ্রামসহ গোপাল মূর্ত্তি বিগ্রহ আনয়ন করেন। উক্ত মূর্ত্তি বর্ত্তমানে উখরায় যে অস্থল আছে; তথায় স্থাপন করেন। উক্ত গোপাল মূর্ত্তি বিগ্রহ ও শালগ্রাম আজ পর্য্যন্ত উখরা অস্থলে বর্ত্তমান আছেন। দয়ারামদেব নানা প্রকার ব্যবসা করিলেও তাঁহার ঘৃতই প্রধান ব্যবসা ছিল; ঐ ঘৃত সময়ে সময়ে বর্দ্ধমান অস্থলে পাঠাইতেন। এইরূপ ব্যবসা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক কিছু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও উক্ত অর্থের সাহায্যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর নদের উত্তরপার্শ্বে রাতুড়া মৌজায় প্রায় ২৫১/• বিঘা পতিত ভূমি কৃষিকার্য্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার ঐরূপ অসীম উদ্যমে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুর উক্ত ২৫১/• বিঘা পতিত ভূমি উক্ত দয়ারাম দেবকে ফসল ছাড় দেন, তৎপরে তিনি উক্ত পতিত জমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিয়াছিলেন। ১১৪৭ সালে তিনি তাঁহার শিষ্য পূর্ণদেবকে উখরা অস্থলে মহান্ত মনোনীত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

পূর্ণদেব গোস্বামী—

পূর্ণদেব গোস্বামী ১১৪৭ সালে উখরা অস্থলে মহান্ত পদে অভিষিক্ত হন। তিনি বাক্‌সিদ্ধ, দৈবশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি অনেক সম্পত্তি খরিদ ও বন্দোবস্তসূত্রে অস্থলের আয়বৃদ্ধি করেন। ১১৫১ ও

১১৫৮ সালে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুরের অধীন উখরা মৌজায় পূর্ব্ব দখলি ২৭৭/০ বিঘা জমি নির্দ্দিষ্ট খাজনায় মোকররী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনিও ব্যবসা কার্য্য করিতেন। উক্ত কারবার ও বন্দোবস্তীয় জমির উৎপন্ন হইতে অস্থলের অনেক আয় বৃদ্ধি করেন; তিনি ১১৮০ সালে তাঁহার প্রিয় শিষ্য মনসারাম দাসকে মহন্ত নির্ব্বাচিত করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

মনসারাম দাস মহন্ত।

পূর্ণদেব গোস্বামীর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার নিয়োগানুসারে তাঁহার শিষ্য মনসারাম দাস ১১৮০ সালে উখরা অস্থলে মহন্তপদে অভিষিক্ত হন; তিনি তীক্ষবুদ্ধিশালী, সুপণ্ডিত ও বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন; তিনিও ঐ আয় হইতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহন্তগণের আমলে যে সকল সম্পত্তি দখলে ছিল; তাঁহার সময়ে ঐ সকল সম্পত্তি লইয়া অনেক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ইনি স্বীয় বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় গুণে ঐসকল সম্পত্তি উদ্ধার করেন; বর্ত্তমান মন্দির তিনি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহ এখনও এই অস্থলের প্রধান বিগ্রহ বা দেবতা বলিয়া গণ্য। ইহার অনেক শিষ্য ছিল। তাঁহার খরিদা সম্পত্তির মধ্যে তাঁহার শিষ্য লছিমন ও বসন্তরাম দেবের নামে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া-ছিলেন। এই মহাপুরুষ ১২৪০ সাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে মহন্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার শিষ্য রাধাকৃষ্ণ দাসকে ভাবী মহন্ত মনোনীত করিয়া পরলোক গমন করেন।

রাধাকৃষ্ণ দাস মহন্ত।

রাধাকৃষ্ণ দাস মহন্ত ১২৪০ সাল হইতে তাঁহার গুরুর নির্দ্দেশ মতে মহন্তপদে অভিষিক্ত হইয়া ১২৪৮ সাল পর্য্যন্ত গদিনসীন মহন্ত ছিলেন।

তিনি পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সময়ে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া, অস্থলের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ৭ বৎসর দেবোত্তর ষ্টেট পরিচালন পূর্ব্বক ১২৪৮ সালে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

বালকরাম দাস মহন্ত মহারাজ।

বালক রাম শরণ দেব পূর্ব্ব মহন্ত রাধাকৃষ্ণ দেবের গুরুভ্রাতা ছিলেন। রাধাকৃষ্ণ মহন্তের উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় তাঁহার গুরুভ্রাতা বালকরাম শরণ দেবকে মহন্ত মনোনীত করিয়া যান। বালকরাম শরণ দেব ১২৪৮ সাল হইতে ১২৫৩ সাল পর্য্যন্ত অত্র অস্থলে মহন্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য না থাকায় আপন গুরুভ্রাতা রামশরণ দেবকে মহন্ত নির্দ্দেশ করিয়া মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করেন।

রামশরণ দেব।

পূর্ব্বোক্ত মহন্তর পরলোক প্রাপ্তির পর, মহন্ত রাম শরণ দেব ১২৫৩ সালে তৎপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আমলে অস্থলের অনেক আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি বেশীদিন ইহ জগতে থাকিয়া মহন্তের কার্য্য করিতে অবসর পান নাই। ইনি ১২৬০ সালে আপন গুরুভ্রাতা দেবকী নন্দন দাসকে মহন্ত মনোনীত করিয়া পরলোক গমন করেন।

দেবকীনন্দন দাস মহন্ত মহারাজ।

দেবকীনন্দন দাস শান্তিপ্রিয় ও সৌম্যমূর্ত্তি মহন্ত ছিলেন। ইনি ১২৬০ সাল হইতে ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত মহন্ত পদে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত আয় হইতে অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়া অস্থলের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাঁর আমলে সাধু সেবাদির সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ১২৭৯ সালে তিনি আপন শিষ্য হরদেব দাস ও রাম নারায়ণ শরণ দেব উভয়কেই মহন্ত পদে নিযুক্ত করিয়া, ইহ জগত পরিত্যাগ করেন।

হরদেব দাস মহান্ত।

হরদেব দাস মহন্ত মহারাজ ১২৭৯ সাল হইতে ১২৮৬ সাল পর্য্যন্ত মহন্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সাহসিক ও প্রখর বৈষয়িকবুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। যদিও তিনি কোন সম্পত্তি অর্জ্জন করেন নাই তথাপি আপন বুদ্ধিবলে অস্থলের সম্পত্তির আয় হইতে সাধু সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া তহবিলে টাকা কিছু মজুত রাখিয়া যান। ১২৮৬ সালে তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

রামনারায়ণ শরণ দেব মহন্ত মহারাজ।

রামনারায়ণ শরণ দেব মহান্ত নিষ্ঠাবান, অধ্যবসায়ী, জিতেন্দ্রিয়, পরিশ্রমী ও দৈবশক্তি বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারায় অস্থলের চতুর্গুণ আয় বৃদ্ধি করেন। ইনি কৃষি কার্য্য বিষয়ে এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যের দ্বারা দেব সেবাদি নির্ব্বাহ হয়। তাঁহার ঠাকুরের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল ও তিনি সোনা রূপার বহু অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা অতি অল্প ছিল। তিনি কখনও দিবাভাগে নিদ্রা যান নাই। ধর্ম্মোপদেশ আলোচনায় দিবার অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার আমলে অস্থলের যাবতীয় পাকা ইমারত আদি তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে এরূপভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণকেও বর্ত্তমান ইমারত দর্শনে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার দৈবশক্তির কথা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একদা তিনি ঝুলনযাত্রার সময় ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালী ভোজন করাইবার জন্য ৩০।৪০ মণ চাউল ও তৎপরিমাণ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইলে ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে দৈবক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অনবরত মুসলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকে। তাঁহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি নষ্ট হইবার উপক্রম দেখিয়া

তাঁহার মন অতিশয় চঞ্চল হয়। পরে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীকে অনুমতি করেন যে, "ব্রাহ্মণ আদি ডাকাইয়া ভোজনের ব্যবস্থা কর, আমি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, ব্রাহ্মণভোজন ও কাঙ্গালী ভোজন সমস্ত সমাধা হইলে পর, আমাকে সংবাদ দিবে, তৎপূর্ব্বে আমার নিকট কেহ যেন না যায়"। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি একেবারে থামিয়া যায়, সেই অবসরে ব্রাহ্মণভোজন সমাপ্ত করিয়া, কাঙ্গালীভোজন আরম্ভ করা হয়; যতক্ষণ কাঙ্গালীভোজন শেষ না হইয়াছিল ততক্ষণ এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয় নাই। কাঙ্গালী ভোজন শেষ হইলে তাঁহার আদেশানুসারে মন্দিরে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়; তিনি সংবাদ পাইবামাত্র মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ বাহিরে আসিবামাত্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ ভূরি বৃষ্টি আরম্ভ হয়, এমন কি উচ্ছিষ্ট পত্রাদি বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া স্থান মুক্ত হইয়া যায়। তাঁহার দৈবশক্তির জন্য সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিল। তিনি রাত্রিকালেও কখনও শয্যোপরি শয়ন করিতেন না, কেবলমাত্র একটি কম্বল, তাঁহার সম্বল ছিল, সেই কম্বলখানি ভূমিতে পাতিয়া শয়ন করিতেন এবং বালিসের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠাসন লইতেন। তিনি কখনও ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করেন নাই এবং কোন ব্যাধি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি দীন দরিদ্রের প্রতি অতি দয়ালু ছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে দীন দরিদ্রলোক আসিলেই তাহাদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন ও অবস্থাবিশেষে পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র দিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ মহন্ত মহারাজের অসীম দয়াগুণে পার্শ্ববর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানের অনেক ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্ব মহন্তের সঞ্চিত অর্থ হইতেও আবশ্যক খরচাদি নির্ব্বাহ করিয়া অস্থলের অবশিষ্ট আয় হইতে ক্রমশঃ অনেক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন। দামোদর নদের উত্তর পার্শ্বে ধুনরা বৃন্দাবনপুর নামক তাঁহার একটি

মহলে পুষ্করিণী না থাকায় প্রজাগণের অতিশয় জলকষ্ট ছিল ও চাষের বিশেষ অসুবিধা হইত। প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ ও চাষের সুবিধার জন্য মহন্ত মহারাজ নিজ হইতে বহু টাকা ব্যয় করিয়া পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ প্রজাগণের মহল মধ্যে কোন কারণে কোন অসুবিধা ঘটিলে তাহা তিনি সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য নিজেই বিশেষ চেষ্টিত হইতেন এবং নিজে অর্থ দিয়াও তাহার সুবন্দোবস্ত করিতেন; প্রজাগণের উপর তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তিনি প্রজাগণের দুঃখে দুঃখিত এবং তাহাদের সুখে সুখী হইতেন। তিনি উখরায় আপনার সীমাস্থিত রাস্তাঘাট নিজ অর্থে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও মেরামত আদি করাইতেন, তিনি আপন শিষ্যগণ মধ্যে উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেবকে মহন্ত পদে মনোনীত করিয়া ১৩২৮ সালের ১৩ই আষাঢ় বেলা ২টার সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে উখরার আবালবৃদ্ধবণিতা, ধনী দরিদ্র সকল ব্যক্তি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে শশ্মান পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; এত লোকের জনতা হইয়াছিল যে শশ্মানে লোক ধরে নাই। উখরা অস্থলের অধীন আরও তিনটি শাখা অস্থল আছে, জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এগেরা ও পণ্ডবেশ্বর এবং জেলা মানভূমের অন্তর্গত কুস্থল; প্রত্যেক অস্থলে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বর্ত্তমান মহন্ত মহারাজ শ্রীব্রজভূষণ শরণ দেব

বর্ত্তমান মহন্ত মহারাজ শ্রীব্রজভূষণ শরণ দেব ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে উখরা অস্থলের মহন্ত মহারাজ রামনারায়ণ শরণ দেবের নিকট শিষ্য হন; তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ২।১ মাস পরে ৬কাশীধাম ও বৃন্দাবনধাম প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণ, বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, অধ্যয়নের পরও আজ পর্য্যন্ত ইনি নানা শাস্ত্রালোচনায় অধিক সময়

সাধু শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব

অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বৰ্দ্ধমান অস্থলের স্বর্গীয় মধুসূদন শরণ দেব মহন্ত মহারাজ ইঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তাঁহার যাবতীয় বৈষয়িক কার্য্যের ভার ইঁহার উপর অর্পণ করেন। ইনি বৰ্দ্ধমানে ১৩২৪ সাল পৰ্য্যন্ত থাকিয়া উক্ত অস্থলের সমস্ত জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুচারুরূপে জমিদারী কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। উথরার মহন্ত মহারাজ অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় তিনি বৈষয়িক কার্য্য দেখিতে অক্ষম হইয়া ১৩২৫ সালে ইঁহাকে বৰ্দ্ধমান হইতে উথরা অস্থলে আনিয়া তথাকার কার্য্যভার ইঁহার উপর ন্যস্ত করেন। ইঁহার গুরুদেব রাম নারায়ণ শরণ দেব মহন্ত মহারাজের স্বর্গ প্রাপ্তির পর ইনি ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসে উথরার গদ্দিনসীন মহন্ত হন। মহন্ত হইবার কালীন বৰ্দ্ধমান চেতুয়া, আড়ংঘাট কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে মহন্ত ও সাধুগণ আসিয়াছিলেন। ইনি তাঁহাদের বিশেষ যত্নের সহিত সৎকার করিয়াছিলেন।

ইনি সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি বিধান কল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইঁহার প্রণীত গ্রন্থাদি জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে শ্রদ্ধেয় মহন্ত মহারাজজী যেরূপ সদনুষ্ঠান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে সকলের বিশ্বাস যে ইঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে সনাতন ধর্ম্মের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ এই অস্থলের প্রধান দেবতা। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দনাথ জীউ, শ্রীশ্রী৺ মদনমোহন জীউ ও শ্রীশ্রী৺ রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ ও বহু শালগ্রাম এই অস্থলে বর্ত্তমান আছেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথি অস্থলে আসিলে মহন্ত মহারাজ তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন আদি করাইয়া থাকেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়

বৈষ্ণবগণ এই অস্থলে তাহাদের ইচ্ছামত বসবাস করিতে পারেন; তাঁহাদের খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র ও শীত বস্ত্রাদির এই অস্থল হইতে দেওয়া হইয়া থাকে; পীড়া হইলে চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করা হয়। ৺ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, গোবর্দ্ধন পূজা ও দোলযাত্রা পর্ব্ব সকল মামুলি প্রথানুসারে সম্পাদিত হয়।

বর্ত্তমান মহন্ত মহারাজের সময় দেবসেবা ও মন্দির সংস্কারাদি যথারীতি সম্পাদিত হইয়া গদির আয় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; তাঁহার মিষ্ট সম্ভাষণে আগত ভদ্র মহোদয়গণ, সাধু, সন্ন্যাসী ও প্রজাবর্গ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই অস্থলে পঞ্চগৌড় মধ্যে আদি গৌড় অথবা কান্যকুব্জ কুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ মহন্ত মনোনীত হইয়া থাকেন। এই প্রথা বরাবর প্রচলিত আছে ও থাকিবে।

উপরোক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই অস্থলের গদিনসীন মহন্তের নিকট শঙ্খ, চক্র-চিহ্নিত মন্ত্রগ্রহণ করিয়া এই মন্দির প্রধান দেবতার পূজাদি করিতে পায় ও উপরোক্ত জাতীয় ব্রাহ্মণ দ্বারায় অন্নের ভোগ হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ভোগাদি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহন্তের অনুমতি লইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইলে তবে প্রধান মন্দিরে ভোগ দিবার যোগ্য হয়।

শ্রীশ্রী৺ হংসনারায়ণের প্রদর্শিত পথ

প্রদর্শিকাচার্য্য।

১। শ্রীহংসভগবান।
২। শ্রীসনকাদি ভগবান।
৩। শ্রীনারদ ভগবান।
৪। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান।
৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য।
৬। শ্রীবিশ্বাচার্য্য।
৭। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্য।
৮। শ্রীবিলাসাচার্য্য।
৯। শ্রীস্বরূপাচার্য্য।
১০। শ্রীমাধবাচার্য্য।
১১। শ্রীবলভদ্রাচার্য্য।
১২। শ্রীপদ্মাচার্য্য।
১৩। শ্রীশ্যামাচার্য্য।
১৪। শ্রীগোপালাচার্য্য।
১৫। শ্রীকৃপাচার্য্য।
১৬। শ্রীদেবাচার্য্য।
১৭। শ্রীসুন্দর ভট্ট।
১৮। শ্রীপদ্মনাভ ভট্ট।
১৯। শ্রীউপেন্দ্র ভট্ট।
২০। শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট।
২১। শ্রীবামন ভট্ট।
২২। শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট।
২৩। শ্রীপদ্মাকর ভট্ট।
২৪। শ্রীশ্রবণ ভট্ট।
২৫। শ্রীভূরি ভট্ট।
২৬। শ্রীমাধব ভট্ট।
২৭। শ্রীশ্যাম ভট্ট।
২৮। শ্রীগোপাল ভট্ট।
২৯। শ্রীবলভদ্র ভট্ট।
৩০। শ্রীগোপীনাথ ভট্ট।
৩১। শ্রীকেশব ভট্ট।
৩২। শ্রীগঙ্গল ভট্ট।
৩৩। শ্রীকেশবকাশ্মিরী ভট্ট
৩৪। শ্রীশ্রীভট্ট।
৩৫। শ্রীহরিব্যাস দেব।
৩৬। শ্রীস্বভূরাম দেব।
৩৭। শ্রীকন্থর দেব।
৩৮। শ্রীমথুর দেব।
৩৯। শ্রীশ্যাম দেব।
৪০। শ্রীসেবা দেব।
৪১। শ্রী নরহরি দেব।

বর্দ্ধমান অস্থল স্থাপক।

৪১। শ্রীনরহরি দেব।

উখড়া।

৪২। শ্রীদয়ারাম দেব।

৪৩। শ্রীপূর্ণ দেব।

৪৪। শ্রীমনসারাম দেব।

৪৫। { শ্রীরাধাকৃষ্ণদেব।
শ্রীবালকরাম দেব।
শ্রীরামশরণ দেব।
শ্রীদেবকীনন্দন দেব।

৪৬। { শ্রীহরি দেব।
শ্রীরামনারায়ণ দেব।

৪৭। শ্রীব্রজভূষণ শরণ দেব।

৪৮। শ্রীরামচরণ শরণ।

ইন্দাস ছোটকুঠী—

শ্রীরামগোপাল শরণ।
৪৭। শ্রীসর্ব্বেশ্বর শরণ।
শ্রীদামোদর শরণ।

বর্দ্ধমান।

৪২। শ্রীসুখ দেব।

৪৩। শ্রীগোপাল দেব।
শ্রীবসন্তরাম দেব।

৪৪। শ্রীউদ্ধব দেব।

৪৫। শ্রীপুরুষোত্তম দেব।

৪৬। শ্রীগোপাল দেব।
শ্রীলাড়লি শরণ দেব।

৪৭। { শ্রীনন্দকিশোর শরণ।
শ্রীগিরিধারী শরণ দেব।

৪৮। শ্রীমধুসূদন শরণ দেব

৪৯। শ্রীমনোহর শরণ দেব।

শ্রীমদনমোহন শরণ লোহাগঞ্জ।

৪২। শ্রীসুখ দেব।

চেতুয়া।

৪৩। শ্রীগোপাল দেব।

৪৪। শ্রীমোহন শরণ।

৪৫। শ্রীচতুর দেব।

৪৬। { শ্রীচৈতন্য শরণ। শ্রীজানকী শরণ।

৪৭। { শ্রীমাধব শরণ। শ্রীকৃষ্ণ শরণ।

৪৮। { শ্রীসুখ দেব। শ্রীবলদেব শরণ।

৪৯। শ্রীমদনমোহন শরণ।

লোহাগঞ্জ

আড়ং ঘাটা

৪৩। শ্রীগঙ্গারাম দেব।

৪৪। শ্রীচরণ দেব।

৪৫। { শ্রীযশোদানন্দ দেব। শ্রীহরিচরণ দেব।

৪৬। শ্রীসুখরাম দেব।

৪৭। শ্রীরঘুনাথ শরণ দেব।

৪৮। শ্রীঅনন্তরাম শরণ।

উপরিস্থা নিম্নস্থস্য গুরুবঃ

একসংখ্যা ভুক্তা

পরস্পর গুরুভ্রাতা

S. D. জ্ঞাপকঃ বর্দ্ধমান মোহন্ত

শ্রীমধুসূদন শরণ দেব শর্ম্মা।

সন ১৩২৩ সাল

মাহ বৈশাখ

রায় শশীভূষণ দে বাহাদুর।

বৌবাজারের মদনগোপাল লেন নিবাসী স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। তিনি ৺মদন গোপাল দে মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। মদনগোপাল বাবু একজন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন এবং দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে ঠাকুরবাড়ী আজও তাঁহার অতুল দান ও ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মদনগোপাল বাবুর ঔরসে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শশীভূষণ বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর। বিলাস ও ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া মানুষ নিজ অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে, শশীভূষণ বাবুর কর্ম্মময় জীবন তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তিনি কলিকাতা সেয়ার মার্কেটে (Share market) স্বীয় অধ্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তিনি এই অর্থ আপন ভোগবিলাসের জন্য গচ্ছিত রাখেন নাই; আপদ বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই নিজের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

মানুষ মরিয়া গেলে তবে তাঁহার যদি কিছু দান থাকে প্রকাশ পায়—কিন্তু শশীবাবুর উদ্দেশ্য বিপরীত। তিনি জীবিত অবস্থায় স্বকৃত ধনের অনুরূপ আনন্দ উপভোগ ইচ্ছায় ১৯২২ সালের ১৭ই মে তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব করেন যে কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি বালক ও একটি বালিকা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক এবং তিনি তাহার অধিকাংশ ব্যয় বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। কর্পোরেশনের সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হইবার পর সভ্যগণ তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি স্বজাতি প্রীতিবশতঃ প্রস্তাব করেন যে দুইটি বিদ্যালয়েই শতকরা অন্যূন ২৫টী আসন সুবর্ণ বণিক

রায় বাহাদুর শশীভূষণ দে

ছাত্র ছাত্রীগণের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইবে। কর্পোরেশন এই সর্ত্তে রাজী হন। তদনুসারে ২৭।১ নেবুতলা লেনে প্রায় এক বিঘা জমির উপর বিদ্যালয় দুইটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে তাঁহার আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে উক্ত বিদ্যালয় দুইটির ভার ন্যস্ত করেন এবং কর্পোরেশনের মাসিক খরচা সহ তিনি উক্ত বিদ্যালয় দুইটির সুচারুরূপ খরচ চালাইবার জন্য মাসিক ২০০শত টাকা সাহায্য করিতেছেন ও করিবেন। বালকদিগের জন্য বিদ্যালয়টির নাম হইয়াছে "শশীভূষণ দে অবৈতনিক বিদ্যালয়" এবং বালিকা বিদ্যালয়টির নাম হইয়াছে "রাজ-রাজেশ্বরী অবৈতনিক বিদ্যালয়"। শশী বাবুর সহধর্ম্মিণীর নাম রাজ-রাজেশ্বরী, তিনি অতি সাধ্বী ও পতিব্রতা রমণী। তাঁহার নাম অনুসারেই উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টির নাম "রাজ-রাজেশ্বরী বিদ্যালয়" রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিতে তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে।

গত ১৩৩০ সালের ২১শে আষাঢ় ইং ৬ই জুলাই ১৯২৩ সালের শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় বঙ্গের গভর্ণর লর্ড লিটন্ উক্ত বিদ্যালয় দুইটীর দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে বিদ্যালয় ভবন পত্র-পুষ্প ও পতাকাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। লর্ড লিটন্ ঠিক পাঁচটার সময় স্কুলের দ্বার দেশে উপনীত হইলে তদানীন্তন মিউনিস-প্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রায় শ্রীশশীভূষণ দে বাহাদুর তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর শশী বাবু লাট সাহেবকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করিলে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় লর্ড লিটনকে শশী বাবুর পরিচয় প্রদান করেন। সুরেন্দ্র বাবু বলেন, কর্পোরেশন বহুদিন হইতে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় শশী বাবু মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়া আংশিক-

ভাবে দেশের অভাব মোচন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় দুইটির কমিটিতে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত ৫ জন ও শশী বাবুর নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবেন। শশী বাবু এই বিদ্যালয় দুইটির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অতঃপর গবর্ণর লর্ড লিটন বাহাদুর উঠিয়া বলেন, দেশের ধনী লোক মাত্রেরই শশী বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দেশহিতকর কার্য্যের জন্য অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি শশী বাবুর মুক্তহস্ততার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর শশী বাবু স্বয়ং উঠিয়া লর্ড লিটনের ধন্যবাদের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং বিদ্যালয় বাটির নির্ম্মাণ কার্য্যে যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরিশেষে গবর্ণর বাহাদুর বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রস্থান করেন। ১৯২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই জনহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। শশী বাবু কলুটোলার স্বনামধন্য ৺সাগরলাল দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা ৺পিতাম্বর দত্ত মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র ৺গোষ্ঠলাল দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা রাজরাজেশ্বরী দাসীর পাণিগ্রহণ করেন।

শশী বাবুর একমাত্র পুত্র ছিল। সেই পুত্র নিতাই ২৫ বৎসর বয়সে পিতা মাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভগবদ্বিশ্বাসী শশীভূষণ বাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতি শান্তভাবে অল্পকাল মধ্যে বুক বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ তাঁহার নিকট সমবেদনা জানাইতে গেলে তিনি বলেন, যার ধন তিনি লইয়াছেন, আমি রাখিবার কে? বস্তুতঃ ভগবানে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং জন্ম-মৃত্যু যে ভগবানেরই ইচ্ছা ইহা তিনি এরূপভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে কেহ কোন দিন তাঁহার রূপে-গুণে অতুলনীয় পুত্রের জন্য একবিন্দু অশ্রুত্যাগ করিতে দেখে নাই। তিনি বলেন, আমার একপুত্র গিয়াছে, শত শত পুত্র আমার রহিয়াছে। বাস্তবিক শশীভূষণ বাবু বালকবালিকাগণকে এরূপ স্নেহ

শ্রীমতী রাজরাজেশ্বরী দাসী

করেন যে তাঁহার নিকট অসঙ্কোচে পাড়ার ছেলে মেয়েরা যাইয়া বসে। স্কুলের ছাত্রদিগকেও তিনি সাক্ষাৎ পুত্রের মত দেখেন এবং তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে পিতৃ-হারা বালক পিতৃ-শোক ভুলিয়া যায়। শশী বাবু যেমন ছেলেদিগকে ভালবাসেন তাঁহার দয়াময়ী, সহধর্ম্মিণীও তদ্রূপ। তাঁহার স্নেহে মাতৃহারাও মাতৃশোক ভুলিয়া যায়। শশীবাবুকে যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার মহত্ত্বের বিষয় ধারণা করিতে পারিবেন না।

শশীভূষণ বাবু দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারিতা, স্নেহ, মমতা, সামাজিকতা ও সৌজন্যের জাজ্বল্যমান নিদর্শন। তিনি অভিমানশূন্য। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, শিষ্টাচারে ও সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্ত্তায় যে কেহই তাঁহার নিকট যায় সেইই তাঁহার উপর মোহিত ও আকৃষ্ট হয়। তিনি অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিরাবলম্বের অবলম্বন, পিতৃ-হারার পিতা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা স্থল। ইহকাল ও পরকালের সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে নিষ্কাম, নিস্পৃহভাবে জীবন যাপন করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় অতি বিরল। শশী বাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু ভোগ বিলাস ত তাঁহার আদর্শ জীবনের লক্ষ্য নহে! ইহ সংসারের ভোগবিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরকালের ঐশ্বরিক আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য তিনি অহরহঃ ভগবানের ধ্যান ধারণা, পূজার্চ্চনা করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পদ সংগ্রহ করিতেছেন। দয়া ধর্ম্মের ন্যায় আর ধর্ম্ম নাই। অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া লোককে জ্ঞানের আলোকে আনিবার জন্য তিনি যে অসামান্য দান করিয়াছেন তাহা দ্বারা দেশের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বিশদরূপে বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশে এখন অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারই নিতান্ত আবশ্যক। শশীভূষণ বাবু দেশের এই একটা মস্ত অভাব বিদূরিত করিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহার নিকট যে কতটা ঋণ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা ভাষায় বলিয়া বুঝাইবার নহে।

শশীভূষণ বাবু বাঙ্গালীর আদর্শ, শশীভূষণ বাবু বঙ্গজননীর সুসন্তান, শশীভূষণ বাবু সত্য সত্যই দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তাঁহার বিন্দুমাত্র অহমিকা নাই। নিতান্ত সামান্য লোকও যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যায়, তাহার সহিতও তিনি অকপটচিত্তে কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহার কথা-বার্ত্তায় ও ব্যবহারে এমন একটু ভাবও পরিব্যক্ত হয় না যে তিনি তাহার উপর একটুও বিরক্ত হইয়াছেন। রাস্তার কুলী মজুরকে পর্য্যন্ত "তুমি" ভিন্ন কখনও তুই বলিয়া কথাবার্ত্তা বলেন না। কখনও রূঢ় কথা প্রয়োগ করিয়া তিনি কাহারও মনে আঘাত প্রদান করেন না। তিনি সত্যবাদী এবং সত্যপ্রিয়। দেব-দ্বিজে তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি আছে ; বস্তুতঃ তাঁহার জীবনটি ধর্ম্ম সাধনার একটি কেন্দ্রস্থল। তাঁহার ভক্তি-পরিপ্লুত চক্ষুর ভিতর দিয়া যেন সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্তি ফাটিয়া বাহির হইতেছে। শশীবাবু নিয়মিত সাত্ত্বিক আহার করেন এবং অতি সদাচারী নিষ্ঠাবান্ ভাবে জীবন যাপন করেন বলিয়া তাঁহার দেহ নীরোগ ও নির্ব্যাধি।

স্বর্গীয় রায় বাহাত্বর নানরাঙ্গা রায় খৈতান

রায় বাহাদুর নানরাজা রায় খৈতান

রায় বাহাদুর নানরাজা রায় খৈতান ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা করেন! তাঁহার বংশ উচ্চশিক্ষার জন্য মাড়োয়ারী সমাজে বিশেষ বিদিত। তিনি জেল বিভাগে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে তিনি ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। এই পদে কোন ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত নিয়োজিত হন নাই। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং জয়পুর রাজ্যে তিনি জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ১৯২২ সালে তিনি শেষোক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। তিনি স্বকৃত-কর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি যে কয়েকটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেশসেবা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে এমন কোন মাড়োয়ারী নাই যে তাঁহাকে না চিনিত। তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এবং তাঁহার বাড়ী হইতে অতিথি কখনও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইত না। ১৯০৫ সালে তিনি "রায় সাহেব" ও ১৯১৪ সালে তিনি 'রায় বাহাদুর" উপাধি পান। তিনিই মাড়োয়ারী আগরওয়ালাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জয়পুরের মহারাজার নিকট হইতে "শেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে "রাজ" বলিয়া সম্বোধন করা হইত। জেলের নিষ্ঠুরতা দূরীভূত করিয়া তিনি কয়েদীদের আহারাদির বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন। তিনি কলিকাতায় ১৯২২ সালে যে নিখিল ভারতীয় মাড়োয়াড়ী আগরওয়ালা মহাসভা হয় তাহার সভাপতিত্ব করেন। তিনি পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইলেও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ়

জ্ঞান ছিল এবং তিনি সমস্ত উপনিষদ ও পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন। সাদাসিদে জীবন যাপন করা অথচ উচ্চ চিন্তা করা তাঁহার জীবনের মন্ত্র ছিল। তিনি জনসাধারণের, হিতার্থে লোক চক্ষুর অন্তরালে ও অগোচরে প্রভূত অর্থ দান করিতেন। তিনি জয়পুরে স্কুল, হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সাতটী পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ খৈতান ১৮৮৭ সালের ১লা মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই এখন তাঁহার জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। দ্বিতীয় পুত্র বাবু দেবীপ্রসাদ খৈতান ১৮৮৮ সালের ১৪ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৯০৬ সালে বি-এ পাশ করেন। তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের সলিসিটর হন। তিনিই কলিকাতা মাড়োয়ারীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সলিসিটর। তাঁহার কোম্পানীর নাম "খৈতান কোম্পানী।" অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ সলিসিটর শ্রেণীভুক্ত হন। তাঁহার সূক্ষ্মবুদ্ধি ও ব্যবসায় বুদ্ধি দেখিয়া প্রসিদ্ধ বিরলা ব্রাদার্স কোম্পানী লিমিটেড তাঁহাকে আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের চারিটি তুলার কলের ও অন্যান্য বিভাগের ভার লইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি এখন বিরলা ব্রাদার্স কোম্পানীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তা, তিনি দেশের জনহিতকর সমস্ত কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। তিনি ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাড়োয়ারী স্কুলের জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে তিনি ঐ স্কুলের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি মাড়োয়ারী এসোসিয়েসনের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য। গত ১১ বৎসর যাবত তিনি এই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি উক্ত স্কুলের অনারারি সেক্রেটারী। এই পদে তিনি ৩ বৎসর কাল কার্য্য করিতেছেন। তিনি বালিকা বিদ্যালয় সাবিত্রী পাঠশালার ভাইস প্রেসিডেণ্ট। তিনি সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েসন্, মহাকালী পাঠশালা, রামমোহন লাইব্রেরী, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি,

ন্যাসনাল লিবারেল লীগ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য। ১৯১৮ সালের জন্য তিনি আইন পরিষদে এটর্ণীদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মাড়োয়ারী সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোড শাসন সংস্কারের অর্থ-নীতি বিভাগে সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বেরার প্রাদেশিক আগরওয়ালা মহাসভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি ১৯২১—২৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। ১৯২২ সাল হইতে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি জাতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় অর্থ অনুসন্ধান কমিটিতে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অর্থ নীতিজ্ঞান বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেই সাক্ষ্যে তিনি কেমন করিয়া বিদেশী বণিকগণ ভারতের ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প নষ্ট করিতেছে সেই বিষয় বলিয়াছিলেন।

তাঁহার তৃতীয় পুত্র কালীপ্রসাদ খৈতান ১৮৯১ সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম্ এ ও বিএল পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। মাড়োয়ারীদের মধ্যে তিনি সর্ব্ব প্রথম উকিল এবং তিনিই মাড়োয়ারীদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ইংলণ্ডে যান। তিনি ১৯০৪ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কয়েকটি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করেন ও পুরস্কার পান। কনষ্টিটিউসন লয়ে তিনি পারিতোষিক পান। তিনি মাড়োয়ারী সমাজের সেচ্ছা সৈনিক (Scout movement) বিষয়ে অগ্রণী ও বড়বাজার সেচ্ছা সৈনিকদের তিনি নেতা। তিনি বালকবালিকাদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র বাবু দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, প্রথম শ্রেণীর এম্‌এ পরীক্ষায় দ্বিতীয়

হন। তিনি বি এল পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনি জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন; বিশেষতঃ শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার পরিশ্রম ও চেষ্টা অসামান্য। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী হন। এখন তিনিই খৈতান কোম্পানীর প্রধান অধ্যক্ষ। তিনি হিন্দী সাহিত্য প্রচারে বিশেষ যত্নবান এবং তাহা সর্ব্বজন বিদিত।

তাঁহার পঞ্চম পুত্র বাবু গৌরীপ্রসাদ খৈতান বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি ক্রিকেট খেলায় বিশেষ সুনিপুণ। খেলোয়াড় মহলে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে।

তাঁহার ষষ্ঠ পুত্র বাবু চণ্ডীপ্রসাদ খৈতান বিএ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন এবং ভবিষ্যতে যে একজন বড় লোক হইতেন তাহার অনেক আভাষ পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু তিনি ২১ বৎসরে মারা যান।

১৭০ বংশ পরিচয়।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাবু ভগবতী প্রসাদ খৈতান ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেসীডেন্সী কলেজ হইতে তিনি ১৯২৪ সালে বি এ পাশ করেন। বয়সে যদিও তিনি এখন ছোট, তথাচ তিনি এখন আপন সমাজের যুবকগণের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

৺গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৺রামশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বরাহনগরের প্রথিতকীর্ত্তি ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নি, ৺জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃস্বসা ৺গঙ্গামণি দেবীকে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে তাঁহার সন্ততিগণের বরাহনগরে বাস। রামশঙ্করের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ৺রাম রতন; মধ্যম ৺রামমোহন ও কনিষ্ঠ ৺হলধর; জ্যেষ্ঠ ভ্রমণ ব্যপদেশে কানপুরে গমন করিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সেই খানে রামরতন কোং নামে কারবার আরম্ভ করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর কারবারটী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় (৺রাম-মোহন মুখোপাধ্যায় ও ৺হলধর মুখোপাধ্যায়) উক্ত কারবার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে একত্রে রামমোহন কোম্পানী নামে উক্ত জাতীয় কারবার আরম্ভ করেন। পরে এই কারবার ৺হলধর মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র ৺গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পরিচালনায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কানপুরে মল্ রোডের উপর রামমোহন কোম্পানীর ফারম্ ছিল। উহাকে লোকে গোলক বাবুর সরাই বলিত, কারণ ভ্রমণ ব্যপদেশে যে কেহ বাঙ্গালী তথায় থাকিতে চাহিলে বিনা ভাড়ায় আশ্রয় পাইতেন। ইং ১৯০৪ সালে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর গোলক বাবুর বংশধরগণের অসীম মনোক্ষোভ ঘটাইয়া উহাঁদের নিকট হইতে ল্যাণ্ড একুইজেসন্ আইনের বলে সমস্ত সম্পত্তিটী খাসদখল করিয়া লয়েন। ঐ স্থানে বর্ত্তমান কারেন্সী আফিস্ (Govt. Currency Office) বিদ্যমান।

৺হলধর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাল্যজীবন অতি আশ্চর্য্যভাবে যাপিত হয়। জেলা হুগলী, মোকাম জনাইতে শিক্ষালাভ উদ্দেশ্যে গমন

করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ ৺রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস বাটীতে প্রত্যহ ইংরাজী উর্দ্দূ অধ্যয়ন করিতেন। ঐ সকল ভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

আহারের নিমিত্ত তথাকার ৺ভগবতী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে নিত্য যাইতেন ও ৺হরমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রতিদিন রাত্রে শয়ন করিতেন।

উনবিংশ বৎসর বয়সে ৺হলধর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিপত্নীক হন। তদবধি ইনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই এবং অতি বিশুদ্ধভাবে জীবন যাপন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ও দানধ্যান করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হন।

ইঁহার একমাত্র পুত্র৺গোলকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও পিতৃপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রভূত দানধ্যান দ্বারা বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা দক্ষিণ হস্তে যাহা দান করিয়াছেন তাহা ইঁহাদের বাম হস্তকে জানিতে দেন নাই; এইরূপ গোপন ভাবেই সর্ব্বদা দান কার্য্য করিতেন।

ইঁহাদের পরিবারবর্গ অদ্যাপিও একান্ন ও একত্রে বরাহনগরে বাস করিতেছেন।

বংশ তালিকা।

আদিশূরের সভায়।

১। শ্রীহর্ষ

২। শ্রীগর্ভ (মুখুটীগ্রাম)

৩। ,,

৪। ,,

৫। „ ০
|
৬। „ ০
|
৭। „ ০
|
৮। „ ০
|
৯। „ ০
|
১০। „ ০
|
১১। „ ০
|
১২। „ ০
|
১৩। „ ০
|
১৪। উৎসাহ মুখ (লক্ষ্মণ রাজার সভা
|
১৫। আহীৎ
|
১৬। উদ্ধব
|
১৭। শীর
|
১৮। নৃসিংহ (ফুলেবাটী)
|
১৯। সর্ব্বেশ্বর
|
২০। মুরারী
|
২১। অনিরুদ্র
|
২২। লক্ষ্মীধর হালদার
|
২৩। মনোহর পণ্ডিত
|

সুসেন জগদানন্দ ২৪। গঙ্গানন্দ (শ্রীহর্ষ হইতে ২৪ পুরুষ)

২৫। রমানন্দ কুলাচার্য্য

২৬। কাশীশ্বর ঠাকুর

২৭। বিষ্ণু

২৮। হরিহর

২৯। কেশব (গোবিন্দপুরের গুড় চৌধুরীর ঘরে বিবাহ করেন, (গাবরায় বাস)

৩০। রঘুনাথ (ইহারা ৮ ভ্রাতা, এক ভ্রাতার নাম রামদেব, ভুলট বংশ নামে পরিচিত, রঘুনাথ ১ দফা ভঙ্গ নলডাঙ্গা রাজবাটী পুনরায় ভঙ্গ বরিষায় সাবর্ণ চৌধুরীর বাটী রঘুনাথের ২৭টী বিবাহ)

৩১। নন্দরাম (বাড়ুতে বাস; ইহারা ১৪টী ভ্রাতা; এক ভ্রাতা মাণিক মানকুণ্ডু বংশ)

৩২। রামশঙ্কর বরাহনগরে রামভদ্র বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা বিখ্যাতনামা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহোদরা গঙ্গামণী দেবীকে বিবাহ করেন

৩৩ হলধর বাস বরাহনগর (কলিকাতা)

ভগবতী, রামরতন, রামমোহন, রামধন, কন্যা রাসমনি,

৩৪। গোলোকচন্দ্র

৩৫। ৺হরিদাস শ্রীতিতুলাল

৩৬। শ্রীকেদারনাথ, ৺অমৃতলাল, শ্রীকৃষ্ণলাল শ্রীদাশরথি

স্বর্গীয় রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র সরকার

রায় সাহেব ঈশান চন্দ্র সরকার।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ইদানীন্তন পবিত্র সনাতন ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে স্বর্গীয় রায় সাহেব ঈশান চন্দ্র সরকার একজন স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ।

ফরিদপুর সহরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোপালপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রাম বহু পূর্ব্বে ভুবনেশ্বরের নদের তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানকালে ভুবনেশ্বরের সমস্ত চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়াছে। বহু জনপদ বিধ্বস্তকারিণী প্রচণ্ড বেগবতী পদ্মা এই গ্রামটীকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য করাল বদন বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় গ্রামটি এখনও পদ্মার গর্ভে বিলীন হয় নাই। অধুনা পদ্মা গ্রামের পাদদেশে একটী কোল রাখিয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। যে স্থানে একদিন ভুবনেশ্বর নদ প্রবাহিত ছিল তাহা এখন এক বিস্তীর্ণ শস্য শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রামে ১২৫৩ সালের ৭ই বৈশাখ তারিখে স্বনামধন্য ঈশানচন্দ্র সরকার জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব বঙ্গে ঈশানচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার উদার অন্তঃকরণ, সরল মধুর ব্যবহার, সাত্বিক প্রকৃতি এবং জাতি নির্ব্বিশেষে ধনদান অনেকেরই পরিচিত। এই ঈশানচন্দ্রের নাম অনুসারে তাঁহার জন্মভূমি গোপালপুরের গ্রামের নাম এখন "ঈশান গোপালপুর" বা "ঈশানপুর" নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ সৎমৌলিক কাশ্যপ গোত্রীয় বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহারা ব্যবসা নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন স্থানে মজুমদার সরকার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে বাস করিতেছেন। গোপালপুরে ঈশানচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষগণ সরকার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

ঈশানচন্দ্রের বংশের পূর্ব্বপুরুষগণই গোপালপুর গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত গোপী

নাথ বিগ্রহের নিত্য ও বিশেষ সেবার জন্য পূর্ব্বকালের ধর্ম্মপ্রাণ রাজগণ-প্রদত্ত নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি গোপালপুর গ্রামে অন্য কাহারও নাই। ইহাই ঈশানচন্দ্রের বাসের প্রাচীনত্বের বিশেষ প্রমাণ।

ঈশানচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ বিগ্রহের ধাতুমূর্ত্তির পার্শ্বে একটি ধাতুনির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি স্থাপিত এবং প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপীনাথ বিগ্রহের নিত্য বসা ও পূজার সঙ্গে এই দশভূজা ও শিবলিঙ্গের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। এই দশভূজা ও শিবলিঙ্গের পূজার জন্য কোন নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি নাই। সুতরাং এতদ্বারা গোপীনাথ বিগ্রহ ভিন্ন অন্য দেব বিগ্রহ যে পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত তাহাই প্রতীয়মান হয়।

রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পিতামহ অমরনারায়ণ সরকার। অমর নারায়ণ সরকার মহাশয়ের তিন পুত্র। প্রথম পুত্র রামকুমার নিঃসন্তান, দ্বিতীয় কৃষ্ণকুমার, তৃতীয় নন্দকুমার। কৃষ্ণকুমার বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত তাঁহার পারস্য ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি স্বীয় গ্রাম সংলগ্ন গোপালপুর নামে পরিচিত বিষ্ণুপুর মদনদীয়া গ্রামের অধিবাসী যশোহর সমাজের ইতনার পদ্মনাভ ঘোষের কুলীনবংশে পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা নবদুর্গার পাণিগ্রহণ করেন। নন্দকুমার ফরিদপুর সহরের দক্ষিণে অবস্থিত আকইন ভাটপাড়া গ্রামে সৎমৌলিক চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। প্রথম জানকীনাথ, দ্বিতীয় ললিতকুমার, তৃতীয় চন্দ্রকুমার। উক্ত জানকীনাথের বর্ত্তমানে ৪ চারি পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম বসন্তকুমার, দ্বিতীয় সুবোধচন্দ্র এম, বি, তৃতীয় নীরদচন্দ্র, চতুর্থ দুর্গাদাস এবং কন্যা সরলাসুন্দরী। উক্ত চন্দ্রকুমারের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও কন্যা হেমনলিনী। ললিতকুমার নিঃসন্তান।

কৃষ্ণকুমার সংসারের উন্নতিকল্পে কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমারের প্রতি সম্পত্তি

রক্ষণাবেক্ষণ ও বাটীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিজে বিষয় কর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার অন্তর্গত মাঝিকান্দা বিনকদীয়া নিবাসী ব্রাহ্মণ তালুকদার রায়বংশের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের জলকর সম্পত্তির গোয়ালন্দের তিন মাইল দক্ষিণ হইতে জালালাদি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশের নায়েবি পদে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণকুমার কার্য্যদক্ষতাগুণে প্রজাবর্গের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিলেন। এই সময় কনিষ্ঠভ্রাতা নন্দকুমারের সহিত জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকুমারের অপ্রণয় ঘটে এবং তাহার ফলে উভয় ভ্রাতা পৃথক হন।

ইহার অল্পকাল পরে কৃষ্ণকুমার উক্ত জলকর সম্পত্তির মালিক কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয়দিগের নিকট হইতে ১২৫২ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই জলকর সম্পত্তিই তাঁহার এবং তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারিগণের প্রধান সম্পত্তি হইল। তাহার কার্য্য দক্ষতাগুণে ইহার আয় আরও বৃদ্ধি হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইল। এই সময়ে তিনি নিজে বিষ্ণুমণ্ডপ-চণ্ডীমণ্ডপ-সন্নিবেষ্টিত বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। কৃষ্ণকুমার ও তাহার সহধর্ম্মিণী উভয়েরই দেবদ্বিজ ও অতিথির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তখন হইতে নিত্য বিগ্রহ সেবা ব্যতীত তাঁহারা প্রচুর অর্থব্যয়ে মহা সমারোহে দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণকুমারের সাত সন্তান। তন্মধ্যে তিনটি কন্যা ও চারিটি পুত্র, প্রথম হরমণি, দ্বিতীয় ধণমণি, তৃতীয় সূর্য্যকুমার, চতুর্থ গিরিশচন্দ্র, পঞ্চম কৈলাসচন্দ্র, ষষ্ঠ স্বর্ণময়ী, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র। কৃষ্ণকুমার ও তাঁহার পত্নী উভয়েরই কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। এই নিমিত্ত পুত্র ও কন্যার বিবাহ কুলীনবংশেই সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যাকে গহেরপুর গুহবংশের গোলকচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যাকে ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার অধীন

গৌরদীয়া নিবাসী কচুরায়ের বংশধর বিষ্ণুচরণ গুহরায় মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন। অপর কন্যা স্বর্ণময়ীর বিবাহ বঙ্গজ কায়স্থ আলগীর চক্রপাণি বসুবংশে দ্বারকানাথ বসু মহাশয়ের সহিত সম্পন্ন করেন।

১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা দশমীতে কৃষ্ণকুমার কিশোর বয়স্ক কৈলাশচন্দ্র ও চতুর্থ বর্ষীয় বালক ঈশানচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে নবদুর্গার বিপদের সীমা থাকিল না। অত বড় বৃহৎ সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং জামাতা বিষ্ণুচরণ রায় মহাশয়কে আনিয়া তাঁহার হস্তে সম্পত্তি তত্ত্বাবধারনের ভার অর্পণ করিলেন। কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলে প্রবেশ করিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার পরমায়ু অতি অল্প ছিল, প্রথম যৌবনেই তিনি অমরধামে যাত্রা করেন। পুত্র-শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন তখন বালক ঈশান চন্দ্র। মায়ের স্নেহে ঈশানচন্দ্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। নবদুর্গা ঈশানচন্দ্রকে আর দূরে রাখিতে সাহস করিলেন না এবং ঈশানচন্দ্রও কোন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন না।

জননীর অত্যধিক স্নেহে ঈশানচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষায় বিশেষ বাধা উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি প্রকৃতি হইতে অব্যাহত শক্তি ও যে প্রতিভা লাভ করিয়াছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা সর্ব্বতোভিমুখী হইয়া ইংরেজী শিক্ষার অভাব-জনিত হৃদয়ের শূন্য স্থান পরিপূরণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার অজ্ঞাতসারে কুটীল সংসারের অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া যশের পথে তাঁহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়সে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে না করিতেই সৌভাগ্যদিগন্ত ভাস্কর আলোকহস্তে তাঁহার গন্তব্যপথের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি

তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালেই তিনি তাঁহার সম্পত্তি ও বৃহৎ সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ঈশানচন্দ্র বাখরগঞ্জ জেলার বাঁকাই মঠবাড়ীর বসুবংশের ৺তিলকচন্দ্র বসু মহাশয়ের রূপলাবণ্যময়ী কন্যা গিরিজাসুন্দরীর সহিত পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইলেন।

বিষ্ণুচরণ রায় মহাশয়ের কর্তৃত্বের সময় সংসারের বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; তবে সম্পত্তির কোন অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল না। ঈশানচন্দ্র তাঁহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিবার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হয় এবং এই সময় হইতেই জলকর সম্পত্তির আয় আশাতীত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈত্রিক জলকর সম্পত্তির অন্তর্গত নদীতে চড়ার বাহুল্য প্রযুক্ত এতদিন মৎস্য ধরিবার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছিল। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্রের ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে এই সকল অসুবিধা দূর হওয়ায় মৎস্য ধরিবার আর কোনই অসুবিধা থাকিল না। এতদিন এই সকল নদনদীতে মৎস্যজীবিগণের সমাগম ছিল না, কিন্তু এখন হইতে ঢাকা বিভাগের—এমন কি সুদূর চট্টগ্রাম হইতেও ধীবরগণ আসিয়া এই সকল নদনদীতে মৎস্যের ব্যবসা আরম্ভ করিল। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে লাইন গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিভিন্ন স্থানে মৎস্য প্রেরণের জন্য স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সব কারণে মৎস্যের ব্যবসার উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। ঈশানচন্দ্রের জলকর সম্পত্তির আয়ও আশাতীত বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত অর্থাগমে ক্ষণকালের জন্যও ঈশানচন্দ্রের মনে ধনগর্ব্ব কি পদমর্য্যাদার ছায়াটি পতিত হয় নাই। ঈশানচন্দ্রের মনোহর কান্তি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, যেমন লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিত, তাঁহার সারল্য ও মিষ্ট ভাষা তেমনি তাহাদিগকে

মুগ্ধ করিত। একদিকে যেমন তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল অন্যদিকে তেমনি তিনি ও তাঁহার জননী সদাব্রত, অতিথিসৎকার, যাগ যজ্ঞ, দেব পূজা এবং মুক্তহস্ত দানে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। ঈশানচন্দ্রের গৃহে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষানুষ্ঠিত দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। কিন্তু তিনি ইহাতেও সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন; মাতার আদেশে জগদ্ধাত্রী এবং তৎপর অন্নপূর্ণা পূজার অনুষ্ঠান করিলেন। শক্তি মন্ত্রের উপাসক হইয়াও মাতা ও পুত্রের হৃদয় বৈষ্ণবোচিত উপাদানে গঠিত ছিল। এই নিমিত্ত তাঁহারা জগদ্ধাত্রী এবং অন্নপূর্ণা পূজায় পশুবলি পরিহার করিয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্র পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরবর্গের ভোজনের নিমিত্ত যেরূপ অপর্য্যাপ্ত ব্যয় করিতেন তাঁহার অনুষ্ঠিত এই পূজা উপলক্ষে সেইরূপ ব্যয়েরই ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় সঞ্চয়ের পরিমাণ ধনাগমের তুলনায় অতি অল্পই হইত; কিন্তু সেজন্য ঈশানচন্দ্র একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না।

ঈশানচন্দ্রের প্রথমা পত্নী গিরিজাসুন্দরীর গর্ভে ঈশানচন্দ্রের ছয়টী সন্তান জন্মগ্রহণ করে; তন্মধ্যে দুইটি কন্যা ও চারিটি পুত্র। (১) শরৎচন্দ্র (২) রাজলক্ষ্মী, (৩) ক্ষীরোদচন্দ্র, (৪) সতীশচন্দ্র, (৫) পূর্ণচন্দ্র, (৬) সরোজিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান অতি অল্প বয়সেই পরলোক গমন করে। সরোজিনীর জন্মের পর হইতেই গিরিজাসুন্দরীর মৃতবৎসা দোষ ঘটে এবং তাঁহার শেষ সন্তান অস্ত্রোপচার দ্বারা নিষ্কাষণ করার ফলে তিনি ক্ষত রোগে আক্রান্ত হন এবং এই ব্যাধিতেই গিরিজাসুন্দরী স্বামী-পুত্র রাখিয়া ১২৯৩ সালের পৌষমাসে স্বর্গারোহণ করেন। ঈশান-চন্দ্র পুত্র কন্যার শোক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির এই নির্ম্মম কশাঘাত তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইল। তিনি ভগ্ন হৃদয়েও চন্দ্রধেনু

উৎসর্গ এবং প্রতি পুত্রের দ্বারা একটী করিয়া রৌপ্য ষোড়য অনুষ্ঠান করতঃ মহাসমারোহেই গিরিজাসুন্দরীর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

বঙ্গাব্দের ১২৯৪ সনের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের বংশধর টাকীশ্রীপুর নিবাসী ৺উমাচরণ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহোদরা শ্রীমতী শরৎকামিনীকে পুনরায় বিবাহ করেন। শরৎকামিনী শ্রীপুর বালিকা বিদ্যালয় হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় পারিতোষিক পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকপট সরল হৃদয়, পরদুঃখকাতরতা, চিত্তহারিণী মিষ্টভাষা প্রভৃতি গুণরাজি তাঁহাকে নূতন সংসারে শীঘ্রই সকলের নিকট প্রিয় করিয়া তুলিল। ঈশানচন্দ্র ও তাঁহার মাতা এই পরম গুণবতী বধূকে পাইয়া গিরিজাসুন্দরীর অভাবজনিত শোক বিস্মৃত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে ঈশানচন্দ্রের প্রথম পরিণয়ের তৃতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১২৯৬ সালের আষাঢ় মাসে ঈশানচন্দ্র তাঁহার আদরের কন্যা সরোজিনীকে দশমবর্ষেই বানরিপাড়া (কুন্দিহার) নিবাসী মদনমোহন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রথম পুত্র যদুনাথ গুহ ঠাকুরতার সহিত বিবাহ দেন। ঐ একই দিনে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্রের শুভ পরিণয় গাভা নিবাসী নবীনচন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের কন্যা কুসুমকুমারীর সহিত সম্পন্ন হয়। এই উভয় বিবাহ অতিশয় ধুমধামের সহিত প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। জামাতা যদুনাথের উচ্চ শিক্ষার ভার ঈশানচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিবাহোপলক্ষে তিনি জামাতাকে যে যৌতুকাদি অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা সেই সময়ে চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৩০৪ সালের আষাঢ় মাসে ঈশানচন্দ্র তাঁহার প্রথম পরিণয়ের কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র সরকারের পরিণয় উজপুরনিবাসী

অশ্বিনীকুমার বসু রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা হেমলতার সহিত সম্পন্ন করেন।

ঈশানচন্দ্রের সম্পত্তির আয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি তাঁহার জলকর সম্পত্তির আয়তন ও ভূসম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতিথি সৎকার ও দানের জন্য তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে প্রসারিত হইতেছিল। ঈশ্বরপরায়ণা মাতা ও গুণবতী পত্নীর জন্য তাঁহার সংসার স্বর্গের ন্যায় সুখ-শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

খরস্রোতা স্রোতস্বতী সম্মুখে বাধা প্রাপ্ত হইলে যেমন তাহার জলরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ স্ত্রীপুত্রনিধন জনিত শোকের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ক্লিষ্ট হইলেও এই মহাপুরুষের অসীম পুরুষকার বলে কর্ত্তব্যের উৎসাহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ইংরাজী শিখিতে পারেন নাই এ কষ্ট তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল, মনের এই কষ্ট দূরীভূত করিবার জন্য ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারে তিনি প্রয়াসী হইলেন। কর্ম্মবীরগণের অভিলষিত কার্য্য কখনও ব্যর্থ হয় না। ঈশানচন্দ্রেরও এই আশা ফলবতী হওয়ার সুযোগ দেখিতে দেখিতেই উপস্থিত হইল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন গুরু ও পুরোহিতগণ ভালরূপে সংস্কৃত শিক্ষা না করিয়াই নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র সমূহ প্রায়ই অশুদ্ধ এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ অসম্পূর্ণ হয় বলিয়া আশঙ্কা করিতেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি তাঁহার পুরোহিত বংশের সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ৺নবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে পূজাদি ক্রিয়া কলাপ করিতে নিযুক্ত করিলেন। জন সাধারণের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে স্বীয় বাটীতে নিজ ব্যয়ে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিলেন। মহামহোপাধ্যায়

ঈশান বিদ্যালয়
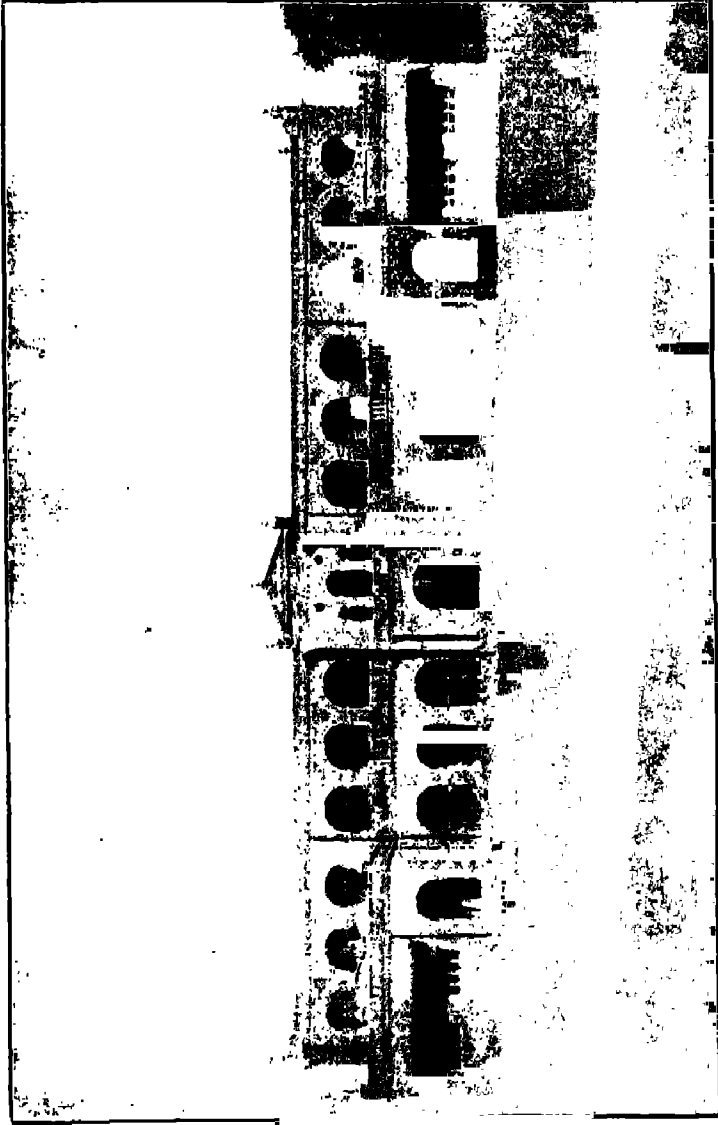
৺রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের প্রিয় ছাত্র যাদবচন্দ্র গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। প্রায় ৬০ জন ছাত্র এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত। ঈশানচন্দ্র তাহাদের সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ফরিদপুরে হিন্দু ইনষ্টিটিউসন নামক একটী উচ্চ ইংরাজা বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু উহার অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছিল। উহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ এবং শিক্ষক নিয়োগের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না। এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ মধ্যে বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত ৺মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়ে প্রথমতঃ পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, যদি এই বিদ্যালয়টী বিদ্যোৎসাহী ঈশানচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করা যায় তাহা হইলে বিদ্যালয়ের মৃতপ্রায় জীবনটী রক্ষা হইতে পারে। ইহারা উভয়েই ঈশানচন্দ্রের স্নেহের পাত্র; ঈশানচন্দ্র তাঁহাদের প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না তাহা তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, কারণ ঈশানচন্দ্র যে বিদ্যোৎসাহী পুরুষ তাহা তাঁহারা বিশেষ জানিতেন। তাঁহাদের এই প্রস্তাব বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানাইলেন এবং তাঁহারা সকলেই অনুমোদন করিলেন। তখন ঈশান চন্দ্রের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল। ঈশানচন্দ্র যে সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন, আজ তাঁহার ভাগ্য দেবী অপ্রত্যাশিতরূপে সেই সুযোগ তাঁহার সম্মুখে উত্থাপিত করিলেন ঈশানচন্দ্র আহ্লাদের সহিত এই গুরুতর ভার গ্রহণ করিলেন। ঈশানচন্দ্র প্রভূত অর্থব্যয়ে বিদ্যালয় গৃহ পুনর্গঠন এবং উপযুক্ত আসবাব পত্র ও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের অভিপ্রায় অনুসারে বিদ্যালয়ের নাম "ঈশান ইনষ্টিটিউসন" রাখা হইল।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটী সত্য ঘটনার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক

হইবে না। নিজের একটী মোকদ্দমা উপলক্ষে ঢাকা জজ কোর্টের সাক্ষীমঞ্চে অন্যান্য সাক্ষীর মত একবার ঈশানচন্দ্রকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। ঈশানচন্দ্রের উকীল এই দৃশ্যে দুঃখিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া জজ সাহেবের নিকট প্রতিপন্ন করিলেন যে, এই ঈশানচন্দ্র একজন দানবীর, বিদ্যোৎসাহী ও মহাপুরুষ। তখন জজ সাহেব উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ঈশানচন্দ্র বাবুই কি ফরিদপুর ঈশান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা"? জজ সাহেব গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি মানীর মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অতিশয় আদরের সহিত তাঁহাকে সাক্ষীমঞ্চ হইতে নামিতে বলিলেন ও নিজের এজলাসের উপর দক্ষিণ পার্শ্বে কেদারার উপর তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইলেন। ঈশান বাবু ফরিদপুর প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বাবুর সহিত দেখা করেন এবং তাঁহার নিকট এই কথা বর্ণনা করিয়া তিনি আবেশভরে বলিয়াছিলেন "মাষ্টার মহাশয়! তখন যে কি একটা অনাবিল আনন্দ স্রোত আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে লাগিল তাহা সম্যক বুঝিতেই পারিয়াছিলাম না। তখন মনে হইল যে এত শুধু স্কুল নয়—এ বিদ্যালয় আমার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র"। ইহাকেই বলে মহাপ্রাণতা।

ঈশানচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের পরিচালনের ভার গ্রহণাবধি বিদ্যালয়ের কার্য্যসমূহ সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। উপযুক্ত শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইলেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ছাত্রগণ প্রতি বৎসর বিশেষ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুন তারিখে বঙ্গের মহামান্য ছোটলাট বাহাদুর স্কুল পরিদর্শনান্তে ঈশানচন্দ্রের এই সকল সদ্ব্যয় জন্য তাঁহাকে সম্মান সূচক একখানা প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। অনন্তর বহু পরিবর্ত্তনের পর গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে নির্ব্বাচিত সুযোগ্য মেম্বারগণ কর্ত্তৃক গঠিত কমিটির হস্তে এই বিদ্যালয় পরিচালনার

ভার ন্যস্ত হয়। তদানীন্তন ফরিদপুরের মাননীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ উকীল অম্বিকাচরণ মজুমদার ও স্কুলের সুযোগ্য সেক্রেটারী উকীল শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও প্রযত্নে ৯২০ সনে ইষ্টক-নির্ম্মিত দ্বিতল সুদৃশ্য স্কুলভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ঈশান ইনষ্টিটিউসান বঙ্গদেশে একটি প্রসিদ্ধ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ঈশান ইন্‌ষ্টিটিউশান ফরিদপুরে ঈশানচন্দ্রের অক্ষয় কীর্ত্তি।

ঈশানচন্দ্রের আতিথেয়তার অনেক কাহিনী লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়। দ্বিপ্রহর রজনীতেও তাঁহার গৃহ হইতে অতিথি ফিরিয়া যায় নাই। কত দুঃস্থলোক যে তাঁহার সাহায্য পাইয়াছে তাহার সীমা নাই। তিনি দানের জন্য দান করিতেন, দান করিয়া নাম করিবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না; তাই এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা অন্যের অগোচরে গোপনে তাঁহার হস্ত প্রসারণ করিতেন। তাঁহার বড় দুই একটী দানের কথা তাঁহার পুত্রগণও জানিতেন না। তাঁহার পরলোক গমনের বহু পরে অন্যের নিকট হইতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর ফরিদপুরের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া যায় যে ফরিদপুরস্থ জুবিলি পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকের ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলী তাঁহারই অর্থের দ্বারা নির্ম্মিত।

ফরিদপুরের অন্তঃপাতি নিমতলা গ্রাম নিবাসী শশীভূষণ রুদ্র নামক একব্যক্তির প্রতি নরহত্যা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শশীভূষণের স্ত্রী শিশুসন্তান সহ ঈশানচন্দ্রের গৃহে উপনীত হন; তাঁহার মাতা নবদুর্গা ও পত্নী শরৎকামিনীর নিকট পতির, প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করেন। এই প্রাণভিক্ষার অর্থ হাইকোর্টে আপীলের মোকদ্দমা পরিচালনার্থ প্রচুর অর্থ সাহায্য। ঈশানচন্দ্রের মাতা ও পত্নীর হৃদয় এই অসহায়া নারীর কাতর ক্রন্দনে ও সকরুণ প্রার্থনায় দ্রবীভূত হইল। নবদুর্গা তাঁহার

পুত্রকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া বলিলেন "এই হতভাগিণী তাহার পতির প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছে। প্রাণরক্ষা করা ভগবানের হাত, কিন্তু উহার পতির প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এই শরণাগতা নারী আর এই অসহায় শিশুদিগকে আমার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছি। তুমি অবিলম্বে যে বন্দোবস্ত করা দরকার তাহা কর"।

ঈশানচন্দ্রের মাতৃ আদর্শে অনুপ্রাণিত হৃদয়ও এই করুণ কাহিনীতে গলিয়া গেল, তাহার পর মাতার আদেশ! মাতৃভক্ত ঈশানচন্দ্র অম্লান বদনে এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষকে শশীভূষণের পক্ষে নিযুক্ত করিলেন। ভগবান পতিপরায়ণা রমণীর কাতর প্রার্থনা ও সাত্বিক দানের মাহাত্ম্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। হাইকোর্ট হইতে শশীভূষণের মুক্তির আদেশ হইল। ঈশানচন্দ্র, তাঁহার মাতা ও পত্নীর চেষ্টা ফলবতী হইল। শশীভূষণ কারামুক্ত হইবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া ঈশানচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইলে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপে ঈশানচন্দ্রের পদধূলি লইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "মানুষ কিছুই করিতে পারে না, ভগবান তোমার মুক্তি বিধান করিয়াছেন। তবে যদি কেহ নিমিত্তের কারণ হইয়া থাকে তিনি আমার পরমারাধ্যা মাতা। আমি কেবল মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছি মাত্র। তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে তোমার মুক্তির সংবাদ প্রদানে সুখী কর"।

শশীভূষণ তাহাই করিল।

ঈশানচন্দ্রের জীবনে তাঁহার মাতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার দেবদ্বিজপরায়ণা দেবীরূপিনী মাতার মতই তাঁহার জীবনের আদর্শ গঠিত হইয়াছিল। মাতার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি

ঈশান দাতব্য চিকিৎসালয়
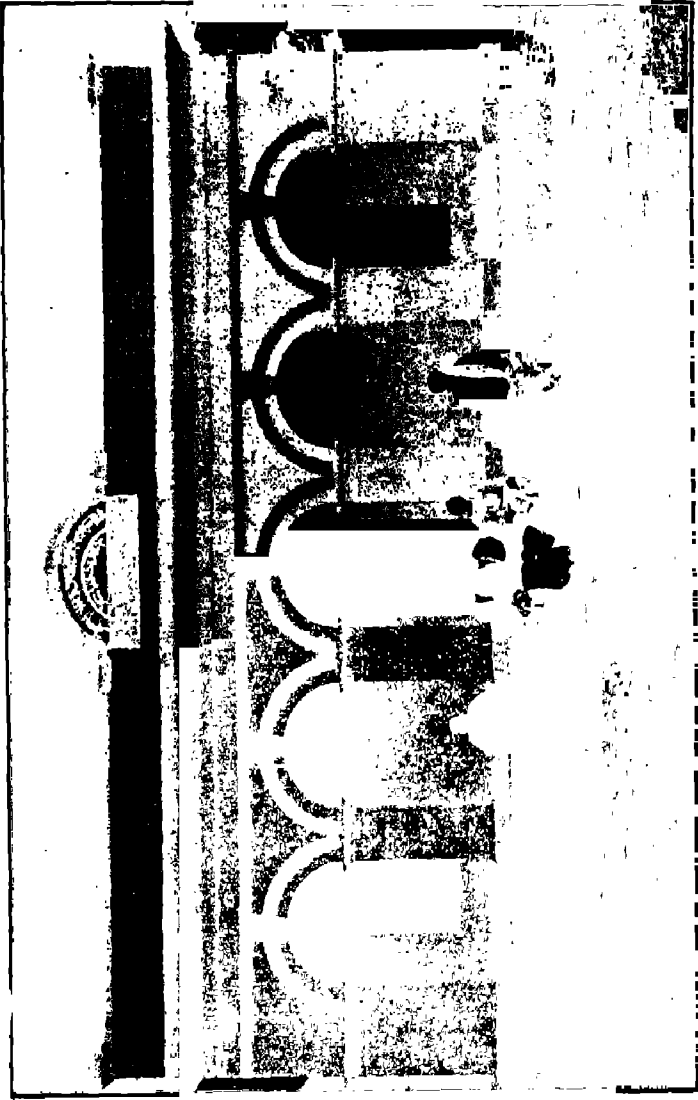
আনন্দের সহিত তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেন। নবদুর্গাপতির মৃত্যুর পর ভাগ্যচক্রের প্রতিকূল পরিবর্ত্তন স্বত্বেও এবং সংসারের শত সহস্র ঝঞ্ঝাবাত মধ্যেও স্বামীর অনুষ্ঠিত দেব দেবী অর্চ্চনা ও অতিথি সৎকারের কোনরূপ অঙ্গহানি ঘটিতে দেন নাই। এই উচ্চ আদর্শ ঈশানচন্দ্রের নিকট কোনদিনও ম্লান হয় নাই এবং ধ্রুব তারার ন্যায় তাঁহার জীবন যাত্রার পথ প্রদর্শক ছিল। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাতার এই সকল শুভকার্য্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি এতই প্রগাঢ় ছিল যে তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করতঃ স্বীয় জীবন পবিত্র মনে করিয়াছিলেন।

১৩০৭ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নবদুর্গা স্বর্গারোহণ করেন। শবদাহকার্য্য বাটীর নিকটেই একস্থানে সম্পাদন করা হয় এবং ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে ঈশানচন্দ্র মাতৃশ্মশানের উপর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাসিক আদ্য শ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ ধামে সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে ঈশানচন্দ্রের বাটীর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এবং নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ও কলিকাতার বহু বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অন্যূন চারি সহস্র মুদ্রাব্যয়ে এই আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

পরবর্ত্তী বৎসর নিজের গৃহে ঈশানচন্দ্র মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার এই কার্য্যে প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সমগ্র বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতবর্গ ও সুদূর কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মহাশয়গণের সংখ্যা ছয়শতের অধিক ছিল। এই বৃহৎ ব্যাপার উপলক্ষে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে গোপালপুর গ্রামে সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে আবাসের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধে যে সকল

তৈজসপত্র দান করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ ধন্য ধন্য করিয়াছিল ; সহস্র সহস্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন ও ভোজনের ব্যাপার সম্পন্ন হইলে ঈশানচন্দ্র অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ও উপস্থিত দরিদ্রদিগের আশাতীত বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অশ্রুতপূর্ব্ব দানের কথা লোকমুখে সর্ব্বত্রই ঘোষিত হইতে লাগিল। এইরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এতদঞ্চলে লোকে আর ইহার পূর্ব্বে দেখে নাই। এখনও এই অনুষ্ঠানের কথা ফরিদপুরের সর্ব্বত্রই লোকমুখে ও ভট্টের গাথা কবিতাতে শুনিতে পাওয়া যায় এবং শুনিলেও মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। ইহার কিছুদিন পরে ঈশানচন্দ্র অগ্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া গয়ায় গমন করেন এবং গয়ায় মাতার পিণ্ড দান করিয়া নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নবদুর্গার বৃদ্ধাবস্থায় সংসারের সকল ভার শরৎকামিনীর উপর পতিত হয়। এই মহিলা পরম সৌভাগ্যবতী ও বহু গুণের আধার ছিলেন ; শরৎকামিনীর কর্ম্মকুশলতা ও সুব্যবস্থায় সংসারের উন্নতি হইতে লাগিল। ঈশানচন্দ্রের গৃহ স্বর্গ সদৃশ সুখের স্থান হইয়া উঠিল।

শরৎকামিনীর গর্ভে ঈশানচন্দ্রের ৮টী সন্তান হয়। তন্মধ্যে ৪ কন্যা ও ৪ পুত্র। (১) সুবর্ণপ্রভা (২) ইন্দুভূষণ (৩) শৈলবালা (৪) প্রেমলতা (৫) জ্যোতিশচন্দ্র (৬) ধীরেন্দ্রনাথ (৭) সুপ্রভা (৮) সুরেশচন্দ্র।

কায়স্থসমাজে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভাতশালা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকুমার ঘোষের প্রথম পুত্র বিধুনাথ ঘোষের সহিত সুবর্ণপ্রভার বিবাহ হয়। ঢাকা জিলার রাজখাড়া নিবাসী কায়স্থ দত্ত মুন্সী বংশের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বনামধন্য নন্দকুমার দত্ত মুন্সী মহাশয়ের পৌত্র সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সীর সহিত শৈলবালার বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ সুবর্ণপ্রভা বিবাহের পর মাত্র সাত বৎসর জীবিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সরকার

তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পিতামাতা শোকে অভিভূত হইলেন। বিধুনাথের সহিত তাঁহাদের তৃতীয়া কন্যা প্রেমলতার বিবাহ দিয়া পূর্ব্ব সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিলেন।

দশম বৎসর বয়সে ইন্দুভূষণ পিতৃ-পরিচালিত ঈশান ইনষ্টিটিউশানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সরল স্বভাবের জন্য শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। ঈশানচন্দ্র তাঁহার দুই পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াও তাহাতে লব্ধকাম না হইয়া বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। ইন্দুভূষণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখিয়া পিতামাতা উভয়েই যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইলেন। এইরূপে সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে ঈশানচন্দ্র তাঁহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। কমল তুলিতে কণ্টকের আঘাত প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। ঈশানচন্দ্রের জীবনে ক্রমশঃই তাহা সঙ্ঘটিত হইতে লাগিল অথবা ভগবান যেন তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে বরণ করিয়া লইবার অভিলাষে ক্রমিক শোক তাপে তাঁহার দেবদুর্লভ স্বাস্থ্য জীর্ণ শীর্ণ করিয়া মহাযাত্রার পথে প্রস্থানের উপযোগী করিয়া লইতেছিলেন। ভগবানের এই গূঢ় রহস্য সাধনের জন্য এই সময়ে ঈশানচন্দ্রের জীবনাকাশে মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহার পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্র কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। কলিকাতায় লইয়া সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াও কোন ফল হইল না। ১৩১৩ সালে ২৩শে শ্রাবণ তারিখে ক্ষীরোদচন্দ্র অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এই বজ্রঘাত ঈশানচন্দ্রকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। তিনি বয়স্ক পুত্রের উপর বৈষয়িক কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া কিছু-দিনের জন্য বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন, আবার সে গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যে ভীষণ আঘাত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা তিনি জানিতেন না। ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরেই

তাঁহার পত্নী শরৎকামিনী ১৩১৯ সালের শ্রাবণ মাসে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সময়ে ইন্দুভূষণ দেওঘরে ছিলেন। শরৎকামিনী নিজে এইরূপ কাতর হইয়াও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী পুত্রের লেখাপড়ার বাধা পড়িবে আশঙ্কায় এতদিন ইন্দুভূষণকে সংবাদ দিতে দেন নাই। তৎপর রোগ বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে সেই সংবাদে ইন্দুভূষণ বাড়ী আসিলেন এবং পৌছানর অব্যবহিত পরেই শরৎকামিনী ১৩১৯ সালের ১১ই আশ্বিন তারিখে শুক্রবার ৮ দিনের একটী শিশুপুত্র রাখিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ইন্দুভূষণের জন্যই যেন তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা এখন মহাশূন্যে মিশিয়া গেল।

১৩২০ সালে ২রা বৈশাখ ঈশানচন্দ্রের প্রথম পক্ষের অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র পূর্ণচন্দ্র তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঈশানচন্দ্র তাহার বৃদ্ধ বয়সে এই প্রবল আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। ঈশানচন্দ্রের বড় সুখের সংসার অভাবনীয় দুঃখময় হইয়া উঠিল। পত্নী ও উপযুক্ত পুত্রশোকে তাঁহার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সময় হইতে তিনি এক দুরারোগ্য জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণও তাঁহার ব্যাধি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে ১৩২২ সালের ১৫ই বৈশাখ বুধবার শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে পুণ্যময় পবিত্র তীর্থ কাশীধামে ঈশানচন্দ্র সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সুখ ও দুঃখের অতীত পুণ্যময় লোকে মহাপ্রস্থান করিলেন।

ঈশানচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। যদি পাপপুণ্যের বিচার থাকে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন মূল্য থাকে, তবে পরলোকে ন্যায় অন্যায়ের বিচারক জগতপিতা পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার অর্জ্জিত পুণ্যের পুরস্কার তিনি অবশ্যই পাইয়াছেন। আর ইহলোকে তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে—এমন

কি নিভৃত পল্লীগ্রামে নিরক্ষর লোকের মুখেও তাঁহার কীর্ত্তিকাহিনী শ্রুত হয়। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্য কলাপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ১৯১৫ সালের ৩রা জুন তারিখে "রায় সাহেব" উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার আত্মা মরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ঈশানচন্দ্রের পুণ্যময় স্মৃতি রক্ষার্থ ফরিদপুর-বাসী তাঁহার তৈলচিত্র অঙ্কিত করাইয়া ঈশান ইনষ্টিটিউসনে স্থাপিত করিয়াছেন এবং ১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসে বঙ্গের গভর্ণর মহামান্য লর্ড লিটন মহোদয় কর্ত্তৃক উহার আবরণ উন্মোচন ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী শরৎকামিনীর প্রথম পুত্র ইন্দুভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। শিশুকাল হইতে পিতার দেব দ্বিজ ভক্তি, আতিথেয়তা, দরিদ্র বাৎসল্য ও পরোপকার ব্রত দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে ঐ সকলগুণের প্রভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকায় তিনি সর্ব্ব প্রকারেই পিতার গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পিতার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তাঁহার বিবাহ ১৩২৪ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে যশোহর সমাজস্থ টাকি সৈয়দ-পুর নিবাসী সিবিল সার্জ্জেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের ৪র্থ কন্যা শ্রীমতী নিলিমা সুন্দরীর সহিত সম্পন্ন হয়। ইন্দুভূষণ লোকালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া দেশের ও দশের উপকার করিতেছেন। তিনি স্বীয় গ্রামে পঞ্চ সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহার পিতৃস্মৃতি চিহ্ন স্বরূপে ঈশান দাতব্য চিকিৎসালয় নামে ১৩২৯ সনে একটী সুদৃশ্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়ের অধিকাংশ বহন করিতেছেন। পরে ১৩৩০ সালে স্বীয় মাতৃশ্মশানে মাতৃস্মৃতি রক্ষার্থ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ১৯২৩ সনের আগষ্ট মাসে তিনি ২১০০৲ টাকা ঈশান

স্কুল কমিটির হস্তে অর্পণ করেন; উহার সুদ হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রতিবৎসর যে ছাত্র ঐ স্কুল হইতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে তাহাকে "ঈশান স্কলারসিপ্" নামে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মিষ্ঠ যুবক ও সৎসাহসী, তাহার কার্য্যাবলী দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে. ধর্ম্মপ্রাণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি স্বীয় গন্তব্য পথ প্রতিভালোকে উদ্ভাসিত করিয়া অদূর ভবিষ্যতে পিতার কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন।

তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ১৩৩০ সনের ৩রা আষাঢ় যশোহর সমাজস্থ টাকি সৈয়দপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিভাময়ীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। মৃত ক্ষীরোদচন্দ্রের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের ১৩২৫ সনের মাঘ মাসে ত্রিপুরা জেলার অধীন বিদঘর গ্রামে দেওয়ান বাড়ীর জমিদার ৺বিমলচন্দ্র রায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। উক্ত ক্ষীরোদচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শুধাংশুবালার সহিত ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে যশোহর সমাজ অন্তর্গত টাকিনিবাসী শ্রীযুত নীলরতন গুহ রায় চৌধুরীর প্রথম পুত্র শ্রীপঞ্চানন গুহ রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভার সহিত ১৩২৪ সনের অগ্রহায়ণ মাসে পাবনা জেলার অন্তর্গত উদয়পুর নিবাসী শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রথম পুত্র শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ বি এল মহাশয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। মৃত পূর্ণচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী আশালতার ১৩৩০ সনের বৈশাখ মাসে টাকিনিবাসী শ্রীযুত সত্যচরণ গুহ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পুত্র চন্দ্রশেখর গুহ রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা জ্যোতিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদচন্দ্রের পুত্র ক্ষীতিশচন্দ্র তাঁহার তত্বাবধানে থাকিয়া বিষয় কার্য্য দেখিতেছেন।

বংশ তালিকা।

হরিরাম সরকার
বিষ্ণুরাম সরকার+রাজেশ্বরী
অমরনারায়ণ+জয়মণি
রামকুমার সরকার
কৃষ্ণকুমার+নবদুর্গা
নন্দকুমার+সোণামণি
ধৈর্য্যকুমার
গিরিশচন্দ্র
কৈলাসচন্দ্র
ঈশানচন্দ্র+(১) গিরিজাসুন্দরী
(২) শরৎ কামিনী
শরৎ
ক্ষীরোদ
সতীশ
পূর্ণ
ক্ষিতীশ
প্রফুল্ল
প্রমথ
ইন্দুভূষণ
জ্যোতীশ
ধীরেন্দ্র
সুরেশ
সত্যভূষণ
জানকীনাথ+কমলকামিনী
লালত
চন্দ্রকুমার
সুরেন্দ্র
বসন্ত
সুবোধ
নীরোদ
দুর্গাদাস
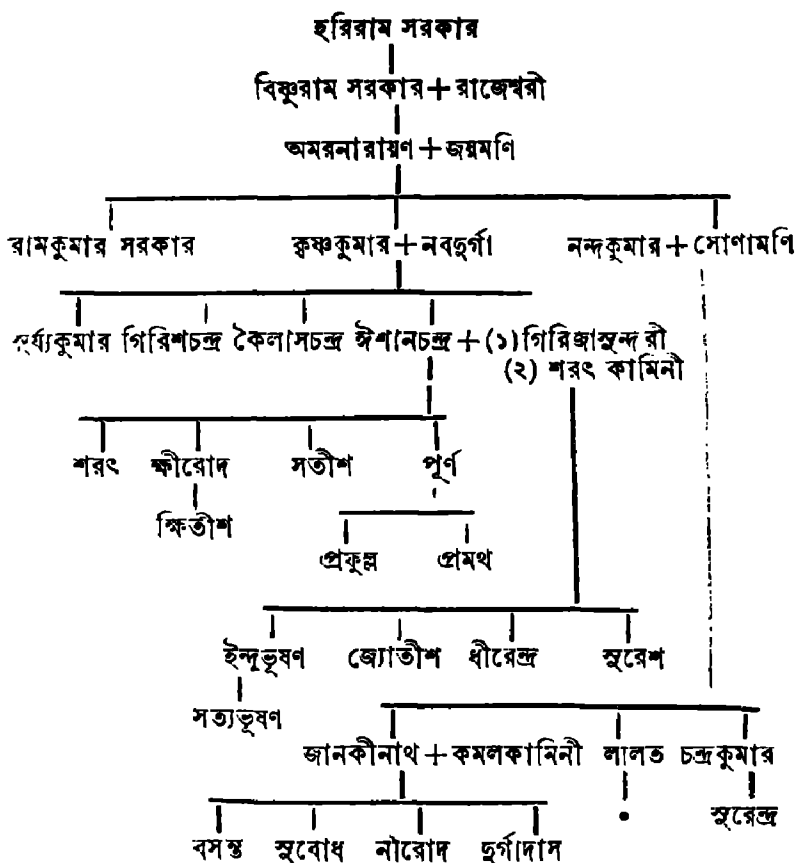
৺চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে কয়েকজন বাঙ্গালী দেশ-মাতৃকার সেবাকে জীবন যাত্রার অঙ্গীভূত করিয়া আপনাকে ধন্য করিয়াছিলেন, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। চন্দ্রমোহন ১২১৮ সালে ৩০ শে আষাঢ় (ইং ১৮১১ সালের জুলাই মাসে) কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটীতে মাতামহ আশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা রাসবিলাসী দেবী রামমণি ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকা নাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। চন্দ্রমোহনের পিতা ৺ভোলানাথ দেশবিখ্যাত চন্দন-নগরের নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায় বংশসম্ভূত। তখনও তাঁহারা নেড়োরমনে আসেন নাই। তাঁহারা তখন চন্দননগরের বিবির হাটে বাস করিতেছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত কুলীন। তাঁহারা খড়দহ মেলভুক্ত চৈতল চাটুতি মহেশের সন্তান বলিয়া নিজেদের কুল পরিচয় দেন। কান্যকুব্জাগত বীতরাগের পৌত্র সুলোচন চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিপুরুষ। সুলোচনের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বাঙ্গাল লক্ষ্মণ সেন পূজিত কুলীনদের অন্যতম। বাঙ্গালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ চৈতলী হইতে চৈতল চাটুতি পরিবারের উৎপত্তি। চৈতলী হইতে গণনায় অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ মহেশ তর্কপঞ্চানন। মহেশের প্রপৌত্র বেচারাম বা কালীচরণ চন্দননগরে আসিয়া বিবিরহাটে বাস করেন। সেইখানে ভদ্রাসনে বেচারামের পৌত্র ভোলানাথের জন্ম হয়। ভোলা-নাথের পিতা রামসুন্দর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ে দর্পনারায়ণ ঠাকুর চন্দননগরে তাঁহার অধীনে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই কারণে গোপীমোহন ঠাকুর উত্তরকালে

৺চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ভোলানাথ সম্পর্কে জামাতা হইলেও নিজের গদিতে উঠাইয়া লইয়া একাসনে বসিতেন। রামসুন্দরের দুই পুত্র—রামসেবক ও ভোলানাথ। রামসুন্দর ভোলানাথকে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য করিবার জন্য কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় বাসা করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। তখন রেলওয়ের সৃষ্টি হয় নাই। প্রতি শনিবারে বাটী যাওয়া ও সোমবারে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তিনি নিজের পান্‌সী নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন সেরবোরন সাহেবের স্কুলের নাম ডাক যথেষ্ট। এই স্কুল চিৎপুর রোডের উপর বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ বাটির নিকটে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাটীতে ছিল। ভোলানাথ এই স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। এই স্কুলে দ্বারকা নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথের সহিত ভোলানাথের পরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাহার ফলে তিনি প্রায়ই রাধানাথের সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন। ভোলানাথের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সুশ্রী গঠনে রাধানাথের পিতা রামমণি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার কুলমর্য্যাদা জানিয়া নিজ দ্বিতীয়া কন্যা রাসবিলাসী দেবীর সহিত বিবাহ দেন। এই পিরালী কন্যা বিবাহে ভোলানাথ পিতৃগৃহ ও স্ব-সমাজ ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে বাধ্য হন। এইখানে তাঁহার মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন নামে দুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে তিনি দণ্ডী হইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন ও চতুর্দ্দশ বৎসর পরে হরিদ্বারে দেহ রক্ষা করেন। ভোলানাথের সংসার ত্যাগের সময়ে মদনমোহনের বয়স ৯।১০ এবং চন্দ্রমোহনের বয়স ৪।৫ বৎসর ছিল। চন্দ্রমোহন প্রথমে বাটীতে গুরু মহাশয়ের নিকট বাংলা লেখা পড়া শেখেন। পরে সেরবোরণ সাহেবের স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া রাজা রাম মোহন রায়ের হেড়ুয়ার স্কুলে এবং রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে তাঁহার নিকট ইংরাজি ও কিছু পার্সি পড়িয়া চন্দ্রমোহনের ছাত্রজীবন শেষ হয়। রাজা রাম মোহন রায় তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন এবং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধা-

প্রসাদের সহিত চন্দ্রমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিতও ঐ সময় হইতে চন্দ্রমোহনের যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয় তাহা আজীবন সমভাবে ছিল।

এই সময় চন্দ্রমোহন ব্যায়াম, অশ্বচালনা, সন্তরণ ও অস্ত্র পরিচালনা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পুরুষোচিত বিদ্যায় পারদর্শী হন। তিনি এতদুর কষ্ট সহিষ্ণু হইয়াছিলেন যে একবার পদব্রজে কলিকাতা হইতে যশোহরে যান এবং তথা হইতে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় পদব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই সময় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করেন, কিন্তু তিনি নিয়মিত আয়ের উপায় যতদিন না হইবে ততদিন বিবাহ করা অনুচিত বলিয়া আপত্তি করেন। আরও মত প্রকাশ করেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ মদনমোহন বিবাহ করায় তাঁহার দ্বারা বংশ রক্ষা হইবে এবং তিনি নিজে আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া জ্যেষ্ঠের সংসারের উন্নতির জন্য সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার আপত্তিতে যখন কেহ কর্ণপাত করিল না এবং তিনি যখন দেখিলেন যে তাঁহার মাতামহ বংশের তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে যশোহর হইতে পাত্রী আনীত হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইল, তখন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং বিবাহের দিন অতীত করিয়া পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পুনরায় তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিলে, তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন বলায় এবং তাঁহার কথামত কাজ হইবে জানিয়া সকলেই তাঁহার বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

চন্দ্রমোহনের কর্ম্মজীবন প্রথমে ককরেল নামক সাহেব সওদাগর কোম্পানীর কলিকাতা আপিসে আরম্ভ হয়। যখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদাতা লর্ড মেট্‌কাফ্ (তখন সার চার্লস্ থিয়োফাইলস মেটকাফ) আগ্রা প্রদেশের গবর্ণর মনোনীত হন, তখন তাঁহার প্রধান ভারতীয় কর্ম্মচারীর পদে নি[illegible] হইয়া চন্দ্রমোহন আগ্রা

প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে যান। এই পদ চন্দ্রমোহন নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেন এবং পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুর তাঁহার জামিন হন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, সৎসাহস, সততা ও সত্যনিষ্ঠা মেট্‌কাফ্ সাহেবকে এতদূর সন্তুষ্ট করিয়াছিল যে, গবর্ণর সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া চন্দ্রমোহনকে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করিতে বলেন। এইরূপে এক মাসের মধ্যে তাঁহার পদের বেতন দ্বিগুণ ধার্য্য হয়। তাঁহার কার্য্যের অঙ্গীভূত না হইলেও চন্দ্রমোহন এলাহাবাদে অবস্থানকালে স্বেচ্ছায় সহরের রাস্তার উন্নতি ও প্রয়াগ যাত্রীর কোনও কোনও বিষয়ে অসুবিধা দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করেন। তিনি প্রভুর এতদূর প্রিয়পাত্র হন যে একবার তাঁহার জ্বর হওয়ায়, মেট্‌কাফ্ সাহেব ও তৎপত্নী স্বয়ং তাঁহাকে ঔষধাদি খাওয়াইতেন এবং তাঁহার সেবা ও তত্ত্বাবধান করিতেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পদত্যাগের পরে যখন লর্ড মেট্‌কাফ্ গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন, তখন চন্দ্রমোহনও মথুরা, বৃন্দাবন,আগ্রা, দিল্লী,কাশী দেখিয়া ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। উত্তর পশ্চিমে অবস্থান ও ভ্রমণকালে তিনি ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন এবং কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলেন। আগ্রার কোনও চিত্রকরের দ্বারায় ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে নিজের একখানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করান এবং দেবদেবীর কয়েকখানি প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কার ঠাকুর কোম্পানীর আপিসে চাকরী লইলেন। এই সময় আগ্রার গবর্ণরের পদ উঠাইয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গবর্ণরের পদ সৃষ্ট হইল। লর্ড মেট্‌কাফ্ যখন আগ্রার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হইয়া পুনরায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ফিরিয়া যান, তখন চন্দ্রমোহনকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু চন্দ্রমোহন রুগ্না মাতাকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে অসম্মত হন।

চন্দ্রমোহন কার ঠাকুর কোম্পানীতে যখন চাকরী করেন তখন শুনিলেন যে, অনেক দ্রব্যাদি লইয়া কোনও বিলাতি জাহাজ কলিকাতায় আসিতেছে। তখন এইরূপ জাহাজ আসিলে কলিকাতায় সদাগর আপিস সমূহের মধ্যে যে আপিস জাহাজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিতেন সেই আপিসের দ্বারায় জাহাজের দ্রব্যাদি বিক্রীত হইত এবং সেই জাহাজে রপ্তানি দ্রব্যাদি ও জাহাজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও ঐ আপিসের দ্বারায় সংগৃহীত হইত। বাজার দর না জানিয়া কাপ্তেন সাহেবরা ন্যায্য মূল্যের অনেক বেশী দিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। ইহা হইতে বাংলাভাষায় "কাপ্তেনি করা" "কাপ্তেন ধরা" ও "কাপ্তেন ভাসান" প্রভৃতি পদের প্রচলন হয়। জাহাজের কাপ্তেনকে হস্তগত করিবার চেষ্টায় সদাগর আপিসের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে চলিত। অনেক সময় এই উপলক্ষে পরস্পরে দাঙ্গা হইয়া যাইত। চন্দ্রমোহন যখন ঐরূপ জাহাজ আসিবার সংবাদ পাইলেন তখন তিনি অতীব যন্ত্রণাদায়ক কুক্ষিব্রণ রোগে পীড়িত। তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া কারঠাকুর কোম্পানীর লোকজন লইয়া কলাগেছে পর্য্যন্ত যান এবং অন্যান্য আপিসের লোকজনকে হটাইয়া সেই জাহাজ হস্তগত করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং পথে ডাক্তার জ্যাক্‌সন সাহেবের বাটীতে গিয়া ব্রণের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া বাটী ফিরেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায়, মাতুল দ্বারকানাথ তাঁহাদের স্বতন্ত্র আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিতে উপদেশ দেন এবং নিজের বাটীর দক্ষিণে তাঁহার যে নিজের জমিতে আস্তাবল ও হামার বাটী ছিল, তাহা তাঁহাদের দান করেন। ঐ জমির পরিমাণ সাড়ে দশ কাঠা। এই সাড়ে দশ কাঠা জমিও তাঁহার উইলের লিখিত মাত্র দশ হাজার টাক মাতুল দ্বারকানাথের নিকট দুই ভ্রাতার প্রাপ্ত সাহায্যের সমষ্টি। এই জমিতে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে

জ্যেষ্ঠ মদনমোহনের ইচ্ছা হয়, কিন্তু চন্দ্রমোহন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে আরও প্রায় পনেরো ষোল কাঠা জমি ভ্রাতাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। এই জমি সংগ্রহে কোনও কোন ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণের বসতবাটী হইবে শুনিয়া ভূমি বিক্রয় না করিয়া দান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া বসতবাটী নির্ম্মাণ করিতে অস্বীকার করায় জমি পাওয়া দুষ্কর হইল। শেষে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সেই সকল ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের খরিদা মূল্যে বিনালাভে ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিতে সম্মত হইলে, মদনমোহন ঐ সকল জমি ক্রয় করেন। সে সময়ে সমাজের চিন্তাপ্রণালী কিরূপ ছিল, এই ব্যাপার তাহার একটী সুন্দর উদাহরণ। পরে এই সমগ্র ভূমিতে মাতুলালয়ের অনুকরণে মদনমোহনের ভদ্রাসন বাটী প্রস্তুত হয়। মদনমোহন ব্যয়ভার বহন করেন মাত্র, কিন্তু আবাস বাটীর পরিকল্পনা হইতে গঠন কার্য্যের সম্পূর্ণতা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই চন্দ্রমোহন প্রভূত পরিশ্রমের সহিত সম্পন্ন করেন। এ কার্য্যে যশোহর মহাকাল গ্রাম নিবাসী তাঁহাদের আত্মীয় ফকিরচন্দ্র রায় তাঁহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ সাহায্য করেন। ১২৪৬ সালে (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারা দুই ভ্রাতা মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া নূতন বাটীতে আসেন। এই সময় তাঁহাদের দুই ভ্রাতার সৌজন্যে ও সরল ব্যবহারে সে সময়ের জমিদার-বর্গ ও সমাজের অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়।

১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে চন্দ্রমোহন বিলাতে যান। তখন সুয়েজ প্রণালী হয় নাই। তবে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাওয়ার পরিবর্ত্তে সুয়েজ হইয়া ইজিপ্টের মধ্য দিয়া ইউরোপের নেপল্‌স্ ও তথা হইতে জার্ম্মণি ও ফ্রান্সের মধ্য দিয়া লণ্ডন যাইবার পথের ব্যবস্থা কিছুপূর্ব্বেই

হইয়াছিল। চন্দ্রমোহন মাতুলের সহিত এই পথে যাত্রা করেন। ১৮৪২ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ হইয়া ১৮ই জানুয়ারী সিংহল দ্বীপে পৌছেন ও সেখান হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী সুয়েজ পৌছেন ও গাড়ী করিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কায়রো সহরে উপস্থিত হন। সেখানে ষ্টীমার লইয়া নীল নদ বাহিয়া আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া ও মল্‌টা ও সিসিলি হইয়া ১৪ই এপ্রেল তারিখে নেপল্‌স্‌ সহরে পৌছিলেন। সেখানে এক সপ্তাহ কাটাইয়া রোমে যান ও পোপের সহিত পরিচিত হন। রোম হইতে ফ্লরেন্স দেখিয়া তাঁহারা ভেনিসে উপস্থিত হন। সেখান হইতে জার্ম্মণীর নানা দর্শনীয় স্থান দেখিয়া অবশেষে ক্যালে নগরে উপস্থিত হন এবং ডোভার হইয়া ১০ই জুন তারিখে লণ্ডনে পৌঁছিলেন। তাঁহারা যে সকল স্থানে গিয়াছিলেন সেই সকল স্থানের চিত্রশালা কারুশিল্পাগার নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীর কারখানাগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিয়াছিলেন এবং চন্দ্রমোহন তাঁহার ডায়েরিতে সে সকল বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন বিলাতে মাতুলের সহিত না থাকিয়া স্বতন্ত্র হোটেলে থাকিতেন। ব্যবসায়ীদের সহিত ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেন। বিলাতে অবস্থানকালে তাঁহার মাতুলের সম্পর্কে তিনিও সেখানকার রাজপরিবারের ও অন্যান্য অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিবার সুযোগ পান এবং তাঁহার সৌজন্যে সসম্ভ্রম ব্যবহারে ইহাদের অনেক পরিবারের সহিত বিশেষতঃ লর্ড এগলিংটন ও লর্ড চ্যান্সেলার এবং লর্ড লিণ্ডহাষ্টের পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়। স্কট্‌ল্যাণ্ডেরও নানাস্থান তাঁহারা বেড়াইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে গ্লাস্‌গো সহরে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। কোনও নিমন্ত্রণ সভায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে সেইদিনের মাননীয় অতিথি দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর একটী বৃদ্ধ চন্দ্রমোহনের

বিশেষ উল্লেখ করিয়া তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করিয়া সকলকে বিস্মিত ও কৌতূহলী করিয়া তুলিলেন। প্রস্তাবকও তাঁহার প্রস্তাবের হেতু নির্দ্দেশার্থে বলিলেন যে তিনি ভারতবর্ষে সিভিলিয়ানের কার্য্য করিয়া তথায় পেন্সন ভোগ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে একবার তিনি বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু জিলার ডাক্তার সাহেবের সহিত মনোমালিন্য থাকায় ছুটীর জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট কিছুতেই পান নাই। অসুস্থতা বৃদ্ধি হওয়ায়, ছুটির বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলিকাতায় নৌকা করিয়া আসিয়া গঙ্গাবক্ষে অবস্থিতি করেন। তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন যে কলিকাতার কোন পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার সাহায্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট নিজের অবস্থা জানাইয়া তাঁহার সহায়তায় যাহাতে ছুটী পান, তাহার চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পুরাতন বেহারা নৌকা হইতে নামিয়া যায় এবং ঘটনাক্রমে গঙ্গাতীরে চন্দ্রমোহনকে বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করে। চন্দ্রমোহন বেহারার কথা শুনিয়া বৃদ্ধকে দেখিতে নৌকায় যান। তিনি ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড মেট্‌কাফের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা জানান এবং লাট সাহেবের ডাক্তার ও প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় নৌকায় আসেন ও তখন ছুটীর দরখাস্ত লেখাইয়া বৃদ্ধের স্বাক্ষর ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ পেস্ করিয়া লাট সাহেবের দ্বারায় ছুটী মঞ্জুর করাইয়া লন ও সেইদিন নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া ছুটীর মঞ্জুরী খানি বৃদ্ধের হাতে দেন। এইরূপে চন্দ্রমোহন বিশেষ চেষ্টা না করিলে বৃদ্ধকে সেবারে ভারতবর্ষেই অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইত এবং তাঁহার পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না। এই ঘটনার বিবরণ শুনিয়া উপস্থিত সকলেই চন্দ্রমোহনকে বিশেষ সাধুবাদ দিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহার স্বাস্থ্য উদ্দেশ্যে পান করেন।

১৮৪২ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাত ত্যাগ করেন, চন্দ্রমোহনও সেই সঙ্গে ফিরিলেন। ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্যারিস্ সহরে দ্বারকানাথের সহিত চন্দ্রমোহনও ফরাসী দেশের তদানীন্তন অধীশ্বর রাজা লুই ফিলিপ্ ও তাঁহার রাজ্ঞীর নিকট পরিচিত হন। রাজা লুই ফিলিপ্ তাঁহাদিগকে বেল্জিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেখান হইতে চন্দ্রমোহন ফ্রান্স ও ইটালীর অন্যান্য সহর দেখিয়া মাণ্টায় উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারে ১৯শে নভেম্বর তারিখে কায়রো পৌঁছিলেন। সেখান হইতে গাড়ী করিয়া সুয়েজের দিকে যাত্রা করেন। চন্দ্রমোহনের এই সময়ের দৈনন্দিন লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহাদের সহযাত্রী কয়েকজন মহিলা যে গাড়ীতে ছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, চন্দ্রমোহন তাঁহাদিগকে আপন গাড়ীতে বসাইয়া দিয়া নিজে হাঁটিতে আরম্ভ করেন। সে গাড়ীতে কিয়দ্দূর গিয়া এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন যে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়। তখন অতি কষ্টে উট ও গাধা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে কয়েকজনকে উঠাইয়া দেওয়া হয়। চন্দ্রমোহন মরুভূমির মধ্য দিয়া রৌদ্রে ৮।১০ মাইল পদব্রজে যাইয়া, কয়েকজন বোম্বাই যাত্রীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁহাদের সৌজন্যে কিছু সোডা ওয়াটার ও কমলা লেবু পাইয়া কথঞ্চিৎ ক্লান্তি দূর করিবার পরে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করেন। একটি চটিতে পৌঁছিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষার পরে অতি কষ্টে একটি ঘোড়া পান। তাহাতে জিন প্রভৃতি না থাকায় বিনা জিনে ঘোড়ার খালি পৃষ্ঠে চড়িয়া দড়ির লাগামে ঘোড়া চালাইতে আরম্ভ করেন। এইরূপে ১০।১২ মাইল যাওয়ার পরে ঘোড়া বদলের এক আড্ডায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে বাধ্য হন। প্রায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষার পর একখানি গাড়ী পাওয়া যায় এবং তাহাতে তাঁহার ক্লেশের অবসান হয়। তখনকার সময়ে বিলাত যাত্রা কিরূপ কষ্টকর ছিল তাহার একটু আভাস দিবার জন্য আমরা এই ঘটনার বি[illegible]রিত উল্লেখ করিলাম।

যাহা হউক, সুয়েজ পৌঁছিয়া তাঁহারা ষ্টীমারে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন ও ১৫ই তারিখে হস্তীগুম্ফার কারুকার্য্য দেখিতে যান। ১৭ই তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করিয়া ২৫শে তারিখে রামেশ্বর হইয়া ২৭শে তারিখে মাদ্রাজে পৌঁছেন। চন্দ্রমোহনের দৈনন্দিন লিপিতে প্রকাশ যে তিনি স্থলপথে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা ফিরিতেই ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা করিতে পারেন নাই। মাদ্রাজে এক দিন থাকিয়া জলপথে ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। চন্দ্রমোহন কতকগুলি শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কাষ্ঠের প্যানেলের উপর ও দস্তার উপরে ডচ্ প্রণালীতে অঙ্কিত কয়েক-খানি চিত্র ও বিখ্যাত শিল্পী সের অঙ্কিত তাঁহার নিজের চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সময় বিচার ও শাসন সংক্রান্ত বিভাগে গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করা আবশ্যক মনে করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাইবার পূর্ব্বে পুলিশ কমিটীতে সাক্ষ্যদানকালে বিচার ও শাসন সংস্কার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করেন যে সে সময়ে যে শ্রেণীর ভারতবাসী দারোগা নিযুক্ত হইত তাহার অপেক্ষা শিক্ষায় ও সামাজিক পদে যাঁহারা উন্নত ছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান বাছিয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর বিচার কার্য্য ও পুলিশের বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধানের ও শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া উচিত। দারোগারা ইহাঁদের তত্ত্বাবধানে সকল কাজ করিবেন। লাট এলেন্‌বরো এই প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া ইহা কাজে পরিণত করিবার জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি করেন ও তদুদ্দেশ্যে ইং ১৮৪৩ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে এক আইন পাশ করেন। এই আইন অনুসারে ইং ১৮৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে চন্দ্রমোহন প্রথম বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হইয়া মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে

নিযুক্ত হন। অতি অল্পদিনেই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্য কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৪ সালের ১৫ই এপ্রেল তারিখের গেজেটে তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। মুর্শিদাবাদের ও পরে নদীয়ার নানাস্থানে তাঁহার চেষ্টায় ও উৎসাহে রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি লোকহিতকর কার্য্য হইয়াছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে নূতন পুষ্করিণী খনন ও পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া গ্রামবাসীর পানীয় জলের কষ্ট কিরূপে দূর করিয়াছিলেন, এখনও সেই স্থানের দুই একজন প্রচীনের মুখে সে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময় মুর্শিদাবাদে এক লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার সহিত চন্দ্রমোহনকে বাধ্য হইয়া সংস্থষ্ট হইতে হয়। এই সংস্রব একদিকে যেমন বিষাদের চিত্র ফুটাইয়া তোলে, অন্যদিকে চন্দ্রমোহনের অনন্যসাধারণ চরিত্র বলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী গোপাল দফাদারের নৃশংস হত্যায় লিপ্ত বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। রাজবাটী হইতে কতকগুলি বহু মূল্য দ্রব্য অপহৃত হয়। রাজবাটীর কর্ম্মচারীরা এই অপহরণ, গোপালের দ্বারা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে ও সেই সন্দেহের বশে গোপালের উপর অমানুষিক নির্য্যাতন হয় এবং তাহার ফলে গোপালের প্রাণবিয়োগ ঘটে। রাজা কৃষ্ণনাথ, পিতা হরিনাথের মৃত্যুকালে নাবালক থাকায় রাণী হরসুন্দরী তাঁহার অভিভাবকরূপে বিষয়াদির তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কলিকাতায় রাজা হরিনাথের ও রাণী হরসুন্দরীর প্রতিবেশী ও পরামর্শদাতা থাকায় সেই সূত্রে রাজা কৃষ্ণনাথের ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার বর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হইবা মাত্র ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে বিষয়াদির তত্ত্বাবধান নিজ হস্তে লইয়াছিলেন এবং ১৮৪১ সালে "রাজা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে রাজা কৃষ্ণনাথের আগ্রহ

ও আন্তরিক চেষ্টা এবং দেশের নানা কার্য্যে তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর অনেক আশা ভরসা করিয়াছিল। সুতরাং হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগের সংবাদে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। রাজাকে ধরিতে পরওয়ানা জারী হইল এবং পরওয়ানা যথারীতি দারোগার হাওল হইল। দারোগা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে জানাইলেন যে, পুলিশের সাধারণ জমাদার প্রভৃতির দ্বারায় রাজা কৃষ্ণনাথকে গ্রেপ্তার করা সম্ভবপর নয়, কারণ রাজা বহুসংখ্যক সড়্‌কিওয়ালা, লাঠিয়াল ও কয়েকজন বন্দুকধারী আনাইয়া তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছেন ও বাটীর দ্বার বন্ধ করিয়া আছেন। তিনি নিজেও সর্ব্বদা শিকারী কুকুরে পরিবৃত হইয়া পিস্তল লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকেন। এই সংবাদে ম্যাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ চন্দ্রমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি স্বয়ং এই পরওয়ানা লইয়া রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইতে প্রস্তুত আছেন কিনা। উত্তরে চন্দ্রমোহন জানাইলেন যে. রাজা কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তাঁহাদের পরিবারের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা তাহাতে এই কাজ তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টের বিষয় হইবে এবং এ কাজের ভার অন্য কাহারও উপর অর্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তদুত্তরে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে সরকারী কাজে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উত্থাপন করা সঙ্গত নয় এবং শাসন বিভাগে বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিয়া কতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারা যাইবে, এইরূপ স্থলেই তাহার পরীক্ষা হইবে। চন্দ্রমোহন যদি স্বীকার না করেন তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব কর্ত্তৃপক্ষকে সকল অবস্থা জানাইয়া একদল ইংরাজ ফৌজ কলিকাতা হইতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লিখিবেন। তখন চন্দ্রমোহন অগত্যা এই কাজের ভার লইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণনাথের বাটী ঘেরাও করিয়া, রাজার সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। উত্তরে তাঁহাকে জানান হইল যে তিনি যদি একজন মাত্রও পুলিশের লোক না লইয়া একাকী রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে রাজা দেখা করিবার অনুমতি দিতে পারেন। চন্দ্রমোহন তাহাতেই সম্মত হইয়া একাকী রাজার সহিত দেখা করিলেন। রাজার সহিত এ বিষয়ে কথোপকথনের মধ্যে রাজা চন্দ্রমোহনকে বলেন যে চন্দ্রমোহন যদি ম্যাজিষ্ট্রেটকে রিপোর্ট করেন যে তিনি পরোয়ানা জারী করিতে কৃতকার্য্য হন নাই, তাহা হইলে রাজা লক্ষমুদ্রা তাঁহাকে পারিতোষিক দিবেন।

চন্দ্রমোহন এই প্রলোভন অগ্রাহ্য করেন। তিনি সমস্ত অবস্থা জানাইয়া বিশদভাবে রাজাকে বুঝাইয়া দেন যে বলপ্রয়োগ বা ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা পরওয়ানা জারী রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইব না। বরং রাজার গুরুতর অনিষ্ট হইবে। রাজা যদি কলিকাতায় যাইয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করেন তাহা হইলে রাজা মুক্তি লাভ করিবেন বলিয়াই চন্দ্রমোহন বিশ্বাস করেন। বরং যাহাতে রাজা কোনরূপে অপদস্থ বা অপমানিত না হন এবং জামিনে অব্যাহতি পান, চন্দ্রমোহন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। অনেক বাদানুবাদের পরে রাজা এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাতে সম্মত হন। চন্দ্রমোহনের চেষ্টায় ও তাঁহার নিজের দায়িত্বে বেল সাহেব রাজাকে ৫০০০০ টাকা জামিনে মুক্তি দেন। রাজা কলিকাতায় আসিয়া জোড়াসাঁকোতে কাসিমবাজার রাজের যে বাটী আছে (৩৭৪নং অপার চিৎপুর রোড) সেই বাটীতে বাস করেন। চন্দ্রমোহনও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। যাহাতে রাজার বিরুদ্ধে পরওয়ানা রদ হয় বা মোকদ্দমা বেল সাহেবের নিকট হইতে স্থানান্তরিত করা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে তাহার তদ্বির চলিতে থাকে।

তরুণ বয়স্ক রাজা কিন্তু এতদূর বিচলিত হন যে অপমানের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে আত্মহত্যা ভিন্ন অন্য উপায় তাঁহার মনে আসিল না। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর তারিখে রাজা কৃষ্ণনাথ কলিকাতায়

জোড়াসাঁকো বাটীতে পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার পূর্ব্বে একখানি উইল তিনি স্বহস্তে আদ্যোপান্ত লিখিয়া তাঁহার বনিতা (পরে মহারাণী) শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর ভরণ পোষণের জন্য যৎসামান্য ও দুই কন্যার বিবাহের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত কাশিমবাজার ষ্টেট্ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপনকল্পে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া যান যে, তিনি গোপালের নির্য্যাতন বা মৃত্যুর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তথাপি ডেপুটি চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কঠোরতায় অপমানের হাত এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মহারাণী স্বর্ণময়ীর জীবনী লিখিতে বসিয়া এই ঘটনায় চন্দ্রমোহনের দাম্ভিকতা দেখিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিতে পারিয়াছি, তাহা উপরে বিবৃত করিলাম। ইহাতে দাম্ভিকতার কথা দূরে থাক, উৎকোচ প্রত্যাখ্যানে তাঁহার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ব্যতীত অন্য কোন কঠোরতা দেখিতে পাই না। রাজা কৃষ্ণনাথের দুর্ভাগ্যের জন্য যতই সমবেদনা অনুভব করা যায়, চন্দ্রমোহনকে সে কারণে দোষ দিতে পারা যায় না।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৪৬ সালে চন্দ্রমোহন প্রজার উপর অত্যাচারের জন্য একজন নীলকর সাহেবকে কিঞ্চিৎ শাসন করেন। এই নীলকর সাহেব তৎকালীন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর হ্যালিডে সাহেবের আত্মীয়। কলিকাতার কোনও এক নিমন্ত্রণ সভায় হ্যালিডে সাহেব এই নীলকরকে সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য করিতে চন্দ্রমোহনকে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হন এবং উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়। হ্যালিডে সাহেব বিশেষ লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনার পরেই চন্দ্রমোহন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ত্যাগ করেন।

১৮৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াকার আয়র্ল্যাণ্ড এণ্ড কোম্পানীর অংশীদাররূপে চন্দ্রমোহন ব্যবসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই কোম্পানীর সহিত ১৮৪৮ সালে ওয়াকার সাহেবের সংস্রব রহিত হয় এবং কারবারের নাম বদলাইয়া সি এম্, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং হয়। বাণিজ্যে কিন্তু চন্দ্রমোহন লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি লাভে সমর্থ হন নাই। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে ১৮৫০ সালে কারবার তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

তাঁহার আত্মীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বন্ধু রমাপ্রসাদ রায় এটর্ণী জজ এবং এটর্ণী হেজার সাহেবের পরামর্শে ১৮৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে তিনি দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৮৫০ সালের ৬ই এপ্রেল তারিখে মুক্তির প্রথম আদেশ ঐ আদালত হইতে বাহির হয়। এই আদেশের ফলে দেওয়ানি কারাগারের দায় হইতে তিনি মুক্তি লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় গোপাললাল ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন পাওনাদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কতক টাকা দেওয়ায় ১৮৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে (Final discharge) মুক্তির চূড়ান্ত আদেশে তাঁহার তপসিল দেনার দায় হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। ইং ১৮৪৭ সালে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা সহরে মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্ব শাসনের সূত্রপাত করেন। কলিকাতার তদানীন্তন অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে এক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন সার জন পিটার গ্রাণ্ট। এই সমিতি সাধারণতঃ জর সমিতি বলিয়া পরিচিত। ১২ বৎসর নানারূপ অনুসন্ধান করিয়া ও নানালোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইং ১৮৪৭ সালে রিপোর্টের শেষ খণ্ড এই সমিতি প্রকাশ করেন। তাহাতে কলিকাতা সহরের সর্ব্ববিধ উন্নতির নানারূপ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবার জন্য ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের সৃষ্টি হয়। এ আইন আমলে আসিলে গবর্ণমেণ্ট মিষ্টার প্যাটন, মিষ্টার সিম্‌স্‌ ও মিষ্টার পিয়ার্সনকে মনোনীত করেন। করদাতারা বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু দীনবন্ধু দে ও মিষ্টার ওয়াট্‌সকে নির্ব্বাচিত করেন। চন্দ্রমোহন নির্ব্বাচিত বেতন ভোগী কমিশনার হইয়া দুই বৎসর উৎসাহের সহিত কাজ করেন। ১৮৪৯ সালে যখন তাঁহাকে ব্যবসায় বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হইল তখন তিনি কমিশনারের পদ ত্যাগ করেন।

ইং ১৮৫৭ সালে টোটা লইয়া সিপাহিরা যখন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল তখন স্বেচ্ছাসৈনিক হইবার প্রার্থনা করিয়া চন্দ্রমোহন কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ সৈনিকের কোনও প্রয়োজন হইবেনা, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। এই সময়ে কার্য্যানুরোধে

১৯ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক দল দমদমা হইতে বহরমপুরে প্রেরিত হয়। সেখানে তাহারা একদিন অবাধ্যতা প্রকাশ করায়, সৈনিক দণ্ডবিধি অনুসারে তাহাদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া, সৈন্যদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দণ্ডিত করা হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ স্থির করেন। এই দণ্ড দিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বারাসতে আনিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়। এই ব্যাপারে সিপাহিরা একটা গুরুতর কিছু করিবে এইরূপ আশঙ্কা অনেককেই উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন করে। এমন কি, ব্যারাকপুর নিরাপদ নয় মনে করিয়া, মেম সাহেবদিগকে কলিকাতায় আনা হয়। সকলেই শুনিল যে ইং ১৮৫৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের প্রাতঃকালে ব্যারাক-পুরে ১৯ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক সৈন্যদলকে দণ্ডিত করা হইবে। তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগে যত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক সিপাহি ও গোরা ফৌজ ছিল ও ছোট বড় যত সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, সকলকে ব্যারাকপুরের মাঠে ঐ দিনে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেওয়া হইল। সৈনিক বিভাগ ভিন্ন কোম্পানীর অন্যান্য বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-দেরও উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইল। জনসাধারণও ইচ্ছা করিলে উপস্থিত থাকিতে পারে এরূপ ঘোষণা দেওয়া হইল কিন্তু সেরূপ উৎসাহ দেখা গেলনা, বিশেষ জনতা হয় নাই। সাহেবেরাও অনেকে উপস্থিত থাকা বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন। কারণ তাহার ২।১ দিন পূর্ব্বে ৩৪ সংখ্যক সিপাহি পদাতিক দলের মঙ্গল পাঁড়ের বিদ্রোহ ও তাহার শোচনীয় আত্মহত্যার কথা সকলেই শুনিয়াছিলেন। ধনী সম্প্রদায়ের অনেকেই নিজ নিজ আবাসবাটী রক্ষার বিশেষ্ ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন। উপস্থিত অনেকের মুখেই আতঙ্কের ছায়া দেখা গেল। চন্দ্রমোহন কিন্তু কটিদেশে তরবারী ঝুলাইয়া পিস্তল হাতে অশ্বপৃষ্ঠে ব্যারাকপুরে উপস্থিত ছিলেন। সিপাহিদের যখন অস্ত্রাদি ও সামরিক চিহ্নাদি কাড়িয়া লইবার আদেশ হইল, তাহারা শান্তভাবে নিজেরাই সমস্ত

চিহ্নাদি অঙ্গ হইতে খুলিয়া অস্ত্রাদি ত্যাগ করিল এবং সরকার নিজ ব্যয়ে তাহাদিগকে দেশে পৌঁছাইয়া দিবেন শুনিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেনাপতির দীর্ঘজীবন প্রার্থনা ও সরকারকে সাধুবাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আগুণ নিভিল মনে করিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। আগুণ যে এত সহজে নিভে নাই, ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। যখন আগুণ জ্বলিয়া উঠিল তখন কলিকাতায় সাহেবেরা আতঙ্কে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। যুদ্ধকালে সৈনিকনিবাসে যে সকল সামরিক নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই সকল নিয়ম কলিকাতায় প্রচলন করিতে তাঁহারা সরকারকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু ধীরচেতা লর্ড ক্যানিং এসকল কথা অন্যায় আবদার বলিয়া গণ্য করিলেন। তবে সহর সুরক্ষিত করিবার জন্য, সহর কয়েকটি বিভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বেচ্ছাসৈনিক প্রহরী এবং কয়েকজন স্পেস্যাল কনষ্টেবল নিযুক্ত করিলেন। প্রত্যেক বিভাগের থানাগুলিকে এই সকল স্পেস্যাল কনষ্টেবলের অধীন করিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যেক বিভাগের শান্তি রক্ষার জন্য স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনমত প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করিবার ক্ষমতা এই সকল স্পেস্যাল কনষ্টেবলদিগের উপর অর্পিত হইল। কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত চন্দ্রমোহনও একজন স্পেস্যাল কনষ্টেবল নিযুক্ত হইলেন। যতদিন স্পেস্যাল কনষ্টেবল ছিলেন ততদিন চন্দ্রমোহন প্রতি রাত্রিতে অশ্বপৃষ্ঠে নিয়মিতভাবে সহর পরিভ্রমণ করিতেন। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় লোককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে যেমন স্পেস্যাল কনষ্টেবল করা হইত, সিপাহি বিদ্রোহের সময় কিন্তু কর্তৃপক্ষের মনে সে ভাব ছিল না। বরং ইহা অতি সম্মানের পদ বলিয়াই তখন গণ্য ও গ্রাহ্য হইত।

সিপাহি বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে সিপাহিবিদ্রোহদমনের ব্যয়ভারে

গবর্ণমেণ্ট বিব্রত হইয়া উঠিলেন। সেই ব্যয়ভার লাঘবের মানসে আয়-করের সৃষ্টি হইল। প্রথম আয়কর আইন (১৮৬০ সালের ৩২ আইন) পাঁচ বৎসরের জন্য বিধিবদ্ধ হইল এবং তাহা যথাকালে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৬৫ সালে রদ করা হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে চন্দ্রমোহন কলিকাতার প্রথম ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ এসেসর নিযুক্ত হন। এই অপ্রিয় কার্য্যও চন্দ্রমোহন নিরপেক্ষভাবে সম্পাদন করিয়া কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ উভয় পক্ষেরই মনস্তুষ্টি সাধনে সফল হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাংলার নীলকর ও রায়তদের মনোবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া নানারূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছিল। রায়তরা এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া প্রতিকার প্রার্থী হইল। বড়লাট ক্যানিংয়ের অনুমোদনে ছোটলাট সার্ জন্ পিটার গ্র্যাণ্ট নীল ও নীলের চাষ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন বসাইলেন। মিষ্টার সিটনকার সাহেব এই কমিশনের সভাপতি ও মিষ্টার টেম্পল সরকারের পক্ষে মনোনীত হইলেন। রায়ত ও মিসানারিদের পক্ষে পাদ্রী রেভারেণ্ড সেলকে রাখা হইল। নীলকর সভার পক্ষে মিষ্টার ফার্গুসন্ এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদার সভার পক্ষে বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। চন্দ্রমোহন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার বৈঠক প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আজীবন তাহার সদস্য ছিলেন। এই কমিশনের বৈঠক ইং ১৮৬০ সালের ১৮ই মে তারিখে আরম্ভ হয় এবং এই সালের আগষ্ট মাসের শেষে কমিশনের রিপোর্ট বাহির হয়। কমিশনারদিগের মধ্যে টেম্পল সাহেব ও ফার্গুসন সাহেব ভিন্ন মত হন। ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব কিন্তু তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি কমিশনারদিগের কার্য্য প্রণালীর প্রশংসা করিয়া মিনিট লিখিলেন এবং কমিশনারদিগকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া স্বতন্ত্র পত্র দিলেন। বড় লাট ক্যানিং সাহেব এবং

ভারতের তৎকালীন ষ্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উডও ছোট লাটের সহিত একমত হন। এই কমিশন সম্পর্কে সিটন কার সাহেবের সহিত চন্দ্র মোহনের ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব হয় এবং বিলাত যাইবার সময় চন্দ্রমোহনকে সিটন কার নিজের একখানি তৈলচিত্র উপহার দেন। সিটনকার সাহেব যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, চন্দ্রমোহনকে বিলাত হইতে পত্র লিখিতেন এবং নিজে যে বাংলা ভুলিয়া যান নাই, তাহা জানাইতে চন্দ্রমোহনের নাম ইংরাজিতে লিখিয়া পার্শ্বে বাংলায়ও লিখিতেন।

চন্দ্রমোহন চিরদিন পুলিসের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে যথাশক্তি বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে ইং ১৮৬০ সালে লর্ড ক্যানিং পুলিস কমিশন বসান। এই কমিশনের তদন্ত ফলে পুলিসের অনেক কর্ম্মচারীর নানারূপ কুকীর্ত্তি প্রকাশ পায় এবং তাহারা তজ্জন্য দণ্ডিতও হয় এবং পুলিসও অনেকাংশে সংশোধিত হয়।

ইং ১৮৬৪ সালে দলিল রেজিষ্টারি করিবার বিধি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আইন (১৮৬৪ সালের ১৬ আইন) বিধিবদ্ধ হয় এবং কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রর পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৬৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে চন্দ্রমোহন উক্ত আইন অনুসারে কলিকাতার প্রথম ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। তিনি ইং ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী ১লা তারিখ হইতে এই পদের কার্যাভার গ্রহণ করেন। দলিল রেজিষ্টারী সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম ও ব্যয়াদির ব্যবস্থা ও রেজিষ্টারী অফিসের সম্পূর্ণ গঠনকার্য্য চন্দ্রমোহনের নির্দ্দেশমত হয়। ইহাই চন্দ্রমোহনের শেষ চাকুরী। তিনি ইং ১৮৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই পদের কার্য্যভার বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষের হাতে বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। যদিও চন্দ্রমোহন একাদিক্রমে গবর্ণমেণ্টের চাকরী করেন নাই, তথাপি তাঁহার কার্য্য

কুশলতা ও প্রশংসনীয় চরিত্রের জন্য বাংলা এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী তাঁহাকে তাঁহার পদের সর্ব্বোচ্চ সম্পূর্ণ পেন্সন দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহনের একখানি আবক্ষ তৈলচিত্র কলিকাতা রেজিষ্টারি অফিসে রক্ষিত আছে।

অবসর গ্রহণের কিছুদিন পূর্ব্বে ছুটী লইয়া চন্দ্রমোহন চীনদেশে হংকং পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসেন। চন্দ্রমোহন চিরদিন উদ্যান রচণায় অনুরাগী ছিলেন। ফিরিবার সময়ে ম্যাগণোলিয়া গ্র্যাণ্ডি ফ্লোরা, কাডিয়া, চীনের করবি, চীনের নারিকেল, চীনের লতাআমগাছ, চীনের বাঁশ, অরোকেরিয়া প্রভৃতি কলিকাতায় তখন সুদুষ্প্রাপ্য কয়েকটী গাছের কলম সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং আত্মীয়দের উপহার দেন। সেই সময়ে চীনের কারুশিল্পের নমুনা স্বরূপও কয়েকটী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনেন।

চন্দ্রমোহন যখন ইন্‌কম্ ট্যাক্স এসেসর তখন হইতে কলিকাতার একজন জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত কার্য্যেই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টা করিতেন। সে সময় নিমতলা ঘাটের দাহ কার্য্যে কাষ্ঠ বিক্রেতারা ইচ্ছানুরূপ দর চড়াইয়া শব-দাহকারীদের উৎপীড়ন করিত। চন্দ্রমোহনেরই উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক শবদাহের ব্যয়ের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া কাষ্ঠ বিক্রেতাদিগকে নিয়মের বাধ্য করা হয়। নিঃসম্বল ভিক্ষুকদিগের দাহের ভার তাঁহার অবিরাম চেষ্টার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করেন। জগন্নাথ ঘাটের স্নানার্থীদিগের জন্য মিউনিসিপ্যালিটী যে চাঁদনী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারই নির্ব্বন্ধাতিশয্যে হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতীরে কিছু ভূমি সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে একবার কতকগুলি জমির বিক্রেতাদের সহিত বন্দোবস্ত করেন। যখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর গঙ্গাতীরে স্নানের ঘাট করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন চন্দ্রমোহন তাঁহাকে এই জমির সংবাদ দেন ও উদ্যোগী

হইয়া প্রসন্নকুমারকে জমি সংগ্রহে সাহায্য করেন। এই জমিতে প্রসন্ন-কুমার ঘাট ও গুদাম প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। জনসাধারণের অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রায়ই প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে জগন্নাথ ঘাট, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট ও নিমতলার ঘাট তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেন। কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিলে ঘাটের পাণ্ডারা তাঁহার বাটীতে যাইয়া সকল কথা জানাইয়া আসিত এবং তিনি তাহার প্রতীকারের সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। চাকরী ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি আজীবন এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ সার ষ্টুয়ার্ট হগ্ সাহেব মিউনিসিপ্যাল সভায় এই তিন ঘাট সম্বন্ধে কোনও কথা বা ব্যবস্থা উত্থাপিত হইলে, রহস্য করিয়া বলিতেন যে, এ তিন ঘাট চন্দ্রবাবুর খাস এলাকাভুক্ত এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা ও ব্যবস্থাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মেয়ো নেটীভ হাসপাতাল যখন ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে বর্ত্তমান গৃহে স্থানান্তরিত হয়, তখন চন্দ্রমোহন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাটী নির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বড়লাট নর্থব্রুক প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইং ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ছোটলাটের আইন সভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সদস্য হইয়া তিনি কখনও অনুরোধের বশবর্ত্তী বা কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কাজ করিতেন না। নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও অনেকবার তিনি গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়া নিজের মতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা এবং সরল স্নেহময় হৃদয় কি দেশীয়, কি বিদেশীয় যাহারই সংস্রবে তিনি আসিতেন তাহারই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। সে সময়ে শিক্ষিত মুসলমান-দিগের অগ্রণী নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর ও পার্শী বণিক রোস্তমজী

চন্দ্রমোহনকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। ছোটলাট সার উইলিয়াম গ্রের পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার এতদূর ঘনিষ্টতা হয় যে লাট পত্নী তাঁহার নিজের ও সন্তান সন্ততিদের আলোকচিত্র এবং তাঁহার স্বামীর একখানি তৈলচিত্র চন্দ্রমোহনকে উপহার প্রদান করেন। সার এস্‌লি ইডেন সাহেবও নিজের একখানি তৈলচিত্র চন্দ্রমোহনকে উপহার দেন। ইং ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে চন্দ্রমোহনকে একখানি সম্ভ্রমসূচক সার্টিফিকেট সরকার হইতে দেওয়া হয়।

অবসর গ্রহণ করিয়া চন্দ্রমোহন পলতা জলের কলের অপর পারে বৈদ্যবাটীর গঙ্গাতীরে একখানি বাগান বাটীতে বাস করিতেন। সেখানে কয়েক বৎসর পরে তাঁহার চক্ষুরোগ হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করান কিন্তু ডাক্তার কেলির অস্ত্র চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। চক্ষু নষ্ট হইলেও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে নিয়মানুবর্ত্তিতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। যে সময়ে যাহা করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা এত সূক্ষ্মভাবে পালন করিতেন যে লোকে বলিত তাঁহাকে দেখিয়া ঘড়ি মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

চন্দ্রমোহনের জীবন যেমন অনন্যসাধারণ ছিল, তাঁহার মৃত্যুও সেইরূপ অসাধারণ ভাবে ঘটে। তাহাকে ইচ্ছামৃত্যু বলিলেও চলে। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে একদিন প্রাতভ্র্মণ করিয়া আসিয়া শুনিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতষ্পুত্রের প্রস্রাব পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছে এবং ডাক্তারেরা তিন চারি মাসের মধ্যে জীবন হানির আশঙ্কা করেন। চন্দ্রমোহন শুনিয়া বলিলেন যে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যু দেখিবেন না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া যাইবেন। আহার ত্যাগ করিয়া সেই দিন হইতে কেবল ফলের রস পান করিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার পরিমাণও দিন দিন কমাইতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার প্রফুল্লতা কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। ভ্রাতুষ্পৌত্রদের সহিত রহস্যাদি পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল। একদিন সকলকে পাঁজি দেখিতে বলিলেন, কারণ সংসারের কোনরূপ অমঙ্গল না হয় এমন দিনে তিনি এখান হইতে যাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন। দিন ক্ষণ আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী মঙ্গলবারের নিশা শেষে তাঁহার জীবন ত্যাগের দিন স্থির করিয়া সকলকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে তাঁহাকে তীরস্থ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, যেহেতু শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের বাটী গঙ্গার তীরভূমির মধ্যগত। অনেকেই মনে করিল তিনি রহস্য করিতেছেন বা প্রলাপ বকিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলবারের পূর্ব্ব রবিবার হইতে ফলের রস ত্যাগ করিয়া জল মাত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অধিকাংশ সময়ই জপে কাটাইলেন। মঙ্গলবার নিশাশেষে ১২৯২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে (ইং ২০শে ১৮৮৫ সাল) বুধবারের অরুণোদয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সমস্ত স্থির হইতে দেখিয়া বুঝা গেল যে চন্দ্রমোহন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়া নিজের সংকল্প রক্ষা করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মৃত্যুর দুইমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চন্দ্রমোহন একদিকে রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাজন ও জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, অন্যদিকে আত্মীয় স্বজনের সকল কাজেই প্রধান সহায় ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমি সংগ্রহের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেইরূপ গোপাললাল ঠাকুর যখন ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং গঙ্গাতীরে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন, তখন চন্দ্রমোহনের মধ্যস্থতায় হেজার সাহেবের নিকট যাইতে বরাহনগর আলমবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটী খরিদের ব্যবস্থা হয়। আমরা শুনিয়াছি যে চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যখন চন্দ্রমোহনের কতকগুলি পুস্তক চন্দ্রমোহনের ভ্রাতুষ্পৌত্র অমরেন্দ্রনাথকে ফিরাইয়া দেন তখন বলেন যে চন্দ্রমোহনের

সাহায্যে আলমবাজার বাগান ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ঘটনার স্মৃতি জাগরূপ রাখিতে ঐ বাগানবাটীর গঙ্গাতীরের দিকে একখানি ঘর চন্দ্রমোহনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। চন্দ্রমোহন ইচ্ছামত এইখানে অবসর বিনোদন করিতেন ও পুস্তকগুলি সেই সময়ে রচিত হয়। গোপাললাল ঠাকুর আজীবন তাহাকে চন্দ্রবাবুর ঘর বলিতেন, অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিতেন না।

ইং ১৮৪০ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন পারিবারিক ব্যবস্থার জন্য একটি ডিড্ অফ্ সেটেল্‌মেণ্ট করেন, তখন, চন্দ্রমোহনকে একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত করেন। মহারাজা রমানাথ ঠাকুর চন্দ্রমোহনকে তাঁহার উইলের একজন একজিকিউটার নিযুক্ত করেন। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিষয় লইয়া হাইকোর্টে যখন মোকদ্দমা হয় তখন ইং ১৮৭২ সালে আদালত হইতে একজন নূতন ট্রষ্টি নিয়োগ করার আবশ্যক হওয়ায় রেভারেণ্ড ডাক্তার কে, এম্, ব্যানার্জ্জি, ডাক্তার জগন্নাথ সেন, প্রভৃতি নানা লোকের নাম উপস্থিত হয়। মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (তখন বাবু,) যে কয়জনের নাম প্রস্তাব করেন, তাহার মধ্যে আদালত চন্দ্রমোহনকে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ট্রষ্টি নিযুক্ত করেন। ১৮৭৫ সালে ১লা জুন তারিখে যখন এই মোকদ্দমার ডিক্রিতে ট্রষ্টির হাত হইতে বিষয়াদি মামলায় নিযুক্ত রিসিভারের জিম্মায় পুনরাদেশ পর্য্যন্ত থাকিবে এইরূপ ডিক্রী হয় তখন চন্দ্রমোহন ব্যতীত অন্য দুইজন ট্রষ্টীদিগকে খরচার দায়ী করা হয়। পক্ষদিগের আপত্তি সত্ত্বেও চন্দ্রমোহনের সর্ব্ববিধ খরচা সমস্ত এষ্টেট হইতে দেওয়া হইবে এইরূপ আদেশ হয়। অস্থায়ী চিফ জষ্টিস ৺মাকফার্সন সাহেব এ সম্বন্ধে বলেন,—

I shall order that Chandra Mohan's costs on scale No 2 as between attorney and client of this estate

be paid out of the corpus on the grounds that the steps he took were intended for the benfit of the estate and were in fact very beneficial to it. The whole of his intervention was beneficial to the estate.

চন্দ্রমোহনের আকৃতি খর্ব্ব ও মধ্যম পুষ্টাঙ্গ ছিল। গঠন একহারা হইলেও তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দেহের অন্যান্য অবয়বের তুলনায় কিছু বড় বোধ হইত। তাঁহার বামদিকের চিবুকের নিম্নে একটি ছোট অর্ব্বুদ ছিল। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম ছিল। মুখের মধ্যে তাহার নয়ন যুগলের দৃষ্টি ভঙ্গীর একটু বিশেষত্ব ছিল। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী ছিল। অনেক সময়ে তাঁহার সহিত কথা কহিতে গিয়া লোক সন্ত্রস্ত হইত। তিনি রাশভারি লোক ছিলেন। একবার জগন্নাথের ঘাটে আহিরীটোলার উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের ব্যবহারে স্নানার্থিনীরা বিব্রত হইয়া উঠে। ঘাটের পাণ্ডা আসিয়া চন্দ্রমোহনকে এই সংবাদ জানায়। তখন তাঁহার চক্ষু রোগের স্ত্রপাত হইয়াছে। চন্দ্রমোহন পরদিন প্রাতে ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র যুবকের দল তাঁহাকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার পরে চন্দ্রমোহন কয়েকদিন প্রাতে জগন্নাথের ঘাটে বেড়াইতে যাওয়ায় যুবকের দলকে আর সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

চন্দ্রমোহন কিন্তু ভদ্রোচিত রসিকতার মর্য্যাদা করিতেন। সম্পর্কোচিত রহস্য অনেকেরই সহিত করিতেন। সে কালের রহস্য সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতেন। তাহার দুইটা নমুনা আমরা এখানে দিতেছি।

(ক) বড় মজা আফিং খেলে।
"সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে,
চরসেতে মাথা ধরে
মদেতে পা টলে॥

(খ) ষড়ানন ভাই তোর কেন নবাবি এত।
তোর ভাই জানি সেই গণেশ দাদা,
হাতীমুখো পেটটা নাদা,
সেইটে তোদের পালের গোদা
জানা আছে বিশ্বে যত॥
তোর বাপ দেখি শ্মশানে থাকে,
তেল বিনা গায়ে ভস্ম মাখে,
দেখ্‌লে পরে বুক ফেটে যায়,
তোর পায়ে বনাতি জুতো॥
তোর ঘরে নেইকো অষ্টরম্ভা,
বাহিরে দেখি তোর কোঁচা লম্বা,
তোর মা জানি সেই জগদম্বা,
পেটের দায়ে ছাগল খেতো॥

প্রকৃতিতে চন্দ্রমোহন কষ্টসহিষ্ণু, অনলস, কোপনস্বভাব, নিয়মনিষ্ঠ, কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ, দয়ালু, সত্যপ্রিয় ও সহৃদয় ছিলেন। অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, দেখিলেই জ্বলিয়া উঠিতেন এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে কার্য্য করিতেন। দুর্ব্বল ও দরিদ্রের প্রতি প্রবলের অবৈধ শক্তি পরিচালনা দেখিলেই তিনি তাহার প্রতিরোধার্থ বদ্ধপরিকর হইতেন। অনেক সময় তাঁহার শাসন কঠোর হইত। আবার আশ্রিত ও সেবকবর্গের কেহ পীড়িত হইলে তিনি তাহার চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। কাহারও দুঃখ কষ্টের বিষয় গোচরে আসিলে তাহা যথাসাধ্য মোচনের ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। বালকবালিকারা তাঁহার নিকট বিশেষ আদর পাইত কিন্তু তাহাদের অসভ্যতা, অসংযম বা উচ্ছৃঙ্খলতার কিছুমাত্র

প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁহার ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুবর্গের পরিবারবর্গও তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্তের পুত্র রামচন্দ্রগুপ্ত বলিতেন যে তিনি চন্দ্রবাবুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহারও জন্য এরূপ কখনও তাঁহার হয় নাই। নিত্য নৈমিত্তিক দানও চন্দ্রমোহনের যথেষ্ট ছিল। অনেক বালকের বিদ্যালয়ের বেতন তিনি নিয়মিত দিতেন। তিনি প্রতি মাসে আয়ের অর্দ্ধাংশ দানে ব্যয় করিতেন। এ দানের কথা কিন্তু কোনও দিবস তাঁহার বাটীর লোকের নিকটেও উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহার বাংলা সাহিত্যেও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি সমাচার দর্পণ, সমাচার সুজনরঞ্জন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি সে সময়ের অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্রের ও পত্রিকাদির ও মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের গ্রাহক ছিলেন। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণে যে সকল গ্রাহকদের নাম আছে তাহার মধ্যেও চন্দ্রমোহনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগের জন্য রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ যখন যে পুস্তক প্রকাশ করিতেন তাহারই একখণ্ড চন্দ্রমোহনকে উপহার দিতেন। আতিথেয়তাও তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতি রাত্রিতেই তাঁহার বাঙালী বন্ধুদের মধ্যে ৩।৪ জন নিমন্ত্রিত হইতেন। এই সকল বন্ধুদের মধ্যে তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক দ্বারকানাথ গুপ্ত, (স্বনাম প্রসিদ্ধ ডি, গুপ্ত) রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা কালীকুমার, কুমার রাধাপ্রসাদ রায় এবং তাঁহার আত্মীয়ের মধ্যে গোপাল লাল ঠাকুর ও কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য। অনেক বিষয়ে উভয় ভ্রাতার প্রকৃতিগত বৈষম্য ও অনেক বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও উভয় ভ্রাতার মধ্যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি আজীবন

অক্ষুণ্ণ ছিল। চন্দ্রমোহন নিজেকে ভ্রাতার সংসারভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং কেহ কোনও সামাজিক কাজে তাঁহাকে স্বতন্ত্র উপঢৌকন পাঠাইলে তিনি ভ্রাতার সহিত এক সাংসারভুক্ত বলিয়া সেই উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না। ভ্রাতার সহিত এক সংসারভুক্ত থাকিয়াও তিনি কিন্তু বস্তুতঃ চিরদিন পৃথগন্ন ছিলেন। চন্দ্রমোহন যখন বেকার থাকিতেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে মাসিক দুইশত টাকা দিতেন। তাহাতেই চন্দ্রমোহন নিজের খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের সংস্রবে চন্দ্রমোহন আহার বিষয়ে ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আহার্য্য বাটীর বাহিরে স্বতন্ত্র রন্ধনাগারে প্রস্তুত হইত কিন্তু রাজার শিক্ষায় তাঁহার আহারে বসিবার সময়ে মন্ত্রপাঠ করার অভ্যাস ছিল। আমরা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি যে রাজা রামমোহন রায় টেবিলে আহারের পূর্ব্বে মহা নির্ব্বানতন্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিতেন এবং তাঁহার প্রভাব যাহাদের উপর ছিল তাহারাও সেই মত মন্ত্রপাঠ করিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্যে আছে যে ইহাতে ভোক্তাকে অন্নদোষ স্পর্শ করে না।

(১) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা॥

মহানির্ব্বান তন্ত্র।

(২) অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপাণ সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

এই শ্লোকের শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে :—

"ভোক্তা বৈশ্বানরোহগ্নির্ভোজ্যমন্নং সোমস্তদুভয়মগ্নিসোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতো অন্নদোষলোপো ন ভবতি।"

চন্দ্রমোহন আহার বিষয়ে নিজে অনাচারী হইলেও পরিবারস্থ কেহ যে এরূপ অনাচার পরায়ণ হন তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার আহার স্থানের সহিত বাটীর অন্য কাহারও কোনও সম্বন্ধ না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে বাটীতে এই অনাচারের ব্যবস্থা না থাকে তজ্জন্য ভ্রাতুষ্পৌত্রদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন। তবে আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে ডাক্তারের বিধানে যদি কাহারও ঐরূপ আহারের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে যতদিন আবশ্যক তাহাকে ঐরূপ আহার্য্য তিনি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। সেকালে বরফ এখনকার মত সহজে পাওয়া যাইত না এবং দুর্ম্মূল্য ছিল। চন্দ্রমোহনের কিন্তু বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকে বলা ছিল যে যদি রাত্রিতে কাহারও বরফের প্রয়োজন হয় তাঁহার বেহারার নিকট লোক পাঠাইলেই বরফ পাইতে পারিবে।

চন্দ্রমোহনের সময়ে ইংরাজীর প্রভাব আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছিল। ইংরাজের গুণের সহিত দোষও অনুকৃত হইতেছিল। এই ইংরাজির প্রভাবে একবার কানাইলাল ঠাকুর চন্দ্রমোহনকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে (duel) আহ্বান করিয়াছিলেন। ব্যাপার এইরূপে ঘটে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে পূজোপলক্ষে যাত্রায় একবার দর্পনারায়ণ বংশীয় কাহারও ভৃত্য, যাত্রা দর্শনার্থিনী উপস্থিত কোনও বারাঙ্গনার সহিত কুৎসিত রসিকতা করে। বারাঙ্গনা বাটীর কোনও ভৃত্যের দ্বারায় এই কথা চন্দ্রমোহনের গোচরে আনায় এবং অনুসন্ধানে অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় চন্দ্রমোহন ভৃত্যকে কঠোর শাসন করেন। কানাইলাল ঠাকুর যখন এই কথা শুনিলেন তখন দর্পনারায়ণ বংশীয়দের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকায় এবং তাঁহাকে না জানাইয়া চন্দ্রমোহন ভৃত্যকে শাসন করায় কানাইলালের অপমান করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। সেই অপমান ক্ষালণের জন্য

কানাইলাল চন্দ্রমোহনকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করেন। এরূপ যুদ্ধে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা চন্দ্রমোহনও সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি ও অপর পক্ষকে স্থান, সময় ও অস্ত্র নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু সুখের বিষয় যে ব্যাপার বেণীদূর গড়াইবার পূর্ব্বে পাথুরিয়া ঘাটার ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাবুরা সকলে মিলিয়া উভয়কে শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিতেরা তখন কিরূপ রহস্যজনক অনুকরণ করিতেন তাহার একটী উদাহরণ বলিয়া ইহা এখানে উল্লিখিত হইল। ইংরাজি আহার কাহারও কাহারও নিকট আদর পাইলেও ইংরাজি বেশভূষা ও আদব কায়দার আদর তখনও সমাজে চলিত হয় নাই। বিলাতী দোকানে বহুমূল্য বিলাতী কাপড়ে চাপকান প্রভৃতি দেশীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করার প্রথা বিলাসী ধনবানদের মধ্যে প্রচলিত হইতেছিল। চন্দ্রমোহন চিরদিন দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। মাতুল দ্বারকানাথের ন্যায় তিনি নিজেও যখন যেথানে যে অবস্থাতেই থাকুন স্নানের পর তসর পরিয়া নিয়মিত সংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করিয়া কোনও কার্য্য করিতেন না। মাতুল দ্বারকানাথের ন্যায়, জাহাজে ও বিলাতে অবস্থান কালে চন্দ্রমোগনেরও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পরিবারস্থ বালকেরা উপনীত হইলে বিশুদ্ধভাবে গায়ত্রী মন্ত্র অভ্যাস করিয়াছে কি না এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করে কি না তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার মৃত্যুর ৪।৫ মাস পূর্ব্বে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্প্রপৌত্রের উপনয়ন হয়। তাহার সম্বন্ধেও চন্দ্রমোহন যতদিন জীবিত ছিলেন উক্তরূপ অনুসন্ধান হইত। তাঁহার বিষয়ে তিনি শাস্ত্রীয় সামাজিক আচার পালন করিতেন না বলিয়া বাটীর শ্যামাপূজার সময়ে কখনও দালানে উঠিয়া প্রতিমা দর্শন ও প্রণামাদি করিতেন না। প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া সে কার্য্য করিতেন। মাতৃ-বিয়োগের পর কঠোর

নিয়মে অশৌচ পালন করিয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্রাহ্মণকে পাল্কি দান করিলে চন্দ্রমোহন ঐ ব্রাহ্মণকে পাল্কীতে বসাইয়া অন্যান্য বেহারাদের সহিত নিজে স্কন্ধে করিয়া পাল্কি ভদ্রাসন হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

সহমরণ প্রথা উঠাইবার সময়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষাবলম্বন করিলেও আচার অনুষ্ঠানে চন্দ্রমোহন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। যখন বেথুন স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হয় তখন চন্দ্রমোহন তাহার বিরুদ্ধ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। তবে সে শিক্ষা বাটীর মধ্যেই হয় ইহা তাঁহার অভিমত ছিল। সে শিক্ষায় ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিতেন না। তাঁহার পরিবারে খড়দহের বৈষ্ণবীর দ্বারা কন্যা ও বধূরা শিক্ষিত হইত। যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যার বিবাহে হিন্দু সমাজের প্রচলিত প্রথা ত্যাগ করিয়া নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন, তখন মহারাজা রমানাথ ঠাকুর ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব এই নূতন পদ্ধতির বিরোধী হন। চন্দ্রমোহন মহারাজা রমানাথের পক্ষ অবলম্বন করেন। স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষেও চন্দ্রমোহন মহর্ষিকে যে অনুযোগ করিয়াছিলেন মহর্ষির জীবন চরিতে তাহার উল্লেখ আছে। চন্দ্রমোহন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মদনমোহনের জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। * মদনমোহনের ও তদ্বংশীয়দের একটী বংশধারা এবং সংক্ষেপ বৃত্তান্ত পরে প্রদত্ত হইল।

* চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পরে স্বনামপ্রসিদ্ধ ডক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটী জীবনচরিত লিখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সে জীবনচরিত লিখিয়া যাইতে পারেন নাই এবং উপকরণগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে একখানি মাত্র দৈনন্দিন লিপি পাওয়া গিয়াছে।

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বংশলতা

বীতরাগ (কান্যকুব্জাগত)

দক্ষ (রাঢ়ীশ্রেণী কাশ্যপ গোত্রদিগের আদি পুরুষ)

সুলোচন

মহাদেব

হলধর

নায়ীদেব

লালো

গরুড়ধ্বজ

শ্রীকণ্ঠ

বাঙ্গাল (লক্ষণ সেন পূজিত প্রথম কুলীন)

কীত

নৃসিংহ

আভো বা অভ্যাগত

স্বপন বা তপন

চৈতলী

রঘু

শ্রীবৎস

বলভদ্র

উদয়কুলবর

কৃষ্ণদাস
মহেশ তর্কপঞ্চানন
রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ
যাদবেন্দ্র বা যাদুবল্লভ
বেচারাম বা কালীচরণ
রামসুন্দর
রামদেব
ভোলানাথ
মদনমোহন
চন্দ্রমোহন
(অবিবাহিত)
দিনেন্দ্রনাথ
গোকুলনাথ
প্রিয়নাথ
প্রভাতনাথ
প্রীতিনাথ
মনোজনাথ
স্মৃতিনাথ
(শৈশবেমৃত)
দ্বারকানাথ
নারায়ণ
অমরেন্দ্রনাথ
ধীরেন্দ্রনাথ
বিপ্রেন্দ্রনাথ
গোপালদাস
শ্যামানাথ
খগেন্দ্রনাথ
গুরুদাস
অনন্তকুমার
রমেন্দ্রনাথ
প্রশান্তকুমার
অরুণবরণ
শীতলাপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
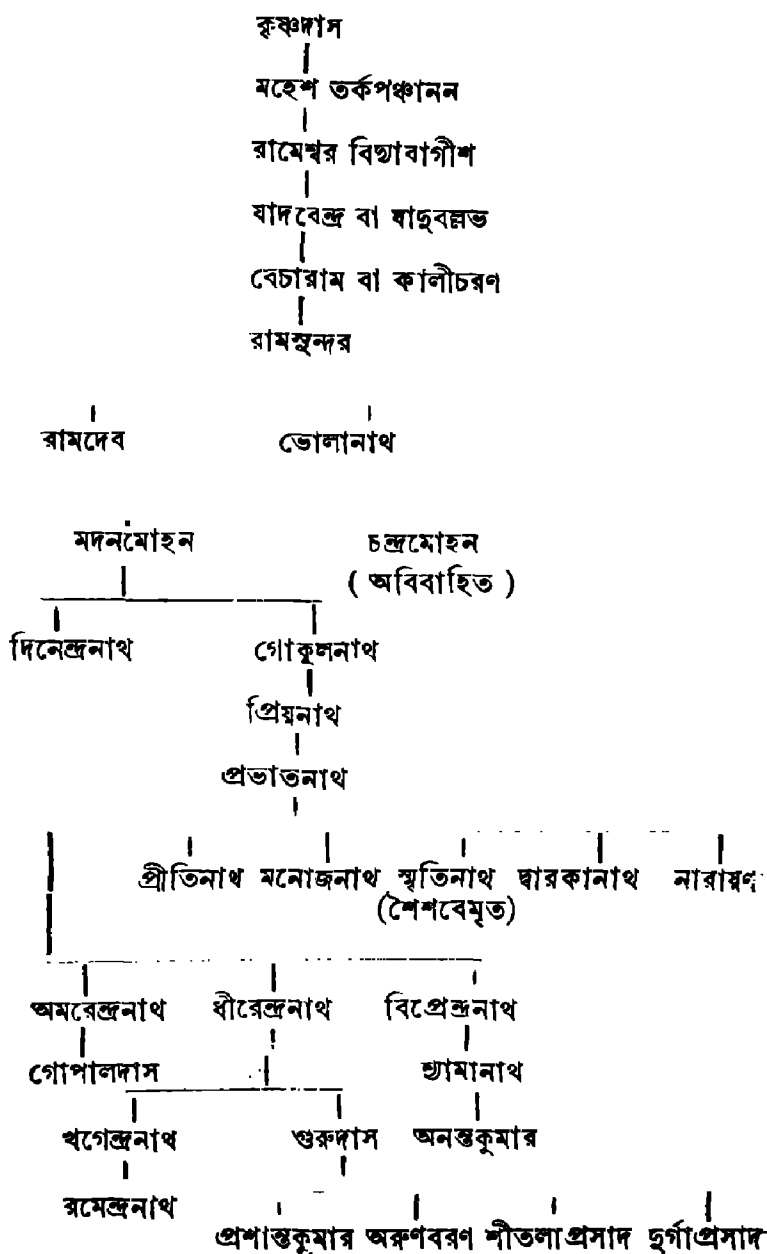
৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বংশ

(সিংহবাগান, জোড়াসাঁকো)

সন ১২১৩ সালের (ইং ১৮০৬) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিনে মদনমোহনও জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাটীতে মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষা বাটীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় আরম্ভ হয় এবং সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে শেষ হয়। ষোল সতের বৎসর বয়সে তিনি ১৬৲ টাকা বেতনে আলিপুর কলেক্টারীতে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার মাতুল রমানাথ ঠাকুর আলিপুর কালেক্টারীর সেরেস্তাদারের আপিসে কাজ করিতেন। মামা ও ভাগিনেয় উভয়ে একত্রে প্রত্যহ পদব্রজে জোড়াসাঁকো বাটী হইতে আলিপুর যাতায়াত করিতেন। ১২৩৩ সালে যশোহর দক্ষিণ ডিহি নিবাসী নবকিশোর গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যাকে মদনমোহন বিবাহ করেন। মদনমোহন ক্রমশঃ নিমক মহালে একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি আলম মুন্সীর নিকট পার্শি শিক্ষা করেন। এসময়ে ঠাকুর বাবুদের বাটীতে সঙ্গীতের রীতিমত চর্চ্চা হইত। মদনমোহনও সেতার, তানপুরা লইয়া সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন।

যখন দ্বারকা নাথ ঠাকুর সরকারি চাকরী ছাড়িয়া কার ঠাকুর এণ্ড কোংর আপিস প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার অনুরোধে মদনমোহন চব্বিশ পরগণা নেমক মহলের প্রধান ভারতীয় কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত হন। তখন এই পদের বেতন ৩০০৲ টাকা, এই সময়ে কলেক্টরীর রাজস্ব বিভাগেও মদনমোহনকে কার্য্য করিতে হয়। মাতুল দ্বারকানাথের আদেশে তাঁহার জমিদারী সেরেস্তায় মদন মোহন জমিদারীর সর্ব্ববিধ কার্য্য নিপুণভাবে শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা উত্তরকালে তাঁহার বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল। তিনি এই সময়ে ব্যাঙ্কের ও ট্রাফিক ইন্‌সিওরেন্স

কোম্পানীর এবং ইষ্টারণ ষ্টিম্ নেভিগেশন কোম্পানীর এবং অন্যান্য কোম্পানীর সেয়ারের ও কোম্পানীর কাগজের কেনা বেচা ও তেজারতি করিয়া ধন সঞ্চয় করিতে থাকেন। যখন মদনমোহন নিমক মহলের প্রধান কর্ম্মচারী তখন প্লাউডেন সাহেব কলেক্টর। তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি মদন মোহনের উপর পতিত হইল। উপর্য্যুপরি কয়েকটি বিষয়ে মদন মোহনের সততার ও নিলুব্ধতার পরিচয় পাইয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং এরূপ লোককে বড় মানুষ করিতে পারা যায় কিনা তাহার পরীক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হন। সেই সময়ে রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের কঠোরতায় প্রায়ই বাংলার জমিদারবর্গের জমিদারী নিলামে উঠিত এবং নিলাম স্থগিত রাখা ও রদ করিয়া দিবার সর্ব্ববিধ ক্ষমতা কলেক্টর সাহেবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিত নিয়মের অনুকরণে কালেক্টর প্লাউডেন্ নিয়ম করিলেন যে নিলাম স্থগিত বাবদ প্রার্থনা করিতে হইলে দরখাস্তের সহিত আমলান্ তহরি বাবদে টাকা জমা দিতে হইবে। এই টাকার পরিমাণ প্রত্যেক দরখাস্তে কলেক্টর সাহেব ধার্য্য করিয়া দিতেন। কলেক্টর প্লাউডেন্ সাহেব এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন যে এই টাকার বার আনা অংশ মদন মোহন ও বাকি চার আনা অংশ অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিভাগ হইবে। এই ব্যবস্থায় মদন মোহনের যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল। মাতুল দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন শুনিলেন যে মদনমোহনের নগদ দশহাজার টাকা সঞ্চয় হইয়াছে, তখন তিনি মদনমোহনকে স্বতন্ত্র আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দেন। মদনমোহন কিন্তু প্রথমে মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় মদনমোহনের পিতা ভোলানাথ সন্ন্যাসী হইয়া নানাতীর্থ ভ্রমণের পর জন্মভূমি দর্শন করিতে বঙ্গদেশে আসেন ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর গৃহবাস করা শাস্ত্র মতে প্রশস্ত নয় বলিয়া কালীঘাটে দেবী পূজা করিয়া ঠনঠনের কালী বাড়ীতে থাকিয়া পুত্রদের সংবাদ দেন। পুত্রেরা সাক্ষাৎ করিলে

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহারা নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসের কোনও ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন এবং যখন শুনিলেন যে তখনও পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই, তখন পুত্রদের উপদেশ দেন যে চিরদিন পর গৃহবাসী থাকা গৃহস্থ ধর্ম্মের বিরোধী। তখন আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিতে মদনমোহন মনস্থির করেন এবং মাতুল দ্বারকানাথকে তাহা জানাইলে তিনি তাঁহার বাটীর দক্ষিণে তাঁহার যে সাড়ে দশ কাঠা জমি ছিল তাহাতেই মদনমোহন ও চন্দ্রমোহনকে নিজেদের আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিতে মৌখিক অনুমতি প্রদান করেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রেরা মদনমোহন ও চন্দ্রমোহনকে এই ভূমির একখান দান পত্র লিখিয়া দেন। এই ভূমি ব্যতীত মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলের নির্দ্দেশ মত তাঁহার ষ্টেট্ হইতে উভয় ভ্রাতায় মোট দশহাজার টাকা পাইবার অধিকারী হন এবং ষোল বৎসর অপেক্ষা করিয়া ইং ১৮৬২ সালে ৬ই মার্চ্চ তারিখে বিনা সুদে তাঁহারা মাত্র দশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। মদনমোহন ও চন্দ্রমোহনকে মাতুল দ্বারকানাথের দান উপরোক্ত ভূমিতেও এই দশ হাজার টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ভূম্যধিকারীদের নিকট হইতে মদনমোহনের ব্যয়ে প্রয়োজন মত ভূমি সংগৃহীত হইলে ১২৪৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে বাস্তুযাগ করিয়া মদনমোহনের ভদ্রাসনের পত্তন হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমির অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে কোনও বারবণিতার একটী দ্বিতল বাটী ছিল। তাহা মদনমোহন তখন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বহু বর্ষ পরে এই দ্বিতল বাটীও মদনমোহন ক্রয় করিয়া ভদ্রাসনভুক্ত করেন। বাটীর দক্ষিণে এক্ষণে যে বাগান ও পুষ্করিণী আছে, সেখানেও তখন জোড়াসাঁকোর সিংহ বাবুদের ও ফকির সাহার বস্তি ছিল। ইহাও বহু বৎসর পরে মদনমোহন ক্রয় করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। বাটী সম্পূর্ণ করিতে প্রায় তিন বৎসর লাগে। খাতায় দেখা যায় যে জমি খরিদেও তখন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে মদনমোহনের প্রায় ৫২০০০৲ বাহান্নহাজার টাকা খরচ পড়ে। ১২৪৬ সালের ৩১শে আষাঢ় তারিখে মাতা, বণিতা ও দুই পুত্র লইয়া মদনমোহন নূতন বাটীতে গৃহ প্রবেশ করেন। তখনকার দিনে দেবতার, অতিথির ব্যবস্থা না করিয়া কোনও হিন্দু ভিটায় বাস করা সম্ভবপর মনে করিত না। মদনমোহনও ১২৪৫ সালের চৈত্র মাসে গৃহদেবতা শ্রীশ্রী বালগোপাল জীউ নামক শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠা করেন ও সেই গৃহ দেবতা লইয়া গৃহ প্রবেশ করেন। শালগ্রাম শিলা পরীক্ষায় বিশেষজ্ঞ হরকুমার ঠাকুর এই শালগ্রাম শিলা নির্ব্বাচন করিয়া দেন। মদনমোহন গৃহদেবতার নিত্যনৈমিত্তিক পূজার, দৈনিক অতিথি সেবার ও দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গৃহ প্রবেশের দিন হইতে চির জীবন শ্রদ্ধার সহিত তাহা পালন করিয়া আসিয়াছেন। নূতন বাটীতে আসিবার তিন চারি মাস পরে মদনমোহনের পত্নী দুইটী শিশু পুত্র দীনেন্দ্র নাথ ও গোকুল নাথকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

উদ্যান রচনায় মদনমোহন ও চন্দ্রমোহনের চিরদিন অনুরাগ ছিল। নূতন বাটীতে আসিবার পরে মদনমোহন বেলগেছিয়ায় কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া একটী উদ্যানের পত্তন করেন। এ বিষয়ে তিনি মাতুল দ্বারকা নাথ ঠাকুরের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে ভাল ভাল আম ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ গাছ সংগৃহীত হইয়া রোপিত হইয়াছিল। মেহগনি প্রভৃতি বিদেশীয় গাছও দুই চারিটি বসান হইয়াছিল। মদনমোহনের বংশীয়গণ উত্তরকালে এই বাগান বিক্রয় করায় এক্ষণে সেখানে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর বেলগাছিয়া ডিপো প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উদ্যান রচনার অনুরাগে বাটীর দক্ষিণে যখন জমি সংগৃহীত হয়, তখন তাহাও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয় এবং ১২৮১ সালে মদনমোহন গঙ্গাতীরে

বৈষ্ণবাটীতে চন্দ্রমোহনের অবসর বিনোদনের জন্য বাগানবাটী খরিদ ও প্রস্তুত করেন। উদ্যান রচনা কলার অনুশীলনে উভয় ভ্রাতাই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তবে চন্দ্রমোহন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্দ্ধনকারী অথবা গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি গঠনের উপযোগী বড় বড় বৃক্ষের ও রঙ্গীন পুষ্পপল্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলের গাছ ও ফসলের প্রতি মদনমোহনের অধিক লক্ষ্য ছিল।

প্লাউডেন সাহেব ছুটি লইয়া বিলাতে যাইলে মদনমোহন কলেক্টরীর নেমক মহালের প্রধান পদ ও অন্যান্য কাজ ত্যাগ করেন। সেই সময় হইতেই কার ঠাকুর কোম্পানীতে মদনমোহন পরিদর্শকের কার্য্য করিতেন। মাতুল দ্বারকানাথের জমিদারীর অনেক বিভাগ মদনমোহনের তত্ত্বাবধানে ছিল। যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাতে যান সেই সঙ্গে মদনমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমোহন বিলাত যান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিলাত যাত্রার ব্যয়ের অনেকাংশই মদনমোহন বহন করেন। চন্দ্রমোহন যখন বিলাতে সেই সময় গোপাল লাল ঠাকুর যশোহর জিলার পরগণা চেঙ্গুটীয়ার জমিদারী স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। পাথুরিয়াঘাটার বীর নৃসিংহ মল্লিকের নিকট ইহা বন্ধক ছিল। মদনমোহন যাহাতে এই জমীদারী স্বত্ব ক্রয় করেন, বীর নৃসিংহ মল্লিক তজ্জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ও পণ নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। নির্দ্ধারিত পণের টাকা তখন মদনমোহনের হাতে সমস্ত ছিল না। তাহাতে ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার অভাব ছিল। বীর নৃসিংহ মল্লিক নিজ হইতে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া মদনমোহনের অভাব পূরণ করায় ঐ সম্পত্তি খরিদে মদনমোহন সমর্থ হইয়াছিলেন। মদনমোহন উত্তরকালে ঐ ঋণ পরিশোধ করেন এবং চিরদিন এই উপকার স্মরণ করিয়া মল্লিক বংশীয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরেও মদনমোহন অনেকদিনকার ঠাকুর কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে সে সকল কাজ

ত্যাগ করেন। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা অনেকে জানিত এবং সেই সূত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় শোভা-বাজারের রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের সম্পত্তি দেখিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। মদনমোহনও কয়েক বৎসর বহু আয়াসে রাজার সম্পত্তির সুশৃঙ্খলা সাধন করিয়া রাজার নিকট হইতে অবসর লন। পরবর্ত্তী-কালে বারুইপুরের চৌধুরীদের সম্পত্তি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী জয়মিত্রের নিকট আবদ্ধ ছিল। জয়মিত্র সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিতে উদ্যত হন। শেষে মদনমোহনের মধ্যস্থতায় এইরূপ স্থির হয় যে যদি মদনমোহন নিজে কিস্তি মত টাকা পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব লইতে পারেন তাহা হইলে জয়মিত্র কিস্তিবন্দীতে টাকা পরিশোধের ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন; মদনমোহন এই সর্ত্তে চৌধুরীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। চৌধুরীরা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেন যে সদর সেরেস্তার সমস্ত কাগজ পত্র মদনমোহনের বাটীতে থাকিবে এবং একজন কর্ম্মচারী মফঃস্বল যাতায়াতের জন্য মদনমোহনের বাটীতে থাকিবেন; আদায়ী সমস্ত টাকা মদনমোহনের নিকট আসিবে ও কিস্তির টাকা বাদে চৌধুরীরা মাসিক নির্দ্ধারিত টাকা লইবেন। স্থির হয় যে মদনমোহন এই তত্ত্বাবধা-নের জন্য মাসিক ২৫০৲ দুইশত পঞ্চাশ টাকা কমিশন পাইবেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় জয়মিত্রের ঋণ পরিশোধ হয় এবং মদনমোহন চৌধুরীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহাদের উপর প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৪৭ খৃঃ শারদীয় পূজার পরে গোপাললাল ঠাকুর মদনমোহনকে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে ঋণের দায়ে তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তিনি সমস্ত ঋণ এককালে পরিশোধ করিতে প্রস্তুত। ঋণ পরিশোধের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তিনি তাহাতেই নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মদন-মোহনকে এই বিক্রয় সম্বন্ধে তাঁহার সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন।

মদনমোহন তখন জমিদারীর কাগজ দেখিয়া বলেন যে, জমিদারীর সুব্যবস্থা এবং সকলদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সম্পত্তি বজায় রাখিয়া ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হইবে। ইহাতেই জমিদারী ও সংসারের সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার গোপাল লাল ঠাকুর মদনমোহনের উপর অর্পণ করেন। মদনমোহনও অক্লান্ত পরিশ্রমে গোপাললাল ঠাকুরের জমিদারীর সকল বিভাগে সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব ব্যয় সংক্ষেপ করেন। এই ভাবে কাজ করিয়া এগার বৎসরে গোপাললাল ঠাকুরকে ঋণমুক্ত করিতে মদনমোহন সফলকাম হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর চিরদিন বলিতেন যে তাঁহার পিতার আদেশে তিনি মদনমোহনের নিকট জমিদারী কার্য্য শিক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে মদনমোহনের বাটীতে যাই-তেন এবং জমিদারীর সকল বিভাগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্য্য শিক্ষায় মদন-মোহনই তাঁহার গুরু ছিলেন। যখন গোপাললাল ঠাকুরের বিষয় পরি-দর্শনের ভার মদনমোহন গ্রহণ করেন তখন পারিশ্রমিকের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই এবং বিনা পারিশ্রমিকে এগার বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। গোপাললাল ঠাকুর ইং ১৮৫৯ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে স্বহস্ত লিখিত একখানি পত্রে ইহা স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং স্বীয় উদারতাগুণে ২৫০০০, পঁচিশ হাজার টাকা উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে মদনমোহনকে বিশেষ অনুরোধ করেন। মদনমোহনও সে উপহার সাদরে গ্রহণ করেন। যতদিন গোপাললাল ঠাকুর জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের তত্ত্বাবধানের ভার মদনমোহনের উপর অর্পিত ছিল। গোপাললাল ঠাকুরের মৃত্যুর পরেও কয়েক বৎসর মদনমোহন ঐ ভাবে কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পরে যখন মদন-মোহনের হৃদ্‌রোগের সূত্রপাত হয় তখন চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সকলপ্রকার গুরুতর পরিশ্রমের কাজ হইতে বিরত হইতে পরামর্শ

দেন। সেই সময়ে মদনমোহন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নিকট অবসর গ্রহণ করেন।

যখন মদনমোহন গোপাললাল ঠাকুরের বিষয় কার্য্য পরিদর্শন করিতে সম্মত হন তাহার অল্পদিন পরে প্লাউডেন সাহেব এদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোম্পানীর অর্থবিভাগ পুনর্গঠনের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার অভিপ্রায় মত এই বিভাগের প্রধান ভারতীয় কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। প্লাউডেন সাহেব মদনমোহনকে ঐ পদ গ্রহণের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু মদনমোহন গোপাললাল ঠাকুরের কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত কোম্পানীর এই চাকরী লইতে অস্বীকার করিলেন। পরন্তু জোড়াসাঁকোর ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যাহাতে ঐ চাকরী হয় তজ্জন্য প্লাউডেন সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেবও মদন-মোহনের অনুরোধ রক্ষা করেন। মদনমোহন তখন নিজে ঋণভার প্রপীড়িত হইয়াও কোম্পানীর চাকরীর লোভ সম্বরণ করিয়াছিলেন।

মদনমোহনের পিতামহের মৃত্যু হইলে মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। চন্দননগরের এই সম্পত্তি মদন-মোহন ও চন্দ্রমোহন তাঁহাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা ভগবতীচরণকে দান করেন।

মদনমোহনও একজন জষ্টিস্ অফ্ দি পিস্ ছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার, তত্ত্ববোধিনী সভার ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য ছিলেন।

১২৮৮ সালে পড়িয়া যাওয়ায় মদনমোহন দক্ষিণ পদে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে এই অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি বা জ্ঞানের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ১২৯৪ সালের ৯ই বৈশাখ অপরাহ্নে মদনমোহন সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করেন এবং কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাটীতে ঠাকুর গোষ্ঠীর কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দিরে তাঁহাকে লইয়া যাইতে আদেশ করেন ও দেববিগ্রহ প্রণাম করিয়া চরণামৃত পান করেন।

পরে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে এক ঘণ্টা পরে ৮১ বৎসর বয়সে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র রাখিয়া মদনমোহন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

মদনমোহন গৌরাঙ্গসুন্দর বদন, উচ্চনাস, মধ্যপুষ্টাঙ্গ, দীর্ঘ দেহ ও বলবান ছিলেন। তিনি সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, ধীরপ্রকৃতি, তীক্ষবুদ্ধি, পোষ্য ও অনুগতবর্গের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু এবং ক্ষমাশীল ছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় নিত্য প্রায় শতাধিক লোককে তিনি নিজ বাটীতে আহারাদি দিতেন। এ ব্যবস্থা অনেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকেও ১৮৭৭সালে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। রঙ্গকৌতুক সহ্য করিবার শক্তিও মদনমোহনের যথেষ্ট ছিল। তাঁহার আত্মীয় যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কৌতুকাভিনয় করিত সে সকল কথা মদনমোহনের কর্ণগোচর হইত, কিন্তু তিনি তাহাদের সকল কার্য্যে পরামর্শ দিতে ও প্রসন্ন চিত্তে তাহাদের সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিতে কোনও দিন পরাঙ্মুখ হন নাই। দূর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও লক্ষ্যপথে অক্লান্তভাবে সুদীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা ও ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হইবার শক্তি মদনমোহনের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, তাঁহার সৌজন্য ও অমায়িক ব্যবহারে বঙ্গদেশের তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। অনেকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং অনেকেই তাঁহার সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। সেই সূত্রে মফঃস্বলের অনেক জমিদারের বাটীতে সামাজিক কাজে মদনমোহনকে নিমন্ত্রণে যাইতে হইত। তাঁহার মাতুল দ্বারকানাথ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। মদনমোহনের নূতন বাটী প্রস্তুতের পরে যখন দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাটী মেরামতের আবশ্যক হয় তখন দ্বারকানাথ কয়েক মাস মদনমোহনের বাটীতে বাস করেন। মাতুল রমানাথ ও জ্ঞাতি মাতুল

গোপাললাল ঠাকুর যেমন একদিকে বৈষয়িক সকল বিষয়ে মদনমোহনের পরামর্শ লইতেন অন্যদিকে সেইরূপ সমস্ত আমোদ প্রমোদে আগ্রহের সহিত মদনমোহনকে বয়স্য ও সহচররূপে গ্রহণ করিতেন। গোপাললাল ঠাকুর যখন বরাহনগর বাগানে পীড়িত হন এবং অতদূরে চিকিৎসকদের যাতায়াতের অসুবিধা হইতে লাগিল তখন মদনমোহনের আগ্রহে গোপাল লাল ঠাকুর মদনমোহনের বাটীতে তিন চারি মাস ছিলেন এবং এইখান হইতে সিমলা সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাটী ভাড়া করিয়া উঠিয়া যান; মদনমোহন একজন চৌকষ লোক ছিলেন। সেকালের আদর্শে প্রকৃত প্রস্তাবে একজন দাতা, ভোক্তা এবং শাস্ত্র অনুশাসনে ক্রিয়াবান গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। আত্মীয় স্বজনের রোগ সেবায় মদনমোহন অনেক সময়ে আত্মনিয়োগ করিতেন এবং রোগীর পথ্যাদি নিজেই প্রস্তুত করিতেন। নাড়ীজ্ঞানে মদনমোহনের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। মদনমোহনের চরিত্রে আতিথেয়তা আর একটী বিশেষত্ব। মদনমোহন নিজ হস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইতে ভাল-বাসিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পৌত্রের বিবাহে নিজবাটীতে নিজের তত্ত্বাবধানে বাদাম ও পেস্তার বরফী প্রস্তুত করাইয়া সামাজিকগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। সামাজিক মান সম্ভ্রম রক্ষার প্রতি মদন-মোহন বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং সাধারণতঃ পরিমিতব্যয়ী হইলেও এই সকল ব্যাপারে বহুল ব্যয়ে কাতর হইতেন না। মদনমোহন অনাড়-ম্বরভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতেন এবং তাহাতে কৃচ্ছ্র সাধনও বরণ করিয়া লইতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে মদনমোহনের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। সংবাদ প্রভাকরের, সমাচার সুজন রঞ্জনের, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং সমাচার দর্পণের তিনি নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম ও অন্যান্য গ্রন্থ সংগ্রহে মদনমোহন অর্থব্যয় করিতেন। এতদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের বাঙ্গালা পুঁথির নকল করাইয়াছিলেন। যখন

কালীকুমার ঠাকুর ও হরকুমার ঠাকুর তন্ত্রের নানাবিধ পুঁথি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন তখন মদনমোহনও কেনারাম শিরোমণিকে নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল পুঁথির এক প্রস্থ নকল করাইয়া লন। উত্তরকালে এই তন্ত্রের পুঁথিগুলি তিনি সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রপ্রকাশক রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়কে দান করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের পুঁথি যাহা পুত্রদের জন্য নকল করাইয়াছিলেন তাহাও কয়েকজন ছাত্রকে দান করেন। যখন ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত তুলট কাগজে পুঁথির আকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করেন তখন মদনমোহন তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং একখণ্ড সংগ্রহ করেন। এই সংস্করণের একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে ইহার মুদ্রাঙ্কণে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির সংশ্রব ছিল না। এমন কি কম্পোজিটার ও প্রেসম্যান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ বাছিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মদনমোহনের কৌলিন্যের অভিমান ছিল এবং কুলশাস্ত্রে পণ্ডিত ঘটকদের সহিত সাহচর্য্যে তিনি কুলশাস্ত্রের সকল কথাই আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন চিরদিন স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং শাস্ত্রীয় আচার পালনে একনিষ্ঠ ছিলেন। যখন মাতুল দ্বারকানাথের বাটীতে শাস্ত্রনিষিদ্ধ পানাহারের অবাধ প্রচলন ছিল, সে সময়েও মদনমোহন একদিনের জন্যও অখাদ্য কি মদিরা গলাধঃকরণ করেন নাই। বরং এই আচার পালনের জন্য তাঁহাকে অনেক উপহাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম্মেও তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। মাতুলালয়ে অবস্থান কালেও মদনমোহন নিজ ব্যয়ে সেখানে কার্ত্তিক পূজা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে শারদীয়া পূজার কয়দিন নিজ পক্ষে চণ্ডীপাঠ, দেবীসূক্তাদিপাঠ ও দুর্গানাম ও মধুসূদন নাম জপের ব্যবস্থা মদনমোহন করেন। মদনমোহনের পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার এক সন্ন্যাসী গুরুভাই মদনমোহনকে দিবার জন্য এক শক্তি কবচ দিয়া যান। সন্ন্যাসীর সেই কবচ প্রাপ্তির পর হইতেই

মদনমোহন সেই কবচের নিত্য পূজার এবং শারদীয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। মাতুলালয়ে থাকিবার সময় হইতেই শারদীয়া পূজার সময় মদনমোহন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন। মাতৃবিয়োগের পরে মাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধো-পলক্ষেও মদনমোহন প্রতি বৎসর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিতেন। ইহাতে প্রতি বৎসর তাঁহার প্রায় দুই তিন হাজার টাকা ব্যয় হইত। পিতা সন্ন্যাসী হওয়ায় তাঁহার শ্রাদ্ধাদি করিতে হইত না। মদনমোহন পিতৃতৃপ্তির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে শতাধিক গঙ্গাসাগর যাত্রী সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইয়া শীত বস্ত্র দান করিতেন। মদনমোহনের মাতার ইচ্ছা ছিল যে নূতন বাটীতে প্রতিমা আনিয়া দুর্গোৎসব করেন; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাদের বাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। ভ্রাতাদের অনুরোধে মদনমোহনের মাতাঠাকুরাণী বাটীতে দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা কাজে পরিণত করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বের ব্যবস্থামত চণ্ডী পাঠাদি হইত। মদনমোহন নূতন বাটীতে যাইবার পরে প্রতিমা আনিয়া কৌলিক শ্যামাপূজা করেন। এই পূজা লইয়া মদন মোহনকে বিশেষ সমস্যায় পড়িতে হয়। জীববলি তাঁহাদের কৌলিক নিয়ম। কিন্তু মদনমোহনের মাতাঠাকুরাণী বৈষ্ণব আচার পরায়ণা থাকায় যে ভিটায় রক্তপাত হইবে সে ভিটায় বাস করিতে অসম্মতা হইলেন। শেষে জীব বলির পরিবর্ত্তে ফল বলির ব্যবস্থা হয়। এই পূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতি কালীকুমার ঠাকুর ও হরকুমার ঠাকুর নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মদন মোহন নিজ মাতাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরুষোত্তম তীর্থ করাইয়াছিলেন। তথাকার দিনে এইরূপ তীর্থ যাত্রা ব্যয়সাধ্য ও বিপদসঙ্কুল ছিল। পুল্কি-পাল্কী করিয়া যাইতে হইত। একশত হইতে একশত কুড়ি টাকা প্রায় পাল্কি ভাড়াই লাগিত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে লোকজন সঙ্গে লইয়া চটিতে চটিতে অবস্থান করিয়া যাইতে হইত। তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে মদনমোহন অর্দ্ধ দান সাগর শ্রাদ্ধ

৺দীনেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং ব্রাহ্মণকে ভূমি ও পাল্কি প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা চারি পাঁচ দিন গঙ্গাবাসের পর সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। উপযুক্ত স্থানাভাবে গঙ্গাযাত্রীদের কিরূপ কষ্ট ভোগ হয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কলিকাতার জগন্নাথ ঘাটের পার্শ্বে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাযাত্রীদের গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মদনমোহন জষ্টিস্ অফ্ দি পিসদিগের সহিত পত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু উভয়পক্ষের মতের মিল না হওয়ায়, উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। মাতৃবিয়োগের পরে মদনমোহন যথাসময়ে মাতার গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া আসেন। সেই যাত্রায় মদনমোহন কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থকৃত্য করিয়া আসেন। তখনও এই সকল স্থানে রেল প্রস্তুত না হওয়ায় বিপদসঙ্কুল পথে বহু কষ্টভোগ করিয়াও এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে হইত।

মদনমোহন ধর্ম্মে চিরদিন রক্ষণশীল দলভুক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবন-চরিতে প্রকাশ যে তিনি বৈদিক প্রণালীতে শ্রাদ্ধ করিলে মদনমোহন তাহাতে আপত্তি করেন। উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আপন পরিবারে যখন ব্রাহ্ম বিবাহ প্রচলন করিলেন, তখন মদনমোহন মাতুল রমানাথের সহিত বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন। ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানকে তিনি কোনদিন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন না। স্ত্রী স্বাধীনতার ও স্ত্রীলোকের স্কুলে শিক্ষারও তিনি চিরদিন বিরোধী ছিলেন।

দীনেন্দ্রনাথ।

মদনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র দীনেন্দ্রনাথ সন ১২৩৭ সালের ২১শে পৌষ তারিখে (ইং ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে) জানুয়ারী মাসে পিতার মাতুলালয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাটীতে গুরুমহাশয়ের

পাঠশালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। তাঁহার বাংলা সংস্কৃত ও পার্শী শিক্ষাও বাটীতে চলিতে থাকে। দীনেন্দ্রনাথ স্বীয় স্বভাবগুণে ও শিক্ষানুরাগের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও কাপ্তেন ডি-এল রিচার্ডসন প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের প্রিয়পাত্র হন। ইংরাজি ১৮৪৮ সালে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শনের জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় দীনেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। দীনেন্দ্রনাথ যখন কলেজে তখন হাইকোর্টের জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস ও রামবাগানের গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। ইংরাজি ১৮৫০ সালে কলেজ ত্যাগ করিয়া দীনেন্দ্রনাথ মিলিটারী পে অফিসে কার্য্য করেন। তিনি এখানে অল্পদিন থাকিয়া এখানকার কাজ ছাড়িয়া দেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ম্যাস বার্ণার সাহেব কলিকাতায় আপিস খুলিলে দীনেন্দ্রনাথ ও চোরবাগানের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বংশধর কেদারনাথ দত্ত বহির্বাণিজ্য বিভাগে ও অন্তর্বাণিজ্য বিভাগে প্রবেশ করেন। প্রথমে দীনেন্দ্রনাথ এই আপিসে কার্য্য আরম্ভ করেন। একদিন গভীর রাত্রিতে অতিবৃষ্টি হওয়ায় গুদামের অবস্থা পরীক্ষার জন্য ম্যাস বার্ণার সাহেব আসিয়া দেখেন যে দীনেন্দ্রনাথ লোকজন লইয়া কতকগুলি রেশমের বাণ্ডিল সরাইয়া, যেখানে জল না পড়ে এমন স্থানে রাখাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ম্যাস্ বার্ণার সাহেব দীনেন্দ্রনাথকে এই কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে এই রেশমের বাণ্ডিলগুলি বিদেশে প্রেরণের জন্য কৃত হইয়াছিল এবং পাছে এগুলি নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় রেশমের ব্যবস্থা দীনেন্দ্রনাথের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের মধ্যে না হইলেও আপিসের ক্ষতি নিবারণের জন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেখানে যাইয়া সেগুলি উত্তমরূপে রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। দীনেন্দ্রনাথের এই কাজে ম্যাস বার্ণার সাহেব এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাহার পরদিনই দীনেন্দ্রনাথকে এই

বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার ৫০০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। ইং ১৮৬৫ সালে দীনেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিলে দীনেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ এই চাকরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সাহেবদের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করেন নাই; কারণ কন্যাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি এতদিন কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন।

কর্ম্মত্যাগের পর ইংরাজি সংবাদপত্র এবং ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন চর্চ্চা দীনেন্দ্রনাথের অবসর বিনোদনের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। আইন ও চিকিৎসা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তকাবলি দীনেন্দ্রনাথ বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী না হইলেও এসকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কোন ব্যবসায়ী হইতে ন্যূন ছিল না। এডভোকেট জেনারেল পাল সাহেবের পিতা এটর্ণি পালসাহেব তখন মদনমোহনের এটর্ণি। তিনি দীনেন্দ্রনাথের ইংরাজি ভাষা প্রয়োগের অনন্যসাধারণ নিপুণতা ও আইন জ্ঞান এবং যুক্তি তর্ক অবতারণার কৌশল দেখিয়া দীনেন্দ্রনাথকে ব্যারিষ্টার করিয়া আনার জন্য মদনমোহনকে বহুবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অনেকগুলি এলোপ্যাথিক ঔষধ দীনেন্দ্রনাথ বাটীতে রাখিতেন এবং পরিবারবর্গের ও ভৃত্যবর্গের সামান্য সামান্য রোগে তাহাদের ব্যবহারার্থ নিজ হস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। দীনেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয়ও তাঁহার গৃহসজ্জায় ও পোষাক পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে ফুটিয়া উঠিত। বিলাতি আর্ট জার্ণাল, ষ্টীল প্রিন্টস্ ও হোগার্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিলাতি চিত্রকরের চিত্র সমূহের প্রতিলিপি তিনি বিলাত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য ভাবধারার তৎকালীন বিকাশের সহিত পূর্ণ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে তিনি নানাবিধ বিলাতি পত্র ও পত্রিকার নিয়মিত

গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং সকল বিষয়ের উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাহা সংগ্রহ করিতেন। ইহার ফলে ক্রমশঃ তাঁহার একটী বৃহৎ পুস্তক ভাণ্ডার সংগঠিত হইয়া উঠে। কর্ম্মত্যাগের পর প্রত্যহ মধ্যাহ্নে চারি পাঁচ ঘণ্টা তিনি তাঁহার এই পুস্তকালয়ের সদ্ব্যবহার করিতেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের মধ্যে দুই একজন ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে পুস্তকালয়ের সংস্পর্শও নিষিদ্ধ ছিল। সঙ্গীত চর্চ্চায়ও তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল, তিনি নিজে ভাল সেতার বাজাইতে পারিতেন ও সুকণ্ঠ থাকায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তিনি যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের চর্চ্চা নিয়মিত-ভাবে নির্জ্জনে করিতেন।

দীনেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইলেও তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল দলের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন না। মদ্য মাংস তাঁহার নিকট অপেয় ও অগ্রাহ্য ছিল। হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ তাঁহার নিকট হেয় ও অব-জ্ঞাত ছিল না। দীনেন্দ্রনাথ নিয়মমত সন্ধ্যাবন্দনা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন ও বাটীর শ্যামাপূজার সকল বিষয়ের সুসম্পন্নতার প্রতি আন্তরিক যত্ন করি-তেন,এই আন্তরিকতা এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিনিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন করি-বার যত্ন দীনেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটী প্রধান লক্ষণ ছিল। সংসার যাত্রার সাধারণ ব্যাপারগুলিও তাঁহার নিকট সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইত না। শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন, ব্যায়াম চর্চ্চা, বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের আহার্য্য সংগ্রহ, প্রস্তুত ও বণ্টন ব্যাপারের বন্দোবস্ত, চিররুগ্না পত্নীর চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্যের এবং শুশ্রূষার প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা, পৌত্র পৌত্রীদের শিক্ষা পরিদর্শন প্রভৃতিতে তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল অতিবাহিত করিতেন। সকল কাজ ঘড়ি ধরিয়া নিঃশব্দে যেন যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হইত। পরিবারস্থ সকলে-এমন কি দাসদাসী বালকবালিকারা পর্য্যন্ত যাহাতে এইভাবে কাজে অভ্যস্ত হয় তৎপ্রতি দীনেন্দ্রনাথ কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন তাহা দৃঢ়তার সহিত সম্পাদন করিতেন।

কোনও কাজে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সীমা লঙ্ঘন করিতে বিবেকবুদ্ধি পরিচালিত দীনেন্দ্রনাথ কোনও দিন সাহস করিতেন না। দীনেন্দ্রনাথ পরিমিতব্যয়ী হইলেও অনর্থক শারীরিক ক্লেশ বহন করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করা তাঁহার অনুমোদিত ছিল না। অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, গভীর চিন্তাশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান প্রভৃতির গুণে ভূষিত হইয়াও তিনি চিরদিন আত্মবিকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন। এমন কি কথায় বার্ত্তায় যাহাতে বিজ্ঞমত্তা প্রকাশ না পায় তজ্জন্য নিজেকে সদা সর্ব্বদা সংযত রাখিতেন। তাঁহার চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তায় ও গুরুগম্ভীর ভাবে লোকে তাঁহার নিকট হইতে সসম্ভ্রমে দূরে থাকিত। তৎকালিক ধর্ম্ম ও সামাজিকতাবর্জ্জিত ইংরাজি শিক্ষার ফলে দীনেন্দ্রনাথ চরিত্রে কেবল মাত্র জ্ঞানানুশীলনবৃত্তির পরিপুষ্টি হইয়াছিল। প্রকৃতিতে শান্ত, সমাহিত, আত্মনিবদ্ধ থাকায় দীনেন্দ্রনাথ লৌকিক জীবনের আনন্দাংশে বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তবে স্থিরপ্রজ্ঞ দীনেন্দ্রনাথ সংসারের সকল সমস্যার ত্বরিত সমাধানে সমর্থ থাকায় এবং প্রকৃতিগত তিতিক্ষায়, ন্যায়পরায়ণতায় ও সংযমের আশ্রয়ে দুশ্চিন্তা ও দুঃখের আক্রমণ হইতে নিজেকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারিতেন। বিনা প্রয়োজনে তিনি বাহিরের লোকের সঙ্গ চাহিতেন না। পারিবারিক জীবনের মধ্যে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ রাখিতেন এবং তদতিরিক্ত কোনও বিষয়ে উৎসাহান্বিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বৈচিত্রহীন সীমাবদ্ধ জীবন এবং তাহার সহিত নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি অত্যধিক আস্থা, পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, আত্মসংযম ও সময়নিষ্ঠা প্রভৃতি ইংরাজের চরিত্রগত গুণাবলী দীনেন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ জাতির কোনওরূপ বাহ্যিক অনুকরণে দীনেন্দ্রনাথ চিরদিন ঘোরতর আপত্তি করিতেন। ধনী অপেক্ষা গৃহস্থের সঙ্গ তাঁহার মনোমত ছিল। চোরবাগান ও জোড়াসাঁকোর অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সহিত তাঁহার

ঘনিষ্ঠতা ছিল। অনেকের আপিসের রিপোর্ট প্রভৃতি ও বৈষয়িক নানাবিধ পত্র ও দরখাস্তাদি দীনেন্দ্রনাথ প্রয়োজনমত লিখিয়া দিতেন এবং এই সকল ভদ্রলোকদের বিপদে আপদে পরামর্শ ও সময়ে সময়ে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতেন।

কাষ্ঠলৌকিকতার পরিবর্ত্তে অন্তঃকরণ হইতে যে ভদ্রতার উদ্ভব হয় দিনেন্দ্রনাথ সেই সহজাত ভদ্রতার অধিকারী ছিলেন। কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে দীনেন্দ্রনাথ তাহাদের বাসায় যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রবল সত্যানুরাগ দীনেন্দ্রনাথের চরিত্রের ভিত্তিভূমি ছিল। নিয়ম ও শৃঙ্খলার কিঞ্চিমাত্র ব্যতিক্রম বা সত্যের চুলমাত্র অপলাপ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বাধীনচেতা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন তেজস্বী দীনেন্দ্রনাথের পিতার সহিত অনেক বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পিতার কর্তৃত্ব তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতেন এবং বিনা বিচারে পিতার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতেন। তাঁহার সারা জীবনের স্বোপার্জ্জিত সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দীনেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

দীনেন্দ্রনাথ নাতিদীর্ঘ, পুষ্টকায়, আয়তলোচন, বিশালবক্ষ, বলবান পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বর্ণ পীতাভ গৌর ছিল।

সন ১২৪৮ সালে দীনেন্দ্রনাথ যশোহরের সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রজ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১২৮২ সালে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি নিজে ১২৯২ সালে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার বহুমূত্র রোগের সূত্রপাতের সংবাদে তাঁহার পিতৃব্য চন্দ্রমোহন কিরূপে প্রায়োপবেশনে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

দীনেন্দ্রনাথের তিনপুত্র। অমরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও বিপ্রেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথ।

সন ১২৫০ সালের ৮ই ভাদ্র তারিখে দীনেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরেন্দ্রনাথ মদন মোহনের ভদ্রাসন বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর গুরু মহাশয়ের পাঠশালে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মণ্টেগুর একাডেমি নামক বিদ্যালয়ে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তখন ভ্রাতার সহিত বিষয় বিভাগে পৌত্রিক ভদ্রাসন জ্যেষ্ঠ কানাইলালের অংশে পড়ায় গোপাললাল ঠাকুর সিমলা সুকিয়াষ্ট্রীটে বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। মণ্টেগুর একাডেমি দূরে ইংরাজি টোলায় ছিল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও অমরেন্দ্রনাথ এক গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অমরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং দুই তিন বৎসরের উর্দ্ধতন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাল্যকালের এই ঘনিষ্ঠতা উভয়ের মধ্যে আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবকে অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ছাত্ররূপে অমরেন্দ্রনাথও এই কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ উঠিয়া যাওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট হিন্দু স্কুলের ছাত্র হন। স্কুলে পাঠকালে তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন হরকালী মুখোপাধ্যায়। ইনি পরে ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হিন্দু স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে এমন কোন পুস্তক ছিল না যাহা অমরেন্দ্রনাথ পাঠ করেন

নাই। তাঁহার স্মৃতিশক্তি প্রখর থাকায় তিনি নানা কবি ও গ্রন্থকার হইতে সদৃশ ভাবাত্মক পদ অবাধে বলিয়া যাইতে পারিতেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি কলেজ ছাড়িবার ৮।১০ বৎসর পরেও তাঁহার অধ্যাপক টনি সাহেব এম-এ, ক্লাশের ছাত্রদের নিকট অমরেন্দ্রনাথের এই গুণপনার কথা উল্লেখ করিতেন। অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলির প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। যে সকল বিষয়ে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা হৃদয় বৃত্তির আলোচনার অবকাশ থাকিত সেই সকল বিষয়ের রসাস্বাদনে অমরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ব্যগ্রতা ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে অমরেন্দ্র নাথ বাটীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সেই সময় হইতেই তিনি ইংরাজিতে হিন্দু পেট্রিয়টে ও বাঙ্গলায় সংবাদ-প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিতেন এবং অনেক সময়ে সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ, বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজি ১৮৬৮ সালে ২রা মার্চ্চ তারিখে হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন ও অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অমরেন্দ্র নাথ উকীল হইবার অল্পদিন পরেই চব্বিশ পরগণার আদালতে মদন মোহনের বেওতা তালুক ঘটিত একটি জটিল খাস মামলায় মোকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করায় মদনমোহন তাঁহাকে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী উপহার দিয়া অমরেন্দ্রনাথের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। সেইদিন হইতেই মদনমোহনের এবং গোপাললাল ঠাকুরের আদালত ঘটিত সমস্ত কার্য্যের ভার অমরেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার ওকালতির প্রারম্ভ হইতেই হাইকোর্টের আপিল বিভাগে, নিম্ন আদালতের মূল মোকদ্দমায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ বিভাগে নানাবিধ জটিল মামলায় নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্ট ভিন্ন কলিকাতার বোর্ড অফ রেভিনিউ,

কলিকাতার ছোট আদালতে, কলিকাতার পুলিশ আদালতে, আলিপুরে, শিয়ালদহে, যশোহরে, বীরভূমে, পাটনায়, গয়ায়, মুঙ্গেরে, বৈদ্যনাথে, নানাবিধ মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের উদার দিলদরিয়া ভাব এবং সাধারণ উকীলের গুরুগম্ভীর ভাবের অভাব দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ যে একজন নিপুণ উকিল একথা সহসা অনেকের ধারণায় আসিত না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার বিষয়বুদ্ধির প্রতি চিরদিন আস্থাবান ছিলেন। মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের শেষ উইল অমরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবেশী খেতু মাড়োয়ারী যখন দেবতা প্রতিষ্ঠা করিয়া কলিকাতায়,কাশীতে ও অন্যান্য স্থানে সম্পত্তি খরিদ করিয়া দেবোত্তর করেন তখন অমরেন্দ্রনাথ সেই সমস্ত দলিল প্রস্তুত করিয়া দেন এবং উক্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে একজন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনও অনেক বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রমোহনের উইলও অমরেন্দ্রনাথ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং তিনি তাহার একমাত্র একজিকিউটর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ডি, গুপ্তের ষ্টেট্ তাঁহার পুত্রেরা অমরেন্দ্রনাথকে সালিশ করিয়া আপোষে বণ্টন করিয়া লন। অমরেন্দ্রনাথ একাধিকবার মোক্তারী পরীক্ষায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ উকিল হইবার কিছুদিন পর, হাইকোর্টে অনুবাদক নির্ব্বাচনের জন্য এক পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় গবর্ণমেণ্টের প্রসিদ্ধ অনুবাদক চন্দ্রনাথ বসুর সহিত অমরেন্দ্রনাথও প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। এই অনুবাদ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি উর্দ্দু, পার্শী ও উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন।

অমরেন্দ্রনাথ কলেজ হইতেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উকিল হইবার পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার সদস্য হন। যখন শিশিরকুমার ঘোষ জনসাধারণের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লইয়া ইণ্ডিয়ান

লীগ প্রতিষ্ঠা করেন তখন অমরেন্দ্রনাথ তাহাতে যোগদান করেন। কলেজে ছাত্রাবস্থা হইতেই টাউনহলে সাধারণ সভায় অমরেন্দ্রনাথের উপস্থিত মতে বক্তৃতা করিবার শক্তির বিকাশ হইয়াছিল এবং তিনি ইংরাজী ভাষায় একজন উত্তম বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কর্ম্মজীবনে রাজনীতিক ও সাধারণ জনহিতকর নানাবিধ বিষয়ে অমরেন্দ্র নাথ বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ইং ১৮৮৮ সালে খিদিরপুর ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। এই উপলক্ষে তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যে কয় বৎসর তিনি কমিশানার ছিলেন সেই কয়বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সকল কার্য্যেই তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে যোগদান করিতেন এবং লোকের উপকারে প্রাণপণে আত্ম-নিয়োগ করিতেন। তিনি কলিকাতা মেটকাফ্ পুস্তকালয়ের একজন আজীবন সদস্য ছিলেন এবং এই পুস্তকালয়কে দুর্দ্দশার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রধান সহায়রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার অধ্যাপক স্যর এ্যালফ্রেড্ ক্রফ্ট সাহেবের দ্বারায় লাট কর্জ্জনকে এবিষয়ে মনোযোগী করেন এবং শেষে উক্ত সাধারণ পুস্তকালয়কে গভর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পরিণত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। ইং ১৮৮৮ সালে তিনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হন এবং একাকী বিচার করিবার ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যখন নিয়ম হইল যে উকিল অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে পুলিশকোর্টে ওকালতি ত্যাগ করিতে হয় তখন অমরেন্দ্রনাথ অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ত্যাগ করিলেন।

ইং ১৮৯১ সালে বাতরোগে পীড়িত হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ চিকিৎসক-দিগের পরামর্শে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে গিয়া বাস করেন।

সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিলদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া একজন প্রথম শ্রেণীর উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং প্রায় তিন বৎসর সেখানে থাকিয়া ওকালতি ব্যবসায় করিয়াছিলেন। এই সূত্রে অমরেন্দ্রনাথ কায়েতী অক্ষরে লিখিত মূল কাগজ পত্র পাঠের অভ্যাস আরম্ভ করেন। ভাগলপুরে অবস্থানকালে সেখানকার সমস্ত উকিলের বিরুদ্ধে জমিদার হুকুমচাঁদ সিংহকে রক্ষা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ যশস্বী হইয়াছিলেন। ইং ১৮৯৩ সালের শেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় ওকালতি করিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার নিজ পল্লীর ৬নং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে কলিকাতায় প্লেগরোগের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। মহামারীর প্রকোপে যত না হউক আইন করিয়া রোগীকে তাহার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জোর করিয়া সাধারণ হাঁসপাতালে রাখা হইবে ও টীকা দেওয়া হইবে এই আতঙ্কে লোকে দলে দলে কলিকাতা সহর ত্যাগ করিতে লাগিল। মহানুভব অমরেন্দ্রনাথ সেই সময় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় নিজ ওয়ার্ডের বস্তিতে বস্তিতে যাইয়া দরিদ্র নরনারীকে আশ্বস্ত করিতেন এবং তাহাদিগকে পরিচ্ছন্ন থাকিতে উৎসাহিত করিতেন। যাহাতে সাধারণ হাঁসপাতালের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডে রোগীরা স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া এবং আত্মীয় স্বজনের সেবায় বঞ্চিত না হইয়া চিকিৎসিত হইতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করাইবার জন্য অমরেন্দ্রনাথ তদানীন্তন স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার কুকের সহিত বহু আলোচনা করিয়া তাঁহাকে এবিষয়ে সম্মত করাইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ও ৬নং ওয়ার্ডের অন্যতম কমিশনার স্বনাম ধন্য রাধাচরণ পাল উক্ত ওয়ার্ড বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য নিজেদের ব্যয়ে উক্ত ওয়ার্ডে কয়েকজন অতিরিক্ত মেথর ও ধাঙ্গড় নিযুক্ত করেন এবং ওয়ার্ডকে নানা বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের

দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মী গঠন করেন। ইহাতে তদানীন্তন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্য-পরিদর্শক ডাক্তার কুক্ ৬নং ওয়ার্ডের ব্যবস্থাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জির অসঙ্গত মন্তব্যে অপমানিত বোধ করিয়া যে আটাশজন মহোদয় মিউনিসিপাল কমিশানারী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম।

অমরেন্দ্রনাথ দৈর্ঘে প্রস্থে বিশাল বপু এবং সুপুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ দীর্ঘায়তন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তিনি Man Mountain আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কবিবর হেমচন্দ্রের লিখিত ছত্র কয়েকটি অমরেন্দ্রনাথে বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য :—

"সকলকার আগে এক মর্দ্দ দিল সাড়া।
দিগ্‌গজ ছহাত যেন তালের কাঁড়ি খাড়া॥
আধপাকা চুলেতে তেড়ি বুরুশে বাগানো।
'পারফিউমে' ভরা কেশ রুমালে ছড়ানো॥
সখের প্রাণ সাদাসিদে বল্‌ছে যেন হাসি।
'দেলদারিতে' খ্যাত আমার আর সকলই বাসি
'সেকেন' ক'রে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরা বাঁধা হৃদয়খানি ঐটি আমি চাই॥"

অমরেন্দ্রনাথ যেখানে যাইতেন, সেইখানেই তাঁহার আকৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন, বাক্যালাপ, ভঙ্গী, সহস্র লোকের মধ্যেও তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিত। সকল বিষয়েই অমরেন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে তিনি গতানুগতিক প্রথার প্রতি নিতান্ত উদাসীন ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের সকল কাজেই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও সার্ব্বজনীনতা লক্ষিত হইত তিনি নির্ভীক, সত্যপরায়ণ,

স্পষ্টবক্তা, কোমলহৃদয়, পরদুঃখকাতর, পরসুখে সুখী, উদার ও ক্ষমাশীল ছিলেন। পরের উপকারার্থে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে তিনি কাতর হইতেন না। তাঁহার বন্ধু লালমোহন দাস (পরে হাইকোর্টের জজ) যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদের প্রার্থী হন, তখন অমরেন্দ্রনাথ উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দের নিকট গিয়া তাঁহার জন্য ভোট সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। আতিথেয়তা অমরেন্দ্রনাথে অতিথি সেবা ব্যাকুলতায় পরিণত হইয়াছিল তিনি নিজে রন্ধন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত থাকায় আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার আহ্বানে রসনা তৃপ্তি করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আতিথেয়তার হেতু কোনও রূপ অসুবিধা বা কষ্টকে অমরেন্দ্রনাথ কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না। একবার কোনও বিবাহ বাটীতে গোলমাল হওয়ায় প্রায় পঞ্চাশজন মফঃস্বলবাসী ভদ্রলোক যখন কিছুতেই শান্ত না হইয়া অনাহারে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে মধ্য রাত্রিতে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করেন ও তাঁহাদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহারাদি করাইয়া সে রাত্রিতে অতি যত্নের সহিত নিজবাটীতে তাঁহাদের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ চিরদিন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। অমরেন্দ্রনাথ বলিতেন যে ছেলে পড়ান দুর্ভাবনা-রোগের একটি সুন্দর মুষ্টিযোগ। তবে ঐ কার্য্যে ধৈর্য্য হারাইয়া বালকদের দৈহিক শাস্তির বিধান করা অতীব দোষাবহ। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিবেশী অনেক গৃহস্থ পরিবারের বালকদের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান ও সাহায্য করিতেন এবং অনেককে বাটীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নিজে ইংরাজি পড়াইতেন। তাঁহার এইরূপ ছাত্রদের মধ্যে বাংলা রেখাক্ষর লিপির অধ্যাপক ও প্রচারক দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। অমরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য না হইয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত সকল বিধি ব্যবস্থার

সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থার সংশোধনের অভিপ্রায়ে লাট কার্জ্জনের সহিত তাঁহার পত্র ব্যবহার হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষা প্রণালীতে ছাত্রদের মাত্র স্মৃতিশক্তির পরিপুষ্টি হইতেছে; শিক্ষার যে প্রধান উদ্দেশ্য মৌলিকতার পরিস্ফুরণ, ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশ এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা সম্পাদন তাহার কিছুমাত্র সহায়তা করিতেছে না। বরং নির্দ্দিষ্ট বিষয়, নির্ব্বাচিত পুস্তকাবলী ও পরীক্ষা প্রণালী মানবতার উৎকর্ষ সাধনের অন্তরায় হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে জাতির আশাভরসাস্থল তরুণবয়স্কদের চিত্তবৃত্তি সতেজ ও সবল হইবে না। অমরেন্দ্রনাথ এইদিকে শিক্ষা প্রণালীর সংশোধনে মনোনিবেশ করিতে লাটসাহেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ও এসম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের একাধিকবার আলোচনা হইয়াছিল।

অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় সামাজিক ও মজলিসিলোক আজকাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে সখ্যরসের মূর্ত্ত-অভিব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে অবাধে সকলের সহিত মিশিতে পারিতেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই তাঁহার সরল ও উদার ব্যবহার ও সরস কথাবার্ত্তায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। অমরেন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বিবিধ বিষয়ের সরস আলোচনায় ও পুরাতন কাহিনীর অবতারণায় সকলকে মোহিত করিতেন। অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু আনন্দমোহন বসু, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, সবজজ গোপালচন্দ্র বসু রেজিষ্ট্রার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ও কর্ম্মজীবনের বন্ধু রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল বসন্তকুমার বসু জজ লালমোহন দাস, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখো-

পাধ্যায়, মাদ্রাজের আনন্দ চালু, ভাগলপুরের দীপ নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার রসাল কথোপকথন ভঙ্গীর বিশেষ প্রশংসা করিতেন। অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে হাইকোর্টের জজেরা, পুলিশকোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেটেরা শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট উকিল সভার তৎকালীন সভাপতি এবং তাঁহার প্রাচীন অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র উকিল সভার পক্ষ হইতে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওকালতি ব্যবসায়ে অমরেন্দ্রনাথের নিকট কয়েকজন শিক্ষানবিশি করিয়া উত্তরকালে প্রতিষ্ঠাপন্ন উকিল হইয়াছিলেন তন্মধ্যে তেওতার জমিদার হরশঙ্কর রায় চৌধুরীর, শিউরীর সরকারি উকিল রায় বাহাদুর কালিকানন্দন মুখোপাধ্যায়ের ও কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর, রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধুর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই অমরেন্দ্রনাথকে চিরদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

অমরেন্দ্রনাথ অল্প বয়স হইতেই যশস্বী হইয়াছিলেন। মদনমোহন ও চন্দ্রমোহন যে খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করেন অমরেন্দ্রনাথের চরিত্র গুণে তাহা বহুল পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। নিজের ব্যবসায়ে অমরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু সঞ্চয় লিপ্সা তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল না। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরায়ণ অমরেন্দ্রনাথে সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের সাত্ত্বিকভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ পৈত্রিক সম্পত্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া মুক্ত হস্তে স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া চারিটি কন্যার ও দৌহিত্রীর বিবাহ ও পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ এবং তাঁহাদের গয়াকৃত্য সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সপরিবারেও কয়েকটী আত্মীয় লইয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থও দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। সদাশয় ও উদার প্রকৃতিবশে অমরেন্দ্রনাথ একদণ্ডও মানুষের সংসর্গ বিরহিত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। যে আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা তাঁহার পিতার,

পিতামহের ও ভ্রাতাদের চরিত্রগত ছিল অমরেন্দ্রনাথ তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। যে নির্জ্জনতা লেখকের সাধনার সহায় সে নির্জ্জনতা অমরেন্দ্রনাথের নিকট দুঃসহ বোধ হইত। পরোপকার অথবা স্বীয় কীর্ত্তি স্থাপন অথবা নিজের আনন্দবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিবার উচ্চাভিলাষ তাঁহার ছিল না। নির্জ্জনপ্রিয়তা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ থাকায় সেদিকে প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয় নাই। অমরেন্দ্রনাথ চিরদিন বলিতেন যে ছিপে মৎস্য শীকার বাল্যকাল হইতে কোনও দিন তাঁহাকে আনন্দ দিত না। একদিকে আহারের প্রলোভনে জীবকে আকৃষ্ট করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথা দিত, অপরদিকে তরঙ্গের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া বসিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাঁহার ছিল না। নানাবিধ মনুষ্যচরিত্রের অভিজ্ঞতা, সাহিত্যরসজ্ঞতা, শব্দচয়ন, লিখনানুরাগ প্রভৃতি যে সকল গুণে প্রতিভাশালী সুলেখক হওয়া যায় তাহার সমাবেশ তাঁহাতে থাকিলেও অমরেন্দ্রনাথকে যে লেখক বা গ্রন্থকার হইতে প্রণোদিত করে নাই এই ধৈর্য্যের অভাব তাহার অন্যতম কারণ। উপযুক্ত শ্রোতা পাইলে তাঁহার যেরূপ আনন্দ হইত এমন আনন্দ কিছুতেই হইত না। মানুষের সহিত কথা কহিবার আনন্দে তিনি ভরপুর থাকিতেন। কিন্তু এই কথার মধ্যে পর কুৎসার প্রশ্রয় তিনি কোনও দিন দেন নাই।

ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অমরেন্দ্রনাথকে বিশেষ পীড়া দিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে দারিদ্র্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ কোনও অপরাধ নয়। তিনি বলিতেন যে মানুষের আভিজাত্য তাহার ধনাদি বাহ্যিক সম্পদের উপর নির্ভর করে না। তাহার অন্তরের সম্পদের উপর এই আভিজাত্য নির্ভর করে। দরিদ্রের সহিত অন্তরের যোগ অমরেন্দ্রনাথ অনুভব করিতেন। তাঁহার অপরূপ ভৃত্যবাৎসল্যে তাহা প্রকাশ পাইত। বাটীতে কোনও ভৃত্যের পীড়া হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসক আসিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা না করিতেন ও রোগীর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা না হইত

ততক্ষণ অমরেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। অনেক সময়ে রোগীর সেবাশুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করিতে রাত্রিজাগরণের ভার অমরেন্দ্রনাথ নিজে আনন্দে গ্রহণ করিতেন। ভৃত্যদের দেশস্থ পরিবারবর্গের ও তাহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে অমরেন্দ্রনাথ ভাল বাসিতেন। অমরেন্দ্রনাথ লোককে মানুষ বলিয়া মর্য্যাদা করিতেন। কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিতেন না। এমন কি নিজের আহার্য্য হইত ভৃত্যকে অগ্রভাগ না দিয়া আহারে বসিতেন না। সামাজিক নিমন্ত্রণে গিয়াও ভৃত্যকে আহার্য্য না দেওয়া পর্য্যন্ত পংক্তি ভোজনে যোগদান করিতে পারিতেন না। শেষ জীবনে ইংরাজি পোষাক পরিচ্ছদ অবলম্বন করিলেও হিন্দুধর্ম্মে অমরেন্দ্রনাথ চিরদিন আস্থাবান ছিলেন আনুষ্ঠানিক হিন্দু না হইলেও ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য গায়ত্রী জপ ও ইষ্টমন্ত্র জপ কোনও দিন বাদ পড়ে নাই। নিয়মিত শ্রাদ্ধাদি তিনি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন।

শেষ জীবনে প্রত্যহ প্রাতে ভগবানের নাম লিখিতেন। তবে ইহাতেও অমরেন্দ্রনাথের সার্ব্বজনীন ভাব ফুটিয়া উঠিত। কেবল দুর্গা নাম লিখিয়া নিরস্ত হইতেন না। যতগুলি ভাষা ও লিপি জানিতেন তাহাতে সংক্ষেপে ভগবানের নিকট দৈনন্দিন প্রার্থনার যে ব্যবস্থা আছে সেই ভাষায় এবং অক্ষরে সেগুলি লিখিত হইত। ইহার সময় কমাইয়া অন্য কোন কাজে সে সময় ব্যয় অমরেন্দ্রনাথ কোন দিনও করিতেন না। ইংরাজি পোষাক অবলম্বনেরও একটি কারণ ছিল। অমরেন্দ্রনাথ কিছুদিন শিরঃপীড়ায় কাতর হন। শামলা ব্যবহার করা তখন তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় এবং তখন হাইকোর্টে উন্মুক্ত মস্তক ভদ্রোচিত বলিয়া গণ্য না হওয়ায় শামলার দায় এড়াইবার জন্য বাধ্য হইয়া অমরেন্দ্র নাথ ইংরাজি পোষাক অবলম্বন করেন।

বর্ত্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয় পোষাক যে ভাবের সূচনা ও বৈশিষ্ট্যের গৌরব আনিয়াছে অমরেন্দ্রনাথের সময়ে রাজনীতিক জীবনে

তাহার স্থান ছিল না। দেশের দশের কাজ করিতে অমরেন্দ্র নাথের খুল্লপিতামহ চন্দ্রমোহন অমরেন্দ্র নাথকে উৎসাহিত করেন। চন্দ্রমোহন চির জীবন বিলাত ও এখানে দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। তাহাতে আত্মগৌরব বোধ করিলেও পরিচ্ছদের ভাবের ও ভাষার সাহায্যে শাসনকর্ত্তাদের সহিত ভেদাভেদ রাখিয়া নিজেদের জাতীয়তার পরিপুষ্টি করিতে হইবে চন্দ্রমোহন বা অমরেন্দ্রনাথ কখনও এভাবে অনুপ্রাণিত হন নাই। চন্দ্রমোহন যে যুগে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তখন কি শাসক সম্প্রদায়, কি জনহিতৈষী ভদ্রমহোদয়গণ কেহই জন-সাধারণের মতামত লওয়া আবশ্যক মনে করিতেন না। তাঁহারা যাহা জনসাধারণের কল্যাণকর স্থির করিতেন তাহাই করিতেন। ইহাকে মুরুব্বিয়ানা রাজনীতি বলা চলে। জনসাধারণ ইহাতে যতদূর সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া নিজেদের আদর্শ অনুসারে তাহাদের উন্নতির ও উপকারের চেষ্টা করাই ছিল এই রাজনীতির মূলমন্ত্র। অমরেন্দ্রনাথ যে যুগে রাজ-নীতি চর্চ্চায় যোগ দিলেন তখন জনসাধারণ নিজেদের স্বত্ব অধিকার সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হইতেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত হইতে আসিবার সময়ে জর্জ্জ টম্পসন্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাঁহার বক্তৃতায় ও সাহচার্য্যে "চক্রবর্ত্তী ফ্যাকসন" নামে পরিচিত ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ মূক জনসাধারণকে মুখর করিয়া তোলা প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তৎকালে বাঙ্গালী ডিমস্থিনিজ বলিয়া খ্যাত রামগোপাল ঘোষকে আদর্শ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই বাগ্মিতাকে রাজনীতি চর্চ্চার প্রধান উপায় বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। বিলাতের আদর্শে আন্দোলন করিতে পারিলে জনসাধারণের আশার ও আকাঙ্খার সুস্পষ্ট বিকাশে এ দেশে ও বিলাতে রাজপুরুষেরা অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন এবং জন-সাধারণকে ক্রমশঃ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবেন এই বিশ্বাস সে যুগের রাজনীতিকদলে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কাজেই আন্দোলন অবশ্য কর্ত্তব্য

হইয়া উঠিল এবং ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার রাজনীতি সম্পর্কিত ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য হইল। অমরেন্দ্রনাথে এই প্রকাশের একটা স্বাভাবিক প্রেরণা থাকায় বাগ্‌ভঙ্গির প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার পিতার প্রকৃতির বিপরীত ছিল। পিতা একেবারে আত্মপ্রকাশে পরাঙ্মুখ ছিলেন। পুত্রের আচারে ব্যবহারে, চালচলনে, কথোপকথনে তাঁহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ স্বতঃই পরিস্ফুট হইত। ভাষার প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকায় ভাষা শুদ্ধির দিকে অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ইংরাজি বাঙ্গালা মিশাইয়া ভাষা প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণ সভায় অমরেন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিতেন। সে সময়ে কলিকাতা রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থান এবং সেই সকল আন্দোলনের সহিত অমরেন্দ্রনাথের যোগ ছিল। কিন্তু যখন অমরেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া আয়োজন উদ্যোগ করিতে লাগিলেন তখন তাহার কার্য্য প্রণালীর উপর আস্থা না থাকায় তিনি তাহাতে যোগ দিলেন না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যত দিন শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান না হয় ততদিন এরূপ বিরাট আন্দোলন শুভফলপ্রসূ হইবে বলিয়া অমরেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল না এবং সেই কারণে বিভিন্ন প্রদেশ নিজ নিজ অভাব লইয়া স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন করুক অমরেন্দ্রনাথ ইহাই মনে করিতেন। তাঁহার পিতা যেমন পরিবারের ক্ষুদ্রগণ্ডী তাঁহার কর্ম্মের কেন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, অমরেন্দ্রনাথও সেইরূপ কলিকাতা বাসীর সর্ব্ববিধ পৌর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া, গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মের প্রতি আশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রাচুর্য্য চন্দ্রমোহনের চরিত্রগত হওয়ায় নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাঁহার জনহিতৈষণা সাফল্য লাভ করিত। ভাবপ্রবণ অমরেন্দ্রনাথের জনহিতৈষণা

তাঁহার চিন্তাশীলতার সাহায্যে পরিপুষ্ট লাভ করিয়া বাগ্মিতায় আত্ম প্রকাশ করিত।

সন ১৩১২ সালে (১৯০৫ খৃঃ) ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন ৬১ বৎসর বয়সে অমরেন্দ্রনাথ জ্বর রোগে কালগ্রাসে পতিত হন।

অমরেন্দ্রনাথের দুই বিবাহ ১২৬৭ সালে যশোহর বাৎস্য গোত্রীয় শ্রোত্রিয় নরেন্দ্রপুর নিবাসী মহিমা চরণ মজুমদারের কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। অমরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পক্ষে মুখুটি ভরদ্বাজ গোত্রীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী ১২৯০ সালে তিনটি কন্যা রাখিয়া পরলোক গমণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কাটোয়া নিবাসী ফুলের মুখুটি নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। অমরেন্দ্র নাথের অন্যতমা দৌহিত্রী উক্ত নীরদ নাথের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত মহারাজা বাহাদুর স্যর প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে। অমরেন্দ্র নাথের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত খড়দহ মেলী কামদেব পণ্ডিতের সন্তান বর্দ্ধমান মানকর নিবাসী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। অমরেন্দ্র নাথের দ্বিতীয়া কন্যা আজীবন তাঁহার গৃহেই ছিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় জামাতা ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহের পরে অমরেন্দ্র নাথের সংসার ভুক্ত হইয়া প্যারীচরণ সরকারের ফাষ্টবুক হইতে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র নাথের যত্নে ও শিক্ষার গুণে চারি বৎসরের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষেত্রনাথ যথাক্রমে দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন এবং বি, এল, পাশ করিয়া কলিকাতা পুলিশ কোর্টে ওকালতি করিতেন। ক্ষেত্রনাথের একমাত্র কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৌত্র সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ স্বণাম ধন্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে। অমরেন্দ্র নাথের

৺ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয়া কন্যার সহিত শাণ্ডিল্য গোত্রিয় শুদ্ধশ্রোত্রিয় আন্দুল মহিয়াড়ী নিবাসী লাহোর চীফ কোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের অন্যতম ব্যারিষ্টার উমাপদ রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা ও একটী পুত্র হয়। এই কন্যার সহিত খড়দহমেলী যোগেশ্বর পণ্ডিত বংশীয় সাতক্ষীরা নিবাসী রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। বিবাহের পর মহেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথের সংসার ভুক্ত হন ও নানাস্থানে চাকরি করেন। উত্তরকালে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গল অ্যাম্বুল্যান্স কোর নামে শুশ্রূষাকারী স্বেচ্ছাসেবকদল সংগঠিত হইলে মহেন্দ্রনাথ এই দলে যোগদান করেন এবং পূর্ব্ব পারস্যের বারেজন্দে অবস্থান করিয়া যশের সহিত মেসোপোটেমিয়ায় কার্য্য করেন। অমরেন্দ্র নাথের জীবদ্দশায় তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পরলোকগমন করেন।

অমরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র গোপালদাস সন ১৩০৬ সালে আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ডিগ্রি লাভ করিয়া এম, এ ও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি খড়দহমেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রবংশীয় কলিকাতা ইটালিনিবাসী অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং নিঃসন্তান অবস্থায় ঐ পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার ভগ্নীকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই।

ধীরেন্দ্রনাথ।

সন ১২৫৩ সালে (১৮৪৭ খৃঃ) ২৩শে মাঘ তারিখে মদনমোহনের ভদ্রাসন বাটীতে দীনেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে মাধবগুরুর পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্কুলে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইং ১৮৬৪ সালে

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠারম্ভ করেন। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ধীরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ১৮৬৬ সালে এফ্‌. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। তিনি সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ফ্রেঞ্চ ভাষা লইয়া পরীক্ষা দিবার মানসে সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে একবৎসর পাঠের পর, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইবার জন্য যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে উচ্চস্থান অধিকার করেন। কিন্তু কলেজের খ্রীষ্টান অধ্যাপকেরা ধীরেন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন না। কারণ কলেজে অবস্থানকালে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কে ধীরেন্দ্রনাথ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও তাঁহার মত ছাত্রের দ্বারায় সেণ্টজেভিয়ার কলেজের গৌরব হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইবে না বলিয়া অধ্যাপকেরা মনে করিয়াছিলেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এই অসঙ্গত বিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ধীরেন্দ্রনাথ কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া দেন। ইহার পর চিত্রকলা শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র হন। কিন্তু চিত্রকলা শিক্ষাতে কয়েক মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহার চক্ষুরোগের উৎপত্তি হয়। ডাক্তার বেলি সাহেবের পরামর্শে চিত্রশিক্ষা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ধীরেন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ে সেতার ও কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করেন। কাপড় কেনা ও কাটা কাপড় তৈয়ারী করা তাঁহার আর একটি সখের বিষয় ছিল। হারম্যান কোম্পানীর তৈয়ারি কাপড়ের সেলাই খুলিয়া তাহার উপর কাগজ ফেলিয়া বাটীর দেশী দর্জ্জিকে সেইরূপ কাট ছাঁট শিখাইতেন এবং তাহার দ্বারায় অবিকল সেইরূপ কাপড় প্রস্তুত করাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। সওদাগর

ছিকি সাহেবের অফিসে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ঐ আফিস উঠিয়া যাইলে তিনি সওদাগর জোকানিজ সাহেবের আফিসে কর্ম্ম করেন। তিনি বৈগুবাটী চাঁপদানিতে একটি কয়ারম্যাটিং ফ্যাক্টরী লইয়া, দড়ি বুরুশ ও পাপোষ প্রস্তুতের ব্যবসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই ব্যবসা কয়েক বৎসর চালাইয়া সাহেব কোম্পানীদের সহিত প্রতিযোগীতায় বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় তিনি ব্যবসা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর গ্রেহাম কোম্পানীর বস্ত্র বিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ধীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির একজন লাইসেন্স ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হন। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। প্রত্যহ প্রাতে ৫টায় বাহির হইয়া কলিকাতায় রাজপথে নানাস্থানে স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বেলা ১২টার সময় বাটী ফিরিতেন এবং পুনরায় বেলা ৩টার সময় বাহির হইয়া রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত আফিসের কাজ করিয়া বাটী আসিতেন। তখন পুলিশ কোর্টের বৈতনিক ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে লাইসেন্স সংক্রান্ত মামলার বিচার হইত এবং এই সকল মামলায় লাইসেন্স ইন্স্পেক্টরদিগকে উকিলের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। এই সূত্রে ধীরেন্দ্রনাথকে সময়ে সময়ে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের বিরুদ্ধে বাদানুবাদ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে সাফল্যলাভ করিতে হইত। এই অত্যধিক পরিশ্রম ফলে এবং অনিয়ম হেতু তাঁহার অজীর্ণ ও অম্লরোগের সূত্রপাত হয়। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া এই পদ ত্যাগ করিতে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির তৎকালীন ভাইসচেয়ারম্যান গোপাল লাল মিত্র ও চেয়ারম্যান হ্যারিসন্ সাহেব তাঁহার কার্য্যকুশলতার জন্য বিশেষ প্রশংসা-সম্বলিত একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। তাহার পরে এই রোগে বার তের বৎসর কষ্ট পাইয়া "ব্রাইটস্ ডিজিজ্" রোগে সন ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে ধীরেন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ মধ্যমাকৃতি ও মধ্যম পুষ্টাঙ্গ ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে হিন্দুস্কুলের কতিপয় ছাত্রবৃন্দ একখানি বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এখনকার মত তখন স্কুলে স্কুলে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না।

যাঁহাদের উৎসাহে ও অর্থ সাহায্যে এই অনুষ্ঠান হয়, ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দেবদ্বিজে অবিচলিত ভক্তি ও নিষ্ঠাপূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা পালন ও সাধনভজনের নিমিত্ত কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবল অনুরাগ তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। ফলিত জ্যোতিষে তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ও ফলাফল গণনায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতাও জন্মিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে—তাঁহার পিতার চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ধনী মধ্যবিত্ত নির্ব্বিশেষে বহুলোকের সহিত তাঁহাকে মিশিতে হওয়ায়, তাঁহাতে অনেক সামাজিক গুণের বিকাশ হইয়াছিল। যাঁহারা ধীরেন্দ্রনাথের পরিচয় লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহারা চিরদিন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ মহারাজা কৃষ্ণদাস লাহা এবং রাজা হৃষিকেশ লাহা, চুনিলাল দত্ত, বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়বর্গ চিরদিন তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ধীরেন্দ্রনাথের মেধা, হিসাবে তাঁহার অনন্যসাধারণ জ্ঞান, সকল কাজের সমস্ত বিভাগের অতি ক্ষুদ্রাংশও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আয়ত্ত করিবার শক্তি, কার্য্য সম্পাদনে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুচারু পদ্ধতি ও একাগ্রতার সহিত অক্লান্ত শ্রমশীলতা, বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যকুশল করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই হেতু পিতামহ মদনমোহন অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ধীরেন্দ্রনাথও পিতার ন্যায় কার্য্যদক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য ছিল।

পিতা সকল কাজেই নিক্তির ওজনে নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ এবিষয়ে অধিক সাহসী ছিলেন। কাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে সাধ্যাতীত শক্তি প্রয়োগেও কার্য্যোদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইতেন এবং শ্রমশীলতায় অপরিসীম ধৈর্য্যশীল ছিলেন। কাজ করিতে বসিয়া কাজের উৎকর্ষের ও পদ্ধতির প্রতি ধীরেন্দ্রনাথের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত। পারিশ্রমিক ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ন্যায়পরতায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় ধীরেন্দ্রনাথ পিতার ন্যায় কঠোর ছিলেন। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের চরিত্রে তাঁহার পিতার দুঃখজয়ী গভীর জ্ঞান ও তিতিক্ষার অভাব ছিল। আভিজাত্যের স্বতন্ত্রপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা জ্ঞান ও প্রখর অনুভূতি থাকায় ধীরেন্দ্রনাথ অল্পে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইতেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অমরেন্দ্র নাথের ভাবের উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও সহৃদয়তা ধীরেন্দ্র নাথে না থাকায় তিনি লোকের সহিত অবাধে মিশিতে পারিতেন না।

সন ১২৭১ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী ও খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হয়, তন্মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুকালে দুই পুত্র খগেন্দ্রনাথ ও গুরুদাস এবং তিন কন্যা জীবিত ছিলেন। কন্যাদের মধ্যে দুই টীর বিবাহ ধীরেন্দ্র নাথের জীবদ্দশায় হয়। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথমা কন্যার সহিত খড়দহ নিবাসী ফুলিয়া মেলী শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়া নিজ গৃহেই তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে ঐ কন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। ধীরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত এঁড়েদহের ঘোষাল প্রসিদ্ধ রামদেব তর্কবাগীশ বংশীয় শশীভূষণ ঘোষালের

পুত্র ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অন্যতম দৌহিত্র সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষালের বিবাহ হয়। ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৮।৯ বৎসর পর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত পূর্ব্বোক্ত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন রায়ের পঞ্চম পুত্র হরিপদ রায়ের বিবাহ হয়।

খগেন্দ্রনাথ।

ধীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রনাথ সন ১২৮০ সালের আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি। ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর সাহচর্য্যে ও প্রভাবে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ। এই অনুরাগ তাঁহাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আকৃষ্ট করে। সেখানে চারিবৎসর অন্যতম সহকারী সম্পাদক ও চারিবৎসর সম্পাদক রূপে বাঙ্গালার এই সর্ব্বাগ্রগণ্য সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক থাকায় কয়েক বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেরও সম্পাদক ছিলেন ও উক্ত সম্মিলনের মেদিনীপুর ও নৈহাটীতে যে অধিবেশন হইয়া ছিল তাহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সাহিত্যিক মাত্রেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্য পরিচালন সমিতির সদস্য এবং রমেশভবন সমিতির অন্যতম সম্পাদক। এতদ্ভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর, ভারতসঙ্গীত সমাজের, অর্দ্ধেন্দু নাট্যপাঠাগারের, পেয়ারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালন সমিতির সদস্য। এই সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে খগেন্দ্রনাথ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে কখনও কাতর হন নাই। কেহ কোন জনহিতকর কার্য্য লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে খগেন্দ্রনাথ সে বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেন এবং তাহার সম্পাদন সাহায্যে নিজে অকাতরে সময় ও পরিশ্রম দিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

খগেন্দ্রনাথ সদালাপী ও শিষ্টাচারী। তিনি একজন নীরব কর্ম্মী। তিনি কখনও কোনও প্রতিষ্ঠানের নামে নিজেকে জাহির করেন নাই। বিদেশী ভাবাশ্রিত অনেক ফ্রিমেশন সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য থাকায় খগেন্দ্রনাথ তাহারও উন্নতিকল্পে যত্নশীল। খগেন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভার কার্য্য পরিচালন সমিতিতে সদস্যরূপে কাজ করিয়াছিলেন। স্বভাবগত আত্মীয় বাৎসল্যের প্রেরণায় স্বসম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে খগেন্দ্রনাথ ঠাকুর বংশের অগ্রণীদের লইয়া পারিবারিক হিতকরী সভা গঠন করেন এবং সেই সভার সাহায্যে অনাথা বিধবার ভরণ-পোষণ ও পিতৃহীন বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আজ সতের বৎসর এই সভা চলিতেছে এবং খগেন্দ্রনাথ ইহার কর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত আছেন।

অনেকেই জানেন খগেন্দ্রনাথের সম্প্রতি ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাঁহার অবস্থান্তরের ফলে মদনমোহনের সম্পত্তির বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। মদনমোহন উইল করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি তাঁহার চার পৌত্রকে তুল্যাংশে দিয়া যান। কিন্তু মদনমোহনের মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধরেরা দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর একত্রে ছিলেন। মদন মোহনের বংশধরগণ চরিত্রগত পার্থক্য সত্বেও এবং অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চিরদিন বিভাগের বিরোধী ছিলেন। এই সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতি তাঁহাদের পারি-বারিক বিশিষ্টতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মদন মোহনের সম্পত্তি আপোষে বার আনা ও চারি আনা অংশে বিভক্ত হয় ও খগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহোদর চারি আনা অংশ লইয়া পৃথক হন। খগেন্দ্রনাথ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় তাঁহার কোনও উত্তমর্ণ তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করিয়া

তাঁহাকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন। প্রকৃতির ও মতের পার্থক্য সত্বেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত্য করা এই বংশের পূর্ব্বাপর রীতি। খগেন্দ্রনাথও সে বিষয়ে সমধিক ভাগ্যবান। তাঁহার এই দুর্দ্দিনে তাঁহার সহোদর ও বন্ধুবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া কয়েকবৎসর অবিচলিত-ভাবে ভ্রাতার সাহায্য করিয়া বহুল পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন।

খগেন্দ্রনাথ প্রথম পক্ষে পূর্ব্বোক্ত শশীভূষণ ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের দৌহিত্রীকে বিবাহ করেন। এই সূত্রে খগেন্দ্র নাথ কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন হন এবং খগেন্দ্রনাথের কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার ষ্টেটের অন্যতম একজিকিউটার মনোনীত করেন। খগেন্দ্রনাথও পনের বৎসর সে কাজ যথারীতি সম্পাদন করেন। খগেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পক্ষে বাৎস্য গোত্রীয় শ্রোত্রিয় বাসুদেবপুরনিবাসী রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মধ্যমাকন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে খগেন্দ্রনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই।

খগেন্দ্রনাথের একমাত্র সন্তান রমেন্দ্রনাথ একজন উদীয়মান শিল্পী ও মনোমোহন নাট্যমন্দিরের চিত্র শিল্পাধ্যক্ষরূপে অনেকের নিকট পরিচিত। রমেন্দ্রনাথ ফুলের মুখুটি রায় গুণাকর কবিবর ভারত চন্দ্রের জ্ঞাতি বংশীয় ফয়জাবাদনিবাসী ৺প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার একটি শিশুকন্যা বর্ত্তমান।

গুরুদাস।

ধীরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়পুত্র গুরুদাসের জন্ম সন ১২৯১ সালের পৌষ মাসে। ডভটন্ কলেজে ও স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন এবং গ্রেহাম কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি নরনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। নরনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে উক্ত কোম্পানীর কেরোসিন তৈলের

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

ব্যবসা এসিয়াটিক্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানির হস্তে যাওয়ায় মুচ্ছুদ্দি বিভাগ উঠিয়া যায় এবং গুরুদাস এশিয়াটিক পেট্রোলিয়াম কোম্পানির প্রধান ভারতীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হন, তিনি এখনও সেই কাজ করিতেছেন। কর্ম্মসূত্রে উত্তর ভারতের নানা স্থানের বণিকবৃন্দ যে কেহ একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসে, সেই তাঁহার কার্য্যকুশলতায়, সরল বাক্যালাপে ও সহৃদয় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। অনেক সময়ে তাহার বিরোধীপক্ষও তাঁহার সহজজাত সৌজন্যের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইংরাজি সাহিত্যে ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় গুরুদাস বিদ্বজ্জন সমাজেও অনেকের সহিত সুপরিচিত।

গুরুদাস ভগ্নীপতি সলিলেন্দ্র মোহনের ট্রাষ্টি হইয়া দশবৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। প্রকৃতিগত পরার্থপরতায় ও স্নেহ প্রবণতায় গুরুদাস এই সূত্রে নিজের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ও ঋণভার প্রপীড়িত হইয়া পড়েন। অবশেষে তিনি দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

তিনি হাওড়া জেলার আন্দুল মহিয়াড়ী গ্রামনিবাসী শাণ্ডিল্য গোত্রিয় শ্রোত্রিয় দেবেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে চারিটি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রশান্তকুমারও তাহার ভ্রাতা রাণী ভবানী স্কুলের ছাত্র।

বিপ্রেন্দ্রনাথ।

দীনেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র বিপ্রেন্দ্রনাথ সন ১২৫৫ সালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে (ইং ১৮৪৮ খ্রীঃ) জোড়াসাঁকোর পৈত্রিক ভদ্রাসনে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীস্থ মাধবগুরুর পাঠশালে ভ্রাতাদের

ন্যায় বিপ্রেন্দ্রনাথেরও বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্কুলে ইংরাজি শিক্ষা চলিতে থাকে। হিন্দুস্কুল হইতে বিপ্রেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরে সেণ্টজেভিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন। শেষোক্ত কলেজে তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষায় পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া এটর্ণি ওয়েণ সাহেবের আপিসে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার হেকেল সাহেবের পিতা এটর্ণি হেকেল সাহেবের আপিসে কিছুদিন শিক্ষানবিশি করিয়া এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইং ১৮৭৯ সালে ১১ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি হইয়া বিপ্রেন্দ্রনাথ এটর্ণি ব্যবসা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ হরেস্ হেম্যান উইলসন্ সাহেবের পৌত্র টমাস হরেস উইলসন সাহেব এদেশে বিলাতে প্রিভি কৌন্সিল মোকদ্দমার এজেন্সী লইয়া আসিয়া একটী এটর্ণির আপিস খুলেন। বিপ্রেন্দ্রনাথ সেই আপিসে অংশীদাররূপে গৃহীত হন এবং আপিসের নামকরণ হয় "উইলসন্ এণ্ড চ্যাটার্জ্জি।" বিপ্রেন্দ্রনাথের কার্য্যকুশলতায় অল্পদিনের মধ্যে এই আপিসের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ওকালতি ব্যবসা ভিন্ন বিপ্রেন্দ্রনাথ ক্লাইভ ষ্ট্রীট "কাষ্টিং এণ্ড গ্রিণমণ্ড" কোম্পানির হার্ডওয়ার দোকানের ও মেটেবুরুজের "প্যারি এণ্ড কোম্পানির" কারখানার অংশীদার ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিগত সাবধানতার বশে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই ঐ সকল কারবারের সহিত সম্বন্ধ তুলিয়া দেন। ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে বিপ্রেন্দ্রনাথের চরিত্র পৃথক ছিল। অমরেন্দ্রনাথকে ওকালতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় কোনও দিন আকৃষ্ট করে নাই। ইং ১৯০১ সালে বিপ্রেন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় এটর্ণির ব্যবসা

৺বিপ্রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হইতে অবসর লন। ওকালতি হইতে অবসর লইবার ৩।৪ বৎসর পর বাবুলাল আগরওয়ালার দেবোত্তর ষ্টেটের ট্রাষ্টি আদালত হইতে মনোনীত হন। বিপ্রেন্দ্রনাথ জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর বাবুলাল ষ্টেটের ট্রাষ্টি ছিলেন। ট্রাষ্টিদের ব্যবস্থায় বাবুলালের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা দেবালয়ের ও মথুরার মন্দিরের নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদির সর্ব্ববিধ কার্য্য আমুল পরিবর্ত্তিত হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে। বিদেশাগত ব্যক্তিদের কলিকাতায় অবস্থানের সুবিধার জন্য বাবুলাল আগরওয়ালার ট্রাষ্ট হইতে বড়বাজার হ্যারিসন রোডে একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কার্য্যে বিপ্রেন্দ্রনাথ যথেষ্ট উৎসাহ লইয়া প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ট্রষ্টিদিগের সুব্যবস্থায় বাবুলালের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপের টোলের এবং বাবুলালের ষ্টেটের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে।

সন ১২৭৫ সালে কলিকাতানিবাসী তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত বিপ্রেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ১২৮১ সালে বিপ্রেন্দ্রনাথের এই পত্নী একটি শিশু কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। উত্তরকালে এই কন্যার সহিত ফুলিয়ার মুখুটি শিবাচার্য্য ঠাকুরের সন্তান রামবল্লভ ঠাকুরের দৌহিত্র নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। নলিনচন্দ্র কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী কোষাধ্যক্ষ-রূপে বহুজন পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন বিপ্রেন্দ্রনাথের পত্নী বিয়োগের পর বিপ্রেন্দ্রনাথ তাঁহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ফুলিয়ামেলী রামেশ্বরের সন্তান যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন এই কন্যা মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী পুত্রী। এই পত্নীর গর্ভে বিপ্রেন্দ্রনাথের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হয়, কিন্তু দুইটী কন্যা ও একটি পুত্র ব্যতীত সকলেই শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হয়। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত ফুলিয়ার মুখুটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সন্তান সুবর্ণ-পুর নিবাসী মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বঙ্কুলাল মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ

দিয়া তাঁহাকে বিপ্রেন্দ্রনাথ নিজের সংসারভুক্ত করিয়া রাখেন। বঙ্কুলাল স্বাস্থ্য ভঙ্গের পূর্ব্বে জহরতের ব্যবসায় করিতেন এবং সেই সূত্রে কলিকাতার ধনী ও আভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট সুপরিচিত। বিপ্রেন্দ্র নাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র কুমার নবাব শ্যামা কুমার ঠাকুরের বিবাহ হয়। এই কন্যা পিতার জীবদ্দশায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১৩২৪ সালের ১৪ই শ্রাবণ তারিখে বিপ্রেন্দ্রনাথ দুইটী কন্যা ও একমাত্র পুত্র শ্যামানাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বিপ্রেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁহার বৃদ্ধপিতামহ চন্দ্রমোহনের ইচ্ছা মৃত্যুর ন্যায় অলৌকিক না হইলেও উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঘটিত সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার পূর্ব্ব হইতে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রশান্তভাবে প্রস্তুত থাকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বিজ্ঞ বৈষয়িক লোকেরা যেমন যথা সময়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে এবং পাকা গৃহিণীরা যেমন ঐ উদ্দেশে সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে গুছাইয়া রাখে, নিজের মৃত্যু শয্যায় এবং মৃতদেহ বহনের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে চিরসাবধানী বিপ্রেন্দ্রনাথ তাহার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি বন্ধ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনান্তর মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলেন। নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে সময়ের একটা ধারণা যেন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল। যে খাটে তাঁহার দেহ শ্মশান ঘাটে লইয়া যাইতে হইবে তাহা নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের অন্তেষ্টিক্রিয়া, আদ্যশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ কি ভাবে করিতে হইবে তাহা পুত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দেন। মানুষে এইভাবে মৃত্যুশয্যায় নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে ধীর ও অবিচলিতভাবে উপদেশ দিতে পারে অথবা পূর্ণজ্ঞানে গৃহ ও পরিজন ছাড়িয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতে গঙ্গাতীরে যাইয়া অপেক্ষা করিতে পারে, হিন্দু ভিন্ন

অপর ধর্ম্মাবলম্বীর ইহা ধারণায় আসে না। এইরূপ প্রসঙ্গে অনেক সাহেবের মুখে আমরা অবিশ্বাসের হাসি দেখিয়াছি।

বিপ্রেন্দ্রনাথ গৌরবর্ণ একহারা গঠনের ছিলেন। বিপ্রেন্দ্রনাথের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে তাঁহার পিতামহ মদনমোহনের অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রমশীলতা, আত্মনির্ভরতা, একাগ্রতা, কর্ম্ম-নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্ম্মপ্রণালী, ধীর ও সুসংযত স্বভাব, এবং শাস্ত্রানুরাগ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে তাঁহার পিতামহ মদনমোহনের বিশেষ প্রিয়পাত্র করিয়াছিল। সর্ব্ব বিষয়ে সাবধানতা, মিতব্যয়িতা, এবং সঞ্চয়শীলতা, বিপ্রেন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রধান গুণ। এই সঞ্চয়শীলতাগুণে কলিকাতার বাসস্থানের ও মাসিক আয়ের সংস্থান করিয়া দিয়া বিপ্রেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়া কন্যাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিতে সফলকাম হইয়াছিলেন। তিনি এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন যে কোনও কাজ করা স্থির করিলে লোকের সন্তুষ্টি, বিরাগ, প্রশংসা, নিন্দা এবং উপদেশ উপেক্ষা করিয়া অবিচলিত চিত্তে সে কাজ করিতেন। তাঁহাকে নিরস্ত করা দুঃসাধ্য হইত। অর্থ, সামর্থ্য এবং সময় সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল "অপচয় করিও না, অভাব হইবে না।" তিনি চিরদিন সকল কাজ হাতে কলমে করিতেন এবং শ্রমিকের মর্য্যাদা বুঝিতেন। গো-পালন ও উদ্যান রচনা বিপ্রেন্দ্র নাথকে চিরদিন আকৃষ্ট করিত। নিজের হাতে কাঠের ছোট ছোট নানাবিধ গৃহসজ্জা গঠন তাঁহার একটি সখের মধ্যে ছিল। মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা এবং উপদেশ দিয়া করান উভয়ই তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। বাটীর মহিলাবর্গের জন্য জহরতের অলঙ্কার তিনি স্বর্ণকারকে নিজে চিত্রে বুঝাইয়া দিয়া মনের মতন গঠন করাইয়া লইতেন। তিনি সকল কাজ নিজের প্রণালীমত সুসম্পন্ন করিতে চাহিতেন। তাঁহার মতে দ্রুত সম্পাদন অপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে বহুগুণে শ্রেয়ঃ; এমন কি যদি তাঁহার কোনও মক্কেল অতি দ্রুত কোন কাজ সম্পন্ন করিতে বলিত উত্তরে

বিপ্রেন্দ্রনাথ অনেক সময় অন্যত্র কাজ করাইতে পরামর্শ দিতেন। ওকালতি ব্যবসা করিতে বসিয়া তিনি বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোনওদিন দয়া দাক্ষিণ্য ভুলিতে পারেন নাই এবং কোনও দিন শোধকবৃত্তির পরিচয় দেন নাই। বিপ্রেন্দ্রনাথ লোকের সহিত সাধারণতঃ কথা কম কহিতেন। তিনি জনপ্রিয় এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং লোকে তাঁহার মতামত বহুমূল্য বলিয়া গণ্য করিত। ধর্ম্মশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠে ও পুরাণ শ্রবণে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সাধারণতঃ তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বিদেশ গমনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আত্মীয় স্বজনের বিশেষ অনুরোধে একবার তিনি দার্জ্জিলিং লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়মে কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। পিতামহের গয়াকৃত্য করিতে চারিদিন কলিকাতা ত্যাগ তাঁহার জীবনে দ্বিতীয় প্রবাস যাত্রা। হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিরদিন শ্রদ্ধা থাকায় সন্ধ্যাবন্দনার কাল ব্যতীত শেষ রাত্রিতে ও দিনের মধ্যে যখনই অবসর পাইতেন তখনই জপ করিতেন। অনেককে তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিতেন, কিন্তু সে কথা প্রকাশ হইলে বিরক্ত হইতেন।

শ্যামানাথ।

বিপ্রেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শ্যামানাথের জন্ম ১২৯১ সালের কার্ত্তিক মাসে। তিনি কলিকাতার 'দি ভল্‌কান্ আয়রণ ওয়ার্কস" নামক কোম্পানীতে কার্য্য শিক্ষা করিয়া মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন এবং "ভালকান্ আয়রণ ওয়ার্কসের" সকল বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও কিছু পারদর্শিতাও আছে। ট্রিনিটি কলেজের লণ্ডন ইউনিভার্সিটির যন্ত্র-সঙ্গীতের কলিকাতায় যে পরীক্ষা হয়, তিনি তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায়

যখন তিনি ডফ্‌টন কলেজের স্কুল বিভাগের ছাত্র হন তখন তিনি ভারতীয় ভলান্টিয়ার দলভুক্ত হইয়া আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার আয়ত্ত করেন। উদ্যান রচনায় ও পক্ষীপালনে তিনি বিশেষ অনুরাগী। তাঁহার সামাজিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে অনেকের নিকট সুপরিচিত এবং বন্ধুবান্ধববর্গের নিকট আদৃত করিয়াছে।

১৩০৭ সালে তিনি যশোহর চেঙ্গুটিয়া নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ বিবাহে তাঁহার দুইটি কন্যা ও দুইটি পুত্র হয়। তন্মধ্যে একটি পুত্র নিভানাথ ও একটি কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। শ্যামানাথের কন্যার সহিত মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্র বংশীয় পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। শ্যামানাথের পুত্রটি শিশু। সন ১৩২৮ সালে শ্যামানাথের পত্নী বিয়োগ হয়। শ্যামানাথ সম্প্রতি দ্বিতীয় পক্ষে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রোত্রীয় আন্দুল মহিয়াড়ী গ্রামনিবাসী অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন। এ বিবাহে তাঁহার এখনও কোন সন্তানাদি হয় নাই।

গোকুলনাথ।

মদনমোহনের দ্বিতীয় পুত্র গোকুলনাথ সন ১২৪৩ সালে ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার লালন পালনের ভার তাঁহার পিতামহীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদন দাস নামক এক ভৃত্যের উপর অর্পিত হয়। গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বাংলা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইং ১৮৪২ সালে গোকুলনাথ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ইং ১৮৫৩ সালে তিনি জুনিয়ার ফার্ষ্ট ক্লাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, আইন ব্যবসা শিখিবার জন্য তিনি এটর্ণি হজ ভিনো এণ্ড নিউ

মার্চ্চ সাহেবদের আফিসে শিক্ষানবিশ হন। ইং ১৮৭০ সালে এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোকুল নাথ হাইকোর্টে এটর্ণির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি এটর্ণি ওয়াটকিনস্ সাহেবের আপিসে পাঁচ শত টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছু দিন চাকুরী করিবার পর তিনি অংশীদাররূপে গৃহীত হওয়ায় উক্ত আপিসের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "ওয়াটকিন্স্ ষ্টোকো, ট্রটম্যান্ এণ্ড চ্যাটার্জ্জি" নাম রাখা হয়। কয়েক বৎসর পরে যখন প্রধান অংশীদার ওয়াটকিন্স্ সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিলাত চলিয়া যান, তখন তাঁহার পুত্রকে অংশীদার লইয়া উক্ত আপিসের নাম পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন হইল। তখন ষ্টোকো সাহেবও এটর্ণিগিরি ছাড়িয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত চলিয়া যান এবং ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া উত্তরকালে হাইকোর্টে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-পত্তি লাভ করেন। তখন আপিসের নূতন নাম হইল "ট্রটম্যান্, চ্যাটার্জ্জি, এণ্ড ওয়াটকিনস্।" ইং ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে গোকুলনাথ ওকালতি ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অবসর লইলেন। তিনি কয়েকবৎসর ওকালতি করিয়া প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বাকি জীবন সঙ্গীত ও শাস্ত্র চর্চ্চায় এবং আনন্দানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

গোকুলনাথ গৌরাঙ্গ, প্রসন্নবদন, সদানন্দময়, মধ্যমপুষ্টাঙ্গ ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। অমায়িক ব্যবহারে তিনি কি আত্মীয় কি মক্কেল সম্প্রদায় সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে একই পরিবার-ভুক্ত দুই ভ্রাতার প্রকৃতি কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল দীনেন্দ্রনাথ ও গোকুলনাথ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে শিক্ষা দীনেন্দ্র-নাথ:ক জ্ঞানের রাজ্যে আকৃষ্ট করিয়া জন সাধারণের দিকে বিমুখ করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল সেই শিক্ষাই গোকুলনাথকে প্রেমের রাজ্যে টানিয়া লইয়া জনসাধারণের মধ্যে পৌছাইয়া দিয়াছিল। জন-

৺গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণের সহিত কাঁধ মিলাইয়া তাহাদের সুখে দুঃখে আনন্দ ও ব্যথা অনুভব করিবার জন্য গোকুলনাথকে ব্যগ্র করিয়া তুলিত। প্রতিবেশীদের বন্দোৎসব ও নগর কীর্ত্তনের শোভাযাত্রায় যোগ দান করিয়া গোকুল নাথ আনন্দলাভ করিতেন। বঙ্গদেশে যে সকল সাময়িক মেলা হইত তাহাতে গোকুলনাথ আমোদ করিতে যাইতেন। তিনি লোকজনের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতির ও কোমল হৃদয়ের সংস্রবে যে কেহ আসিত সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। হাইকোর্টের উকিল ৺নীলমাধব বসু, এটর্ণি ৺কালীনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার ষ্টোকো সাহেব, হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার বেল চেম্বার সাহেব, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺ কেদার নাথ দত্ত এবং কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ৺ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ যখনই তাঁহার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। জ্যেষ্ঠের সহিত গোকুলনাথের প্রকৃতির ও রুচির যথেষ্ট বৈপরীত্য সত্বেও তিনি চিরদিন জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন। তিনি স্বতঃপরতঃ ভ্রাতুষ্পুত্রদের কল্যাণার্থে আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। গোকুলনাথের আতিথেয়তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বহস্তে রন্ধন ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া লোককে খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। গোকুলনাথ একজন সৌখীন লোক ছিলেন। ওকালতি হইতে অবসর লইবার পরে গোকুল নাথ বৈকালে আতর মাখাইয়া রেশমের লকে মাঞ্জা দিয়া ঘুড়ি উড়াইতেন। তখন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বাটীর ছাদেও পূর্ণ বয়স্ক লোকেরা ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ করিতে ইতঃস্তত করিতেন না। তখনও বাঙ্গালীর প্রাণের আনন্দধারা শুকাইয়া যায় নাই। শ্যামা, পাপিয়া, দোয়েল প্রভৃতি সুকণ্ঠ পক্ষীকুল ও তাহাদের জন্য নানাবিধ রংয়ের খাঁচা ও ঢাকা প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করা তাঁহার আর একটী সখ ছিল। মধ্যে মধ্যে লড়াইয়ের জন্য তিতির ও বুলবুল্ রাখা হইত। সেকালের আমোদের একটা উদাহরণ দিবার জন্য এগুলির উল্লেখ করা হইল। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া

গোকুলনাথ ওস্তাদের সাহায্যে রীতিমত সেতার চর্চ্চা করিতেন। তিনি এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটীর সদস্য ছিলেন ও নানা জাতীয় বিলাতি পাতা ও ফুলের গাছে তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন। দেশীয় ফুলের গাছও তাহার সঙ্গে থাকিত। কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার পরে গোকুলনাথ ডাইক্ কোম্পানীর দ্বারায় একখানি পাল্কি প্রস্তুত করান এবং কলিকাতার কোনও স্থানে যাইবার প্রয়োজন হইলে তাহাই ব্যবহার করিতেন। গোকুলনাথ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের বাটীর বিবাহে কন্যাকে আনিতে এই পাল্কির ব্যবহার করিতে আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেন। সন্ধ্যা, বন্দনা, পূজা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গের প্রতি তিনি চিরদিন অনুরাগী ছিলেন। যখন ওয়াটকিনস সাহেবের আপিসে চাকরী করিতেন তখনও এই কারণে আপিস যাইতে বিলম্ব হইত। ওয়াটকিনস্ সাহেব তাহা জানিতেন এবং অন্য কেহ আপিসে বিলম্বে আসিলে তাহাকে বলিতেন যে গোকুলনাথের পূজাদি আছে তোমার তাহা নাই, সুতরাং তোমার বিলম্বের কোন মার্জ্জনা নাই। গোকুলনাথ উত্তর ভারতের নানাতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং যে সকল স্থানে রেলপথ তখনও হয় নাই সে সকল স্থানেও নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াও যাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ইহাই তাঁহার আন্তরিকতার পরিচায়ক। শেষ বয়সে তাঁহার অধিকাংশ সময় পূজায়, জপে ও শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পাঠে ও আলোচনায় যাপিত হইত।

সন ১২৫৫ সালে যশোহর নিবাসী বাৎস্য গোত্রীয় শ্রোত্রীয় দয়ালচাঁদ মজুমদারের কন্যাকে গোকুলনাথ বিবাহ করেন। ১২৬৯ সালে তিনটি কন্যা ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া গোকুলনাথের পত্নী অকালে পরলোক করেন; গোকুলনাথ আর বিবাহ করেন নাই। কন্যাদের মধ্যে দুইটী অবিবাহিতাবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হয়। গোকুলনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গঙ্গাহবেলী দেশের গাঙ্গুলী রামকৃষ্ণের সন্তান কালিদাস গঙ্গো-

৺প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়

পাধ্যায়ের পুত্র এবং গোপাল লাল ঠাকুরের দৌহিত্র নীলেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত কন্যা এক বৎসরের মধ্যে বিধবা হয় এবং পিতার নিকট আসিয়া বাস করেন। সন ১৩০৩ সালে পৌষমাসে গোকুলনাথ উক্ত বিধবা কন্যা ও একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথকে রাখিয়া হৃদ্রোগে পরলোক গমন করেন।

প্রিয়নাথ।

গোকুলনাথের একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ সন ১২৬৭ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাঁহাদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ২।৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত এবং জ্যেষ্ঠতাত পত্নী তাঁহাকে লালন পালন করেন। এই সময় হইতেই উপরোক্ত মধুসূদন দাস তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। বাটীতে একজন পণ্ডিতের নিকট বাঙ্গালা শিক্ষা এবং হিন্দু কলেজে তাঁহার ইংরাজি ও সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভগ্নস্বাস্থ্য ইহার মুখ্যতম কারণ। তিনি হিন্দুস্কুল ত্যাগ করিয়া সেণ্টজেভিয়ার কলেজের কমার্শ্যাল ক্লাসে প্রবেশ করেন। সেখানে হিসাবাদি পরিরক্ষণ ও অপিস সংক্রান্ত পত্র ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করেন। হিসাবের নিপুণতা তিনি এইখানে আয়ত্ব করেন। এখানে দুই বৎসরে শিক্ষা সমাপন করিয়া গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগের খাল সংক্রান্ত কার্য্যে হিসাবরক্ষকরূপে নিযুক্ত হন এবং এই কাজেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

প্রিয়নাথ পিতা গোকুলনাথের মত মধ্যম পুষ্টাঙ্গ ও খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। তাঁহার বর্ণ পীতাভ গৌর ছিল এবং দেখিতে তিনি সুপুরুষ ছিলেন। কবিতা, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার পরিবারস্থ কেহ কেহ মনে করিতেন যে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই

অত্যধিক অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অকৃতকার্য্যতার অন্যতম কারণ। যাহা হউক এই অত্যধিক অনুরাগের ফলে তাঁহার সময়ে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগের অধিকাংশ পুস্তকই তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার একটি নাতিবৃহৎ পুস্তকালয় সংগঠিত হয়। এই পুস্তকগুলি যাহাতে তাঁহার দেহান্তে নষ্ট না হয় এই মানসে এইগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দান করিবার জন্য পুত্রকে মৌখিক আদেশ করেন। পিতৃবৎসল পুত্রও চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সময়ে এই পুস্তক-গুলি উপহার দিয়া পিতার এই সাধু ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন।

প্রিয়নাথ স্বল্পভাষী ও অল্পে অভিমানী ছিলেন। মানসিক উত্তেজনায় মৌনব্রত অবলম্বন করিতেন এবং নির্ব্বাক থাকিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাঁহার মধুর ব্যবহারে ও স্বভাবের ঔদার্য্যে তিনি আত্মীয় বর্গের ও বন্ধুবর্গের সকলের নিকট বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। প্রিয়নাথ চিরদিন জ্যেষ্ঠতাতের প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ-তাতের পুত্রদের সহিত প্রিয়নাথের ব্যবহারে কোনওদিন মনে হইত না যে তাঁহারা চারি ভাই সহোদর ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্কন্যাগণ প্রিয়নাথের নিকট সন্তানাধিক আদর ও স্নেহ পাইতেন। ইহাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে পরস্পরের অন্তরের যে স্নেহভালবাসার যোগ ছিল তাহা কোনওদিন বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

সন ১২৮৩ সালে প্রিয়নাথ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা পৌত্রীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা লাভ হইয়াছিল। কন্যার সহিত মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রপুত্র রাজা-বাগানের স্বনামপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর প্রিয়নাথ অমরনাথকে আমেরিকায়
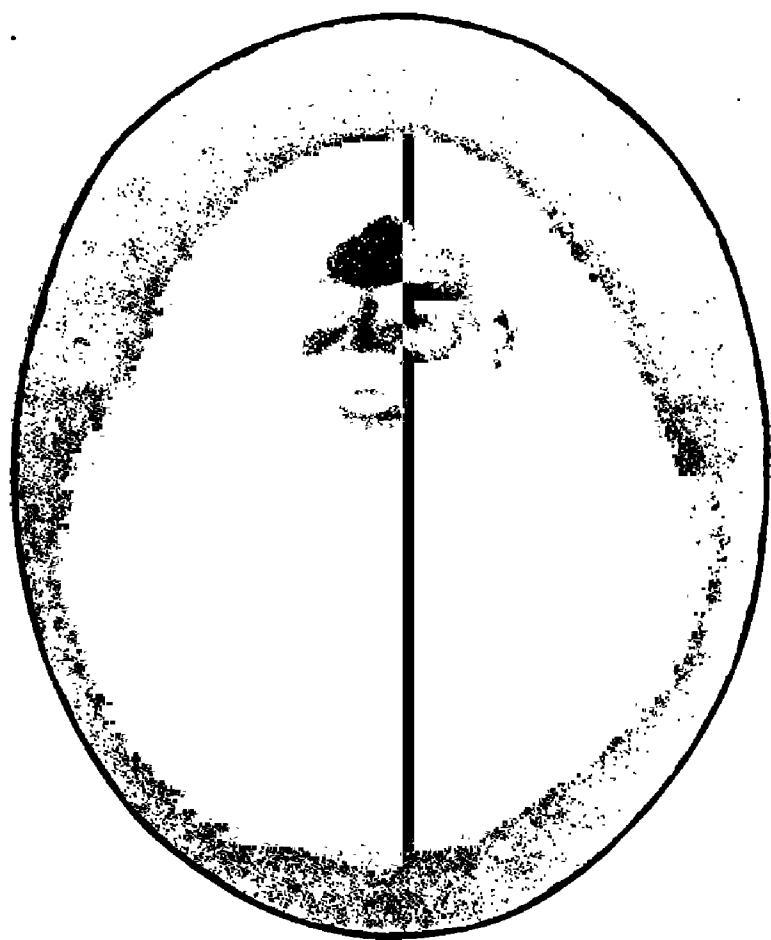
শ্রীযুক্ত প্রভানাথ চট্টোপাধ্যায়

যুক্তরাজ্যের ফিলাডেলফিয়া কলেজে কয়েক বৎসর পড়াইয়া গ্রাজুয়েট করিয়া আনেন। অমরনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়নাথের নিকট থাকিয়া ডাক্তারী ব্যবসা করেন এবং তাহাতে উন্নতি করিয়া প্রিয়নাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে রাজাবাগানে স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাটী খরিদ করিয়া তথায় বাস করিতে চলিয়া যান। অমরনাথের কন্যার ও প্রিয়নাথের একমাত্র দৌহিত্রীর সহিত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছে।

প্রিয়নাথ শেষজীবনে কয়েক বৎসর হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যের জন্য কাশীতে ও পুরীতে কিছুদিন বাস করেন। এই রোগেই ১৩১৩ সালে পৌষ মাসে উপরোক্ত কন্যাকে ও একমাত্র পুত্র প্রভাতনাথকে রাখিয়া তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন। প্রিয়নাথের মৃত্যুর পরে তাঁহার বিধবা পত্নী সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি কখনও পুরী, কখনও কাশী, কখনও হরিদ্বারে অবস্থান করেন এবং এই সকল স্থানে তিনি "বাঙ্গালী সাধুমা" বলিয়া সুপরিচিতা।

প্রভাতনাথ।

প্রিয়নাথের একমাত্র পুত্র প্রভাতনাথ। সন ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার জন্ম। ডভটন্ কলেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয় এবং ইংরাজি ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রে বিরাগবশতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি টাইপ রাইটারি শিক্ষা করিয়া প্রথমে হাইকোর্টের আপিসে প্রবেশ করেন। পরে ভারত গভর্ণমেণ্টের ইম্পিরিয়াল রেকর্ডে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তিনি ইহা ত্যাগ করেন। প্রভাতনাথ এখন কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির সহকারী সম্পাদক এবং তাঁহার সৌজন্যে ও

বিনয়নম্র ব্যবহারে তিনি অনেকের সুপরিচিত ও সর্ব্বজন প্রিয় কর্ম্মাধ্যক্ষ। অভিনয় কলায় তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব বিকাশ দেখা গিয়াছে। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বৈকুণ্ঠের খাতায় বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় প্রভাতনাথের অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব একদিকে প্রবীণ অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফিকে ও ও অমৃতলাল বসুকে এবং অন্যদিকে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ললিত চন্দ্র মিত্র প্রমুখ রসজ্ঞ গুণগ্রাহী ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

সন ১৩০৮ সালে গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রভাত নাথের বিবাহ হয়। তাঁহার তিন কন্যা ও পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে একটি পুত্র কৈশোরে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত চন্দননগরনিবাসী বাৎস্য গোত্রীয় শ্রোত্রিয় সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের বিবাহ হইয়াছে। এই সিদ্ধেশ্বর গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে ফরাসী গোলন্দাজ সৈন্যদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং "ব্রিগেডিয়ার" পদলাভ করেন। প্রভাতনাথের পুত্রদিগের পঠদ্দশা। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র প্রীতিনাথ ও মনোজনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর কলেজে আই, এ, অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণ গরিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার অন্তর্ব্বর্ত্তী দক্ষিণ গরিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি বংশ। স্বর্গীয় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ গরিয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র রামকিশোর ও রামকিশোরের পুত্র গৌরীকান্ত। গৌরীকান্তের দুই পুত্র:—রঘুনাথ ও রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। রামরতন বাবু অধ্যবসায়ী, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ছিলেন এবং ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, এই কারণে তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তৎসমস্তই দান করিয়া নিঃশেষ করিয়াছিলেন। রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত কোদালিয়া চিংড়িপোতার মধ্য দিয়া "রামরতন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামে যে পাচ মাইল রাস্তা গরিয়া হইতে রাজপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তিনি সেই রাস্তা ২০।২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই অঞ্চলের যাঁহারা কলিকাতায় গমনাগমন করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই রাস্তা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে। দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দান ও প্রতিবেশিগণকে অভাবের সময় সাহায্য করিয়া তিনি বিশেস আনন্দ পাইতেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্ন দান করিয়া হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করিতেন। আজও পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণার লোকে তাঁহার নাম অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। এইরূপ অকাতর দান করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা দুইজনেও পিতার ন্যায় অতি দানশীল ও

পরদুঃখকাতর ছিলেন। ইঁহারা দুই ভ্রাতা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির কিছু উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাড়ীতে রথযাত্রা, দুর্গা পূজা ও দোলযাত্রা প্রভৃতি বিশেষ সমারোহে সম্পাদন করিতেন। এই উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, তাঁহাদের বাড়ীতে ভূরি ভোজন করিতেন। তাঁহারা এই উপলক্ষে দরিদ্রদিগকেও ভোজন করাইতেন এবং যাত্রা ও নাচ গান দিয়া প্রতিবেশিগণকে আনন্দিত করিতেন। আজও পর্য্যন্ত এই উৎসবে সেই কৌলিক প্রথা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইঁহারা দুই ভ্রাতা নূতন নূতন কয়েকটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং জেলার ড্রেন সমূহের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বাঁসড়া নামক স্থানে তাঁহারা ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুন্দর পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীটি খনিত হওয়ায় সুন্দরবনগামী নৌকার দাঁড়ী মাঝিদের বিশুদ্ধ জল লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা গরিয়ায় একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জন্য আজিও তাঁহাদের নাম চব্বিশ পরগণাবাসী অতি শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তন করিয়া থাকে। স্বর্গীয় লাল মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সময়ে চব্বিশ পরগণার মধ্যে একজন গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন এবং জন সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করিত। জমিদারীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মামলা মোকদ্দমার সময়ে মধ্যস্থতা করিয়া তিনি প্রজা ও প্রতিবেশিগণকে অযথা অর্থব্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। বাঁসড়ায় তাঁহার যে উদ্যানটি ছিল তাহা সাধারণের পক্ষে একটি দ্রষ্টব্য উদ্যান ছিল। এই উদ্যানে যে সমস্ত সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হইত তাহা তিনি তাঁহার প্রজা ও প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। তিনি তারক নাথ, যদুনাথ ও দ্বিজেন্দ্র নাথ নামে তিন পুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা রাধানাথের কেবলমাত্র দুইটী কন্যা ছিল; তিনি কনিষ্ঠ

ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যথাবিধি যাগ যজ্ঞ করিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালীন উইলের দ্বারায় কন্যাগণের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত সম্পত্তি উক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়া যান। তাঁহারা গরিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় গরিয়া গ্রাম আজ চব্বিশ-পরগণার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্যে প্রশস্ত রাস্তা, পরিষ্কার পুষ্করিণী এবং ভাল পয়ঃপ্রণালী গরিয়ায় স্থাপিত হইয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ ২৪পরগণায় শস্যাদি ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই। এই দুঃসময়ে ইহারা কয়েক ভাই অকাতরে অন্নদান করিয়া আসন্ন অনশন হইতে বহু লোককে রক্ষা করেন। এক্ষণে উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছয়টী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রমথ বাবুর বিবাহ কাশিপুরের ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রবাবু অতি উচ্চ অন্তঃকরণের আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "শক্তিবিকাশ" বলিয়া একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ প্রকৃতির হইয়াছেন, ইহারা একনিষ্ঠ হিন্দু এবং জনহিতকর কার্য্যে পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃষি বিষয়ক কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী এবং কৃষি সমিতির একজন সভ্য। এই কৃষি সমিতি প্রেসিডেন্সি বিভাগীয় এবং গভর্ণমেণ্ট ইহাকে সভ্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি নানাবিধ চাল, আলু, ইক্ষু উৎপন্ন করিয়াছেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতায় যে কৃষি প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে এক শত প্রকারের সুগন্ধি তণ্ডুল প্রেরণ করেন। এই চাউলের সকলে সুখ্যাতি করিয়াছিল। ১৯০৭ সালে যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় গরিয়া ইউনিয়নের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি নিজব্যয়ে নূতন একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই রাস্তাটি অসংখ্য দাতব্য অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার চেষ্টায় ই, বি, রেলওয়ের পিয়ালি ষ্টেশন, কালিকাপুর ষ্টেশন, কালিকাপুর হইতে গরিয়া পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, সাউথ গরিয়া ডাকঘর, চাপাহাটী বাজার, গরিয়া বম্পাস এইচ, ই, ইন্‌ষ্টিটিউসন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ একবাক্যে তাঁহার কাজের প্রশংসা করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বম্পাসও তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ গরিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুলটীকে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। তারকনাথ বাবু সাহিত্যিক, কবিতার প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি আছে। "সাধক মিলন" নামে তিনি একখানি নাটক লিখিয়াছেন, সেই নাটকখানিকে সকল লোকেই একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন। যদুনাথবাবু "রাঘব বিজয়" ও "গোবর্দ্ধন মিলন" প্রভৃতি বহু নাটক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে উপরোক্ত দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ অপেরা গায়ক যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত হইয়াছিল। ভট্টপল্লীর পণ্ডিত সমাজ এই নাটক দুইখানির অভিনয় দেখিয়া তাঁহাকে "কবিরত্ন" উপাধি দিয়াছেন। যদুবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে 'যদুনাথ কবিরত্ন" নামে প্রসিদ্ধ। "শেষ" নামে যদুনাথবাবুর একখানি কবিতা পুস্তক আছে। কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্র এই পুস্তকখানির প্রশংসা করিয়াছেন।

তারকনাথ বাবুর এ‥ .টী পুত্র কন্যা। তন্মধ্যে ছয়টি পুত্র ও পাঁচটী কন্যা। তাঁহার পুত্রগণের নাম—দুর্গাচরণ, মোহিনী মোহন, নীরদবরণ, গিরিজা ভূষণ, হৃষিকেশ, অন্যটি শিশু। মোহিনীমোহন উত্তরপাড়ার জমিদার স্বর্গীয় শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী ইলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। যদুনাথ বাবুর একপুত্র—নাম পুলিন বিহারী। পুলিন বিহারী উত্তর পাড়ার জমিদার

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জহরলাল মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সত্যবিভাকে বিবাহ করেন। তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র। যদুবাবুর পাঁচটী কন্যা। ইহারা সকলেই অল্পবয়স্কা। জ্যেষ্ঠা কন্যা উষাঙ্গিনীর সহিত ভাটোরা নিবাসী শ্রীযুত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা সুহাসিনীর সহিত উলা নিবাসী শ্রীমন্ বাবুর পুত্র নৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ দিয়াছেন। তৃতীয়া কন্যা অমিয়বালা দেবীর সহিত জয় মিত্রের ষ্ট্রীট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। ১২৭৬ সালের কার্ত্তিক মাসে কোজাগর লক্ষ্মী পূজার দিন যদু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। যদুবাবুর ভ্রাতা তারক বাবু শোভাবাজারের কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। যদুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামবাগান নিবাসী পার্ব্বতী চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

যদুবাবু অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও সাহিত্য সভার একজন সভ্য ছিলেন। যদুনাথ বাবু আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া তিনি জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। তিনি ধনাঢ্য জমিদার এবং ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইলেও বিংশশতাব্দীর আধুনিক সভ্যতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্ত্তায় তিনি সর্ব্বতোভাবে আদর্শ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি অনেক সভাসমিতিতে তাঁহার স্বরচিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন। ১৩৩১ সালের ৭ই বৈশাখ তিনি ভট্টপল্লী ব্রাহ্মণ সম্মিলনে নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী সুন্দর স্বরচিত কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিজের গরিমা-রাশি কোথায় এখন ?
যে দ্বিজের পদভার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষহার
পরিচয় প্রতিভার বেদ নিদর্শন।

গুপ্ত তত্ত্ব বেদ বক্ষে সযতনে করি রক্ষে
ব্রহ্মার সে চতুর্ম্মুখে যাহার কীর্ত্তন ?
কোথা সে কপিলমুনি ব্রাহ্মণের শিরোমণি
যার শাপে সগরের বংশ নিঃশেষণ ?
যজ্ঞ বিঘ্ন ভাবি মনে জহ্নুর সে আক্রমণে
অদম্য প্রবলা-গতি গঙ্গার শোষণ।
বিশ্বামিত্র ব্যবহার অবিদিত নহে কার
বশিষ্ঠের ক্রোধ-বহ্নি দীপ্ত হুতাশন ?
ব্যাসের উত্তমরাশি সৃজি পুনঃ নব কাশী
করিব মুক্তির পথ সঙ্কল্প সাধন।
রাবণের মনোরথ স্বর্গের করিব পথ
লঙ্কায় করিল শিব শিবাণী মিলন।
কোথা সেই ব্রহ্ম-শাপ পরীক্ষিতের পরিতাপ
কোথা বা জন্মেজয়-যজ্ঞ আয়োজন ?
কোথা বা সে যজ্ঞস্থল কোথা সে হোতার দল
কোথা বা সে সর্প যজ্ঞ সর্প বিনাশন ?
কোথা সে সুরথ রাজা কোথা সে বাসন্তী পূজা
কোথা মা সে দশভূজা অভীষ্ট সাধন ?
কোথা সে ব্রাহ্মণ যাঁরা করিল পূজন ?
কোথা সে পরশুধারী অধর্ম্ম সহিতে নারি
নিঃক্ষত্র করিতে অস্ত্র করিল ধারণ ?
কোথা সে জনক ঋষি অতুল বৈভব রাশি
অগ্নিশিখা দগ্ধ দেখে সহাস্য বদন
সংযমী প্রধান যেই ছিল আজীবন ?

দক্ষিণ গড়িয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আবাস বাটী
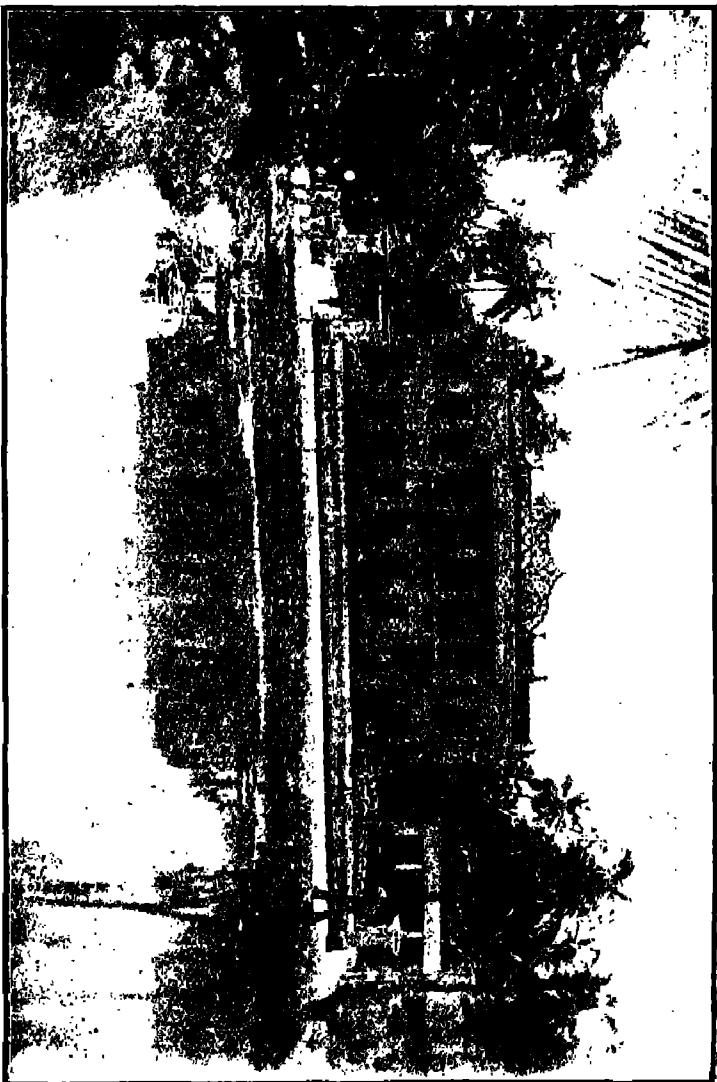
কোথা বা সে যোগ শিক্ষা কোথা ফলপ্রদ দীক্ষা
কোথা বা সে যজ্ঞগুরু মন্ত্র জাগরণ ?
কোথা সেই দ্বিজ ঋদ্ধি তন্ত্র মন্ত্র ভূত শুদ্ধি
কোথা সে অতুল সিদ্ধি ইষ্ট সন্দর্শন ?
কোথা সেই মহা প্রাণ দধীচির অস্থি দান
অসামান্য স্বার্থত্যাগ বিদিত ভুবন ?
কোথা সেই ত্বষ্টা মুনি ইন্দ্রের বধার্থে যিনি
যজ্ঞকুণ্ডে করিলেন বৃত্র উদ্ভাবন ?
কোথা বা সে বলিদান কোথা বা সে প্রাণদান
কোথা বা সে অভিমান আত্মনিবেদন ?
কোথা সেই পবিত্রতা কোথা সেই দয়ার্দ্রতা
কোথা বা সে নির্লোভতা আত্ম-সংযমন ?
অনিলাম্বু ভক্ষি আর কোন্ দ্বিজ তপস্যার
করে এবে ধরা প'রে আসন রচন ?
কলির এ অভ্যুদয় তাই এ পতন !
দ্বিজের সম্পদ যাহা লুপ্ত নাহি হবে তাহা
পুনঃ সেই তেজরশ্মি হইবে স্ফুরণ
তামসিক লীলাচয় কতক্ষণ বল রয়
অসুরের সুধা লাভ যেমন স্বপন।
বাজিবে ধর্ম্মের ঢাক মাঝে মাঝে ফেরু ডাক
শুনিয়া চঞ্চল কভু হ'য়োনা অমন
ও ধ্বনি আশ্বাস বাক্য কাল নিরূপন !
সুখ-দুঃখ সমভাব যাহাদের শিক্ষালাভ
তারা কেন হয় পুনঃ আত্ম বিস্মরণ
সৃষ্টির রহস্য কথা যাহাদের হৃদে গাথা
তারা কেন হ'বে বৃথা চঞ্চল এমন ?

উপাধি ব্যাধিতে আর হ'বে কেন আশা তার
কি করিতে পারে তারে মিথ্যা প্রলোভন ?
বশিষ্ঠ শ্রীরাম গুরু দয়াদানে কল্পতরু
তাঁর ত ছিল না কভু হর্ম্ম্যনিকেতন !
ভোগবিধি অতি দৈন্য উপবাস হবিষ্যান্ন
ফলমূলে তুষ্ট যারা রবে অনুক্ষণ
তারা কেন ভোগ রাশি করে অন্বেষণ ?
দ্বিজ সংখ্যা হয় হ্রাস— কেন বৃথা হেন ত্রাস ?
কনক সুলভ নয় লোহের মতন
লৌহ শক্ত অতিশয় সদা মলিনতাময়
চৌর্য্য কার্য্যে সদা তাহা শ্রেষ্ঠ প্রহরণ।
লৌহেতে বিশ্বভরা চাপে কাঁপে বসুন্ধরা
তা ব'লে কি স্বর্ণ লবে লৌহ আবরণ ?
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য করিবে তাঁদের কার্য্য
ততদিন স্বর্ণ শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিমোহন
দ্বিজের সম্পদ তথা দেব আকিঞ্চন।
দ্বিজের সম্পদ রাশি বেদবাক্য অবিনাশী
লুপ্ত নয়, গুপ্ত এবে কলি প্রহসন
হবে সব একাকার দ্বিজধর্ম্মে ব্যাভিচার
ঘটিবে কালের ধর্ম্ম না হ'বে খণ্ডন
পুনঃ সত্য ব্রাহ্মণের হ'বে জাগরণ
পূর্ব্বস্থলী ভাট পাড়া বাল্য হ'তে শিক্ষা পড়া
ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণের আবাস ভবন
সেখানেও কলি মূর্ত্তি করি সন্দর্শন।

দক্ষি ড়িয় বন্দ্যোপাধ্যায় শের বালক বালিকাগ

গেছে সে গরিমা সব মৃতপ্রায় যেন শব
কলি প্রহসন সবে করিছে ক্রীড়ন!
একনিষ্ঠ সদাচার, দ্বিজগণ প্রতিভার
এখনো বিশিষ্ট আছে যথা পঞ্চানন।
রাজবন্দী হ'য়ে বটে, কু-আচার পাছে ঘটে
করিলেন দৃঢ় কল্প ব্রত অনশন!
মরণ নিশ্চিত কিংবা সঙ্কল্প সাধন।

২৪ পরগণা দক্ষিণ গরিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ।

মকরন্দ—(শ্রেষ্ঠ কুলিন)

দাশরথী বিনায়ক (নপড়া)

হরি

ঈশান

লক্ষ্মণ

হরি

বশিষ্ঠ

সর্ব্বানন্দ

বলভদ্র

গুণানন্দ

নারায়ণ

রাম রাম বন্দ্যোপাধ্যায়

রামদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রামরতন
রঘুনাথ
পিতাম্বর
গঙ্গাধর
রাজারাম
ঠাকুরদাস
পূর্ণচন্দ্র
রাসবিহারী
অবিনাশ
দুর্গাময়ী
ভবসুন্দরী
রাধানাথ
লালমোহন
তারাপদ
বিধু
(কন্যা)
তারকনাথ
বিনদকালী
যদুনাথ
৺দ্বিজেন্দ্রনাথ
রাধানাথ
(দত্তকপুত্র লয়েন)
জিতেন্দ্রনাথ
দুর্গাদাস
মোহিনীমোহন
নিরদবরণ
গিরিজা
হৃষিকেশ
প্রমদা
নগেনবালা
শুভঙ্করী
করুণাময়ী
শান্তিময়ী
পান্নালাল
কমল
পুত্র
পুত্র
হিমাংশু
সুধাংশু
বিদ্যাপতি
খান্দু
বিলু
উষাঙ্গিণী
সুহাসিনী
পুলিনবিহারী
অমিয়বালা
মণিবালা
পুলিনা
শান্তি
কান্তি
শিখরবাশিনী
প্রভাবতী
প্রমথনাথ
কিরণময়ী
অসিতাবালা
ছোট কন্যা
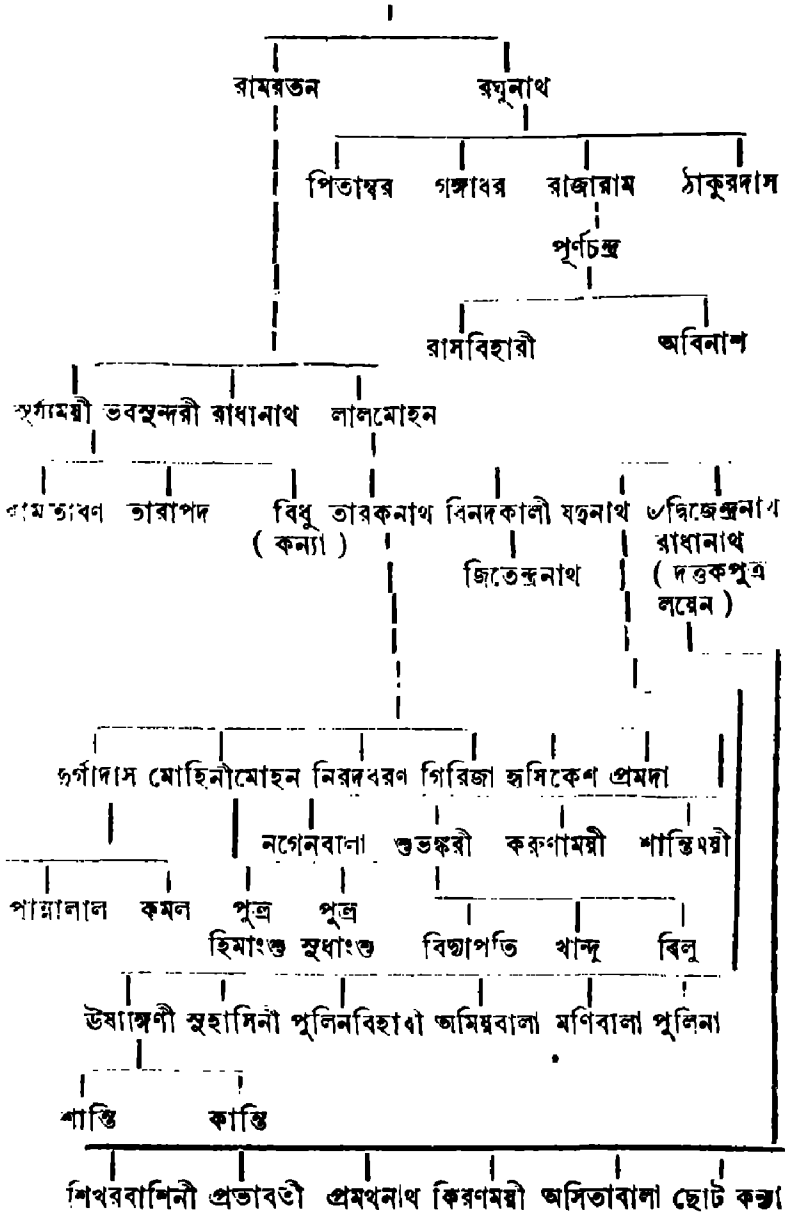
স্বর্গীয় বিধুভূষণ মিত্রের বংশ।

গুয়াওলীর মিত্র বংশ দান ধ্যান বদান্যতা ও গুরুজনে ভক্তির জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের ৺রজনীকান্ত ও ৺বিধুভূষণ আপন সহোদর ভাই ছিলেন। কোন সময়ে উঁহাদের পিতা নদীয়া জেলার ইনাতপুর গ্রামে আসিয়া বসতি করেন, তবে জ্যেষ্ঠ রজনী বাবু অধিক সময়ই দেশে থাকিতেন এবং জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন। নানারূপ দুর্ঘটনার দরুণ কনিষ্ঠ বিধুভূষণের ইংরাজী শিক্ষা বিশেষ কিছু হইয়া উঠে নাই। তাহাকে অল্প বয়সেই চাকরীর অনুসন্ধানে কলিকাতায় আসিতে হয়। অনেক চেষ্টায় তাঁহার একটী চাকরী জুটে। তিনি উত্তর সহরতলী কাশীপুরের তখনকার বিখ্যাত ধনী সওদাগর কম্প্ ব্রাদাসের অধীনে একটী সামান্য কর্ম্মে ব্রতী হন।

কার্য্যদক্ষতা, সত্যতা ও একনিষ্ঠতার এমনি গুণ যে তিনি অল্পদিন মধ্যে সামান্য কার্য্য হইতে উক্ত কোম্পানীর সকল বিষয়েই 'কনট্রাক্টারের পদ গ্রহণে সক্ষম হন। অচল-অটল উদ্যমে যথেষ্ট সুখ্যাতির সহিত 'কনট্রাক্টারের' কাজ করিতে করিতে যথেষ্ট অর্থ-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাদিকের ব্যবসা-বুদ্ধিতে তাঁহার বুদ্ধি খুলিয়া গেল। কমলা তাঁহার সততায় ও সৌজন্যে প্রসন্না হইয়া অনুগ্রহ বর্ষণে মুক্ত হস্ত হইয়া পড়িলেন। পরহিতৈষণা যেন তাঁহার স্বভাবের বিশিষ্টতা ছিল। সেই সময়ের প্রধান প্রধান 'জুট বেলা'রদের মধ্যে তিনি নিজ প্রতিভাবলে ও কার্য্য তৎপরতার গুণে একজন অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুনাম ব্যবসায় ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার কয়েকটী পাটের মার্কা বিলাত পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হয়। পূর্ণোদ্যমে তাঁহার ব্যবসায় চলিতে
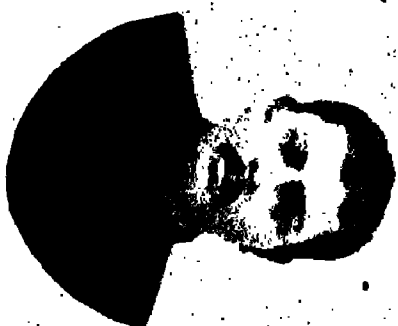
1. Rajanikanta Mitra. 2. Bidhubhuson Mitra. 3. Jotindranath Mitra.

থাকে। তাঁহার বিষয়বুদ্ধি ও নানামুখী প্রতিভা বিষয়-সম্পত্তির বৃদ্ধিতে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখে। তিনি এই সময়েই বোট ও ষ্টীম লঞ্চের বিস্তৃত ব্যবসায় চালাইতে থাকেন। বরাহনগরে তিনি একখানি বিস্তৃত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। নানা স্থানে অল্প বিস্তর জমীদারীও করিতে থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার বদান্যতা অসীম ছিল। যেমন আয় করিতেন, তেমনই ব্যয় করিতেন। কোন বিষয়ে কোন অংশেই দানে কার্পণ্য ছিল না। যে অর্থে আমরা 'সঞ্চয়ী' বলিয়া থাকি সে সাংসারিক গুণে তিনিতো একেবারেই অধিকারী ছিলেন না, বরঞ্চ অতিমাত্রায় দানে ও শেষকালে কার্য্যের বিশৃঙ্খলায় তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া অল্প বয়সেই প্রাণ ত্যাগ করেন। সকলের উপর বিশ্বাসই তাঁহার অর্থনাশের কারণ হইয়াছিল। জগতের নিয়মই একবার উঠিতে ও পড়িতে হয় ও ব্যবসার নিয়ম কখন রাজা ও কখন ভিক্ষুক। ব্যবসা করিতে গেলে যে সহিষ্ণুতা ও সততা থাকা দরকার, তাহা তাঁহার না থাকিলে এত অল্প দিনে ব্যবসা ক্ষেত্রে এমন সুনাম রাখিয়া যাইতে পারিবেন কেমন করিয়া? তাঁহার হৃদয়ের এমনি ঔদার্য্য ছিল যে কেহ প্রার্থী হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিফল মনোরথে ফিরিত না। নিজের হাজার ক্ষতি হইলেও তাঁহার দানের বিরাম ছিল না। যে কেহ কখন চাকরীর প্রার্থী হইয়া তাঁহার কাছে আসিত, যতদিন না চাকরী করিয়া দিতে পারিতেন, ততদিন তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিয়া খাওয়াইতেন। চাকরী হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে অবশেষে নিজ ব্যয়ে তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতেন।

নদীয়া জেলার ধোপড়াপলের জমিদারীতে তাঁহার সরস্বতী পূজা এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। যেরূপ সমারোহে কার্য্য সমাধা হয় তাহা এখনও সেখানকার লোকের মধ্যে প্রবাদের মত হইয়া আছে। কত স্থান হইতে কত লোকের যে সমাগম হইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। যেরূপ

পানভোজন ও দানছত্রের বহর খুলিয়া গিয়াছিল, তাহা সেই সময়কার লোকেদের মনে এখনও সজাগ আছে। যাহা হউক, জীবিতকালে স্বকৃত উপার্জ্জনে সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া যাইলেও, তাঁহার অন্তিমকাল বড় সুখে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। কাজের বিশৃঙ্খলতার জন্য তাঁহার অর্থহানি যথেষ্টই হইয়াছিল। তিনি কতকগুলি দেনা রাখিয়া যান। তিনি অপুত্রক ছিলেন। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করেন এবং নিজের কার্য্যকর্ম্ম শিখাইয়া অল্পবয়সেই তাহাকে মানুষ করিয়া কাজের উপযোগী করিয়া রাখিয়া যান।

সেই পুত্র ৺ যতীন্দ্রনাথ খুল্লতাত ও পালক-পিতার মৃত্যুকালে সবে মাত্র আঠার বৎসরের বালক ছিলেন। কিন্তু এই তরুণ বয়সেই তিনি সংসারের নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া দাঁড়াইয়া উঠেন। তাঁহার শিক্ষা ঐ অল্প বয়সে যতদূর সম্ভব তাহা হইয়াছিল। কার্য্যে দীক্ষা পূর্ব্ব হইতেই বিধুবাবুর কাছ হইতেই একরূপ হইয়া আসিয়াছিল। সম্পূর্ণতা তাঁহার নিজের প্রতিভাবলেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। এক কথায় তিনি স্বকৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন, কেন না তাঁহার একাগ্রতা ও সততা কাহারও অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার অসীম ছিল। বলিতে গেলে তিনি এক কথার মানুষ ছিলেন। কাহারও সহিত কখন তাঁহার কথার 'খেলাপ' করিতে দেখা যায় নাই। মিতব্যয়িতার সহিত দান-শৌণ্ডতা তাঁহাতে যথেষ্টই ছিল। তিনি তাঁহার খুল্লতাত ও পালক পিতার সকল দেনাই শোধ করেন। ভগবানের অনুগ্রহে ও মা-কমলার কৃপায় ভগবদ্ভক্ত যতীন্দ্রনাথ সকল বিষয়েই বেশ সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পান ও নানা দিকের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া বিশিষ্ট একজন লোক বলিয়া পরিচিত হন। ভাললোককে ভগবান বেশী দিন এ পৃথিবীতে রাখেন না,—আপনার নিজের কাছে ডাকিয়া লন। যতিন্দ্রনাথকেও বেশী দিন

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র

১। প্রফুল্লকুমার মিত্র　　　২। শৈলেন্দ্রকুমার মিত্র।

কাশীপুরের বসতবাটী।
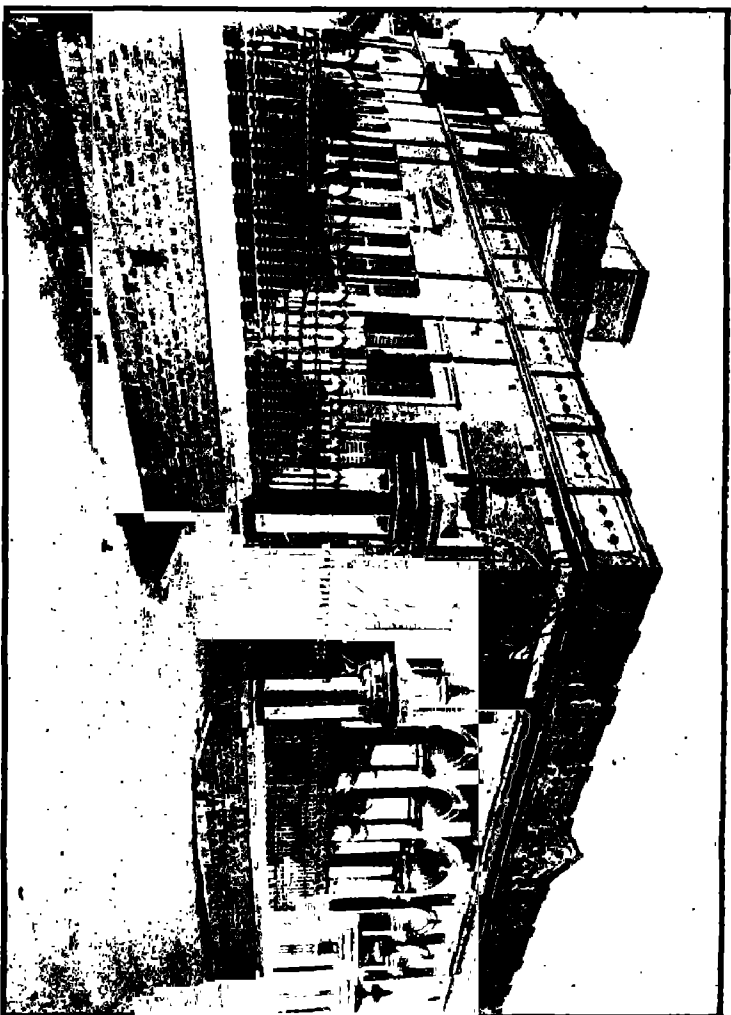
এ জগতের সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে দেন নাই ; অকালে তিনি কাল-গ্রাসে পতিত হন। ১৩১৫ সালের ১১ই পৌষ বৃহস্পতিবার তাঁহার দেহ-ত্যাগ হয়। তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া তিনি মৃত্যুমুখে হন। তিনি কলিকাতা শ্যামবাজার ৺ তুলসীরাম ঘোষের বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র মিত্র নূতন বন্দোবস্তের কলিকাতা কর্পোরেসনের ৩২ নং ওয়ার্ডের 'কমিশনার' হইয়াছেন। সকল সাধারণ কাজে যোগদান ও মুক্তহস্ততা তাঁহার এক বিশিষ্ট গুণ। কখন কোন প্রার্থী আসিয়া শূন্য হস্তে তাঁহার নিকট হইতে ফিরে না। তিনিও তাঁহার পিতার পদানুসরণে পিতার অনুসৃত কাজকর্ম্ম চালাইয়া আসিতেছেন এবং সকল সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া সকলের প্রিয় ও দেশহিতৈষী হইয়া সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি চাউলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার মিত্র কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন। কনিষ্ঠ শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র মোহন মিত্র এখন ৮।৯ বৎসরের শিশুমাত্র। ইনাতপুরে ইহাঁদের বাড়ী ও জমিদারী এখনও রহিয়াছে।

প্রবোধ বাবু জঙ্গলবান্ধা বাঘুটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশে ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রফুল্ল বাবুর বিবাহ নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺ পুলিনবিহারী রায়ের পৌত্রীর সহিত সম্পন্ন হয়।

বড়শুল জমিদার বংশের পরিচয়।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বড়শুল গ্রামের জমিদার বংশ বহু পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত বংশ। স্বর্গীয় গৌরপ্রসাদ দে মহাশয়ের সময় হইতে এই বংশের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। গৌরপ্রসাদ ও তাঁহার পিতা রামশরণ দে ও পিতামহ সুবলচন্দ্র দে নবাব সরকার হইতে "মণ্ডল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরপ্রসাদের চারি পুত্র:—জ্যেষ্ঠ গোলকনাথ, মধ্যম গোপীনাথ, তৃতীয় সনাতন ও কনিষ্ঠ ভবানীচরণ। তন্মধ্যে গোলক-নাথ ও সনাতন পশ্চিম অঞ্চলে পাটনা, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, মতিহারি প্রভৃতি জেলায় ব্যবসা দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গোলক-নাথ দে মহাশয় ও সনাতন দে মহাশয় দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত রোসড়া মোকামে থাকিয়া ব্যবসা করিতেন। তাঁহারা রোসড়ার যে গদীবাটীতে থাকিয়া ব্যবসা করিতেন সেই গদীবাটী এখনও "গোলকাই গদী" নামে খ্যাত। সনাতন দে মহাশয়ের হাতের মাপ ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপ অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল। রোসড়া সহরে তাঁহার হাতে মাপা গজ এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ গজ "সনাতনী গজ" নামে খ্যাত।

স্বর্গীয় গোলকনাথ দে মহাশয়ের দুই পুত্র। রামগোবিন্দ ও দুর্গাচরণ। দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয় পুত্রই তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোক প্রাপ্ত হন। রামগোবিন্দ দে মহাশয়ের পুত্র বৈদ্যনাথ দে মহাশয় এজমালী সংসারের ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি সন ১৩১৫ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বৈদ্যনাথ দের দুই পুত্র—সতীশচন্দ্র দে ও হরিহরনাথ দে। তন্মধ্যে সতীশচন্দ্র সন ১৩১৮ সালে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। দুর্গাচরণ দে মহাশয়ের দুই পুত্র—ব্রজনাথ ও রাধানাথ। ব্রজনাথ দে মহাশয়ের একটী মাত্র পুত্র ছিল,

পুত্রটী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাধানাথ দে মহাশয়ের পাঁচপুত্র। প্রভাসচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, ক্ষিতীশচন্দ্র, কৃষ্ণকিশোর, জ্যোতীশচন্দ্র, তন্মধ্যে শ্রীশচন্দ্র, কৃষ্ণকিশোর ও জ্যোতীশচন্দ্র এক্ষণে জীবিত আছেন।

স্বর্গীয় গোপীনাথ দে মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় রামধন দে মহাশয় একজন কৃতীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময়ে এই বংশের অনেকগুলি জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। শক্তিগড় রেলওয়ে ষ্টেসন তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তিনি ১২৬৩ সালে পরলোকগত হন। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হন। কনিষ্ঠ কন্যার সহিত দেবীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় চণ্ডীলাল সিংহের বিবাহ হয়। চণ্ডীলাল সিংহ মহাশয় কিছুকাল বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার্সের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং অনেক দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারও ছিলেন। রামধন দে মহাশয়ের একমাত্র পুত্র বলদেব দে অল্প বয়সে কালকবলে পতিত হইলে চণ্ডীলাল সিংহের পুত্রগণ তাঁহার ওয়ারিশ হন।

স্বর্গীয় সনাতন দে মহাশয় অনেক জমিদারী বাড়াইয়াছিলেন। তিনি দেব মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি "অতিথি সেবা" বা 'সদাব্রত" প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এখনও তাঁহার বংশধরগণ অক্ষুন্নভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথি সেবা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। গ্রামের "দিঘী" নামক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্করিণী যাহা এই বংশের গৌরব বিস্তার করিতেছে তাহা তাঁহারই কীর্ত্তি। উক্ত পুষ্করিণীর চারি পার্শ্ব নানাবিধ বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। এতদঞ্চলের মধ্যে এরূপ পুষ্করিণী আর নাই। তিনি সন ১২৬১ সালে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। কন্যার সহিত দেবীপুরের জমিদার স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বিবাহ হয়। উক্ত কন্যার এক্ষণে একটী মাত্র পুত্র জীবিত আছেন। তাঁহার

নাম শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল সিংহ। তিনি বৰ্দ্ধমান সদর বেঞ্চের একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভ্য ও লোকাল বোর্ডের সভ্য এবং ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। গত সন ১৩৩০ সালের ৩০ আষাঢ় তারিখে ৺কাশীধামে সনাতন দে মহাশয়ের কন্যার মৃত্যু হয়।

স্বর্গীয় সনাতন দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় মনোমোহন দে মহাশয় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময় নদীয়া, হুগলী, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি জেলায় জমিদারী বিস্তৃত হয়। তিনি স্বীয় গ্রাম বরশুল হইতে শক্তিগড় ষ্টেসন পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গ্রামে একটী এঙ্গলো ভার্ণাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার দানও যথেষ্ট ছিল। যাঁহার যে কার্য্যের জন্য কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন হইত তাঁহার নিকট তিনি সেই প্রকার সাহায্য পাইতেন। লর্ড নর্থব্রুকের সময় এ দেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় সেই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার জন্য এবং দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস" উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে যে দরবার হয় সেই দরবারে বঙ্গের তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর রিচার্ড টেম্পল মহোদয় তাঁহাকে নিম্নলিখিত "সার্টিফিকেট অব্‌ অনার" প্রদান করিয়াছিলেন—

"By command of His Excellency the Viceroy and Governor General of India this certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty, Victoria, Empress of India, to Baboo Monomohan Dey son of Baboo Sanatan Dey, Landholder of Barsool, in recognition of his liberality during the famine and his services in the cause of education."

January 1st, 1877.

Sd. Richard Temple."

তিনি অস্ত্র আইনের বিধান হইতেও বর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ রাজরাজেশ্বর জীউ ঠাকুরের ও অন্যান্য ঠাকুরের সেবা পরিচালনা জন্য কতক সম্পত্তি দেবসেবার জন্য দান করিয়া উক্ত ঠাকুরের দেবোত্তর সম্পত্তি সৃজন করেন। সন ১৩২০ সালে দামোদরের ভীষণ বন্যার সময় বন্যা প্রপীড়িত লোকদিগকেও তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ৮২ বৎসর বয়সে সন ১৩২৭ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ। তন্মধ্যে দেবেন্দ্র-কৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন।

স্বর্গীয় মনোমোহন দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দে একজন বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী ব্যক্তি। তিনি স্বীয় গ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং গ্রামে একটী পোষ্টাপিসও স্থাপন করিয়াছেন। ১৯০৬ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত তিনি বড়শুল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়ত ছিলেন। পুনরায় ১৯২৫ সাল হইতে বড়শুল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। কিছুকাল তিনি সদর লোকাল বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র যতীন্দ্র মোহন এক্ষণে ব্যবসায়াদি করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র চণ্ডীচরণ ও তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্র মোহন এক্ষণে লেখা পড়া শিখিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স এক্ষণে এক বৎসর।

স্বর্গীয় মনোমোহন দে মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীগোপেন্দ্র কৃষ্ণ দে বি, এল, পরীক্ষা পাস করিয়া বর্দ্ধমানে ওকালতি করিতেছেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলা কৃষি সমিতির (District Agricultural Association) একজন সভ্য ও পাল্লা ডিস্পেন্সারি কমিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান। তাঁহার দুই পুত্র ও একটি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের বয়স এক্ষণে ৮ বৎসর তিনি স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া শিখিতেছেন এবং

কনিষ্ঠ শুভেন্দ্রমোহনের বয়স ৩ বৎসর মাত্র। কন্যাটির বয়স ১ বৎসর মাত্র।

স্বর্গীয় সনাতন দে মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র দে মহাশয় সন ১৩১১ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোকপ্রাপ্ত হন। তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জিৎপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহের বিবাহ হয়।

বড়শুল দে বংশের কুরচিনামা।

প্রভাসচন্দ্র
শ্রীশচন্দ্র
ক্ষিতীশচন্দ্র
কৃষ্ণকিশোর
জ্যোতীশচন্দ্র
রাম নারায়ণ
কালী শঙ্কর
অজিৎকুমার
প্রমোদকুমার
অনিলকুমার
প্রতুলকুমার
বিদ্যুৎকুমার
বিনয়কৃষ্ণ
রমেন্দ্রকৃষ্ণ
মনীন্দ্রকৃষ্ণ
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ
সতীশচন্দ্র
হরিহর
আনন্দগোপাল
ননীগোপাল
শিশু
সূর্য্যনারায়ণ
চন্দ্রশেখর
জয়নারায়ণ
সুধীরকুমার
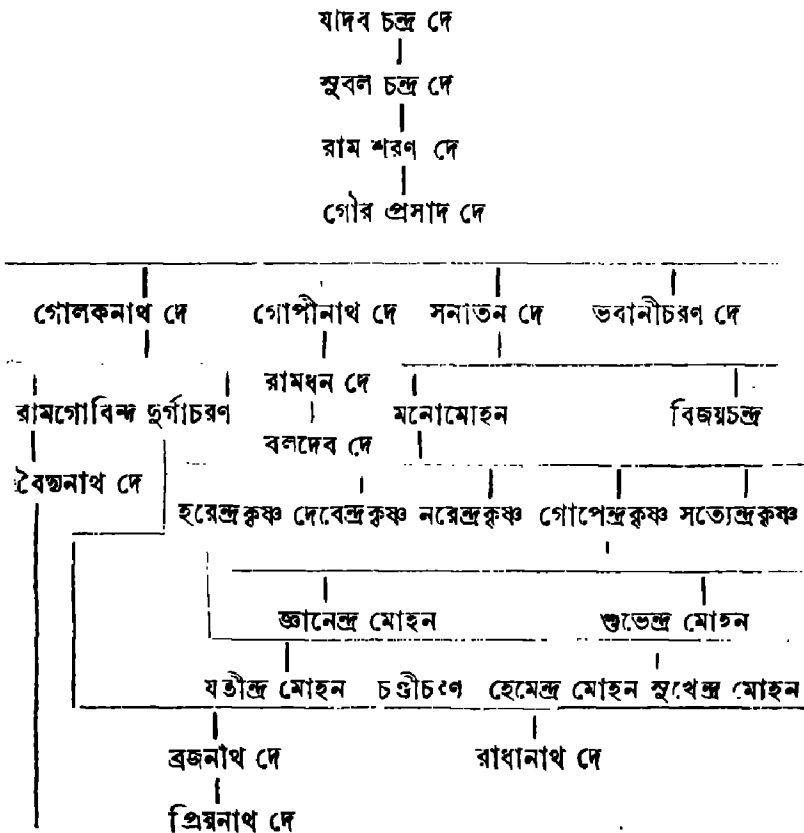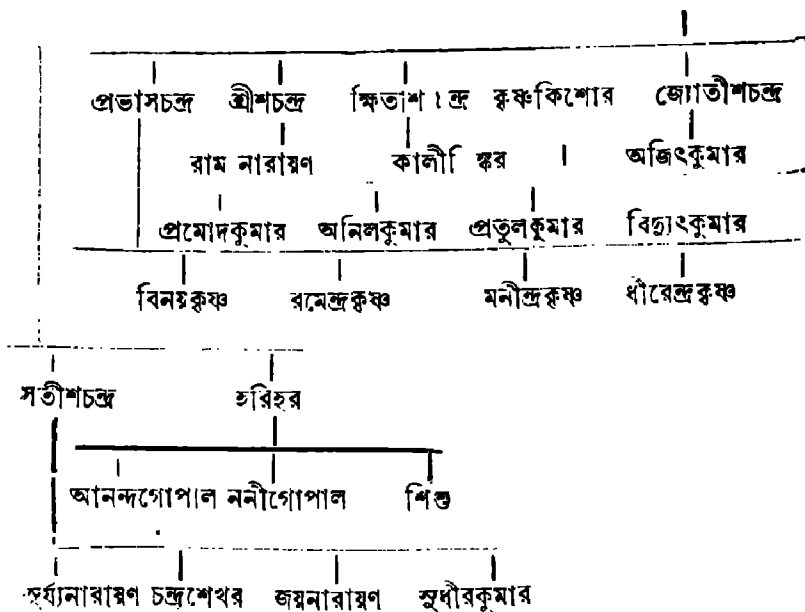
স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ পরগণার নারায়ণপুর গ্রামে ১২৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৫ঠা তারিখে ৺তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঔরসে এবং পার্ব্বতীদেবীর গর্ভে ৺ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা তারিণীচরণ পার্শি ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাকে সকলে "মুন্সী" বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তখন ইংরাজী ভাষার চলন হওয়ায় তিনি ইংরাজের দপ্তরে কোন চাকরী পান নাই। তৎকালীন হালিসহর পরগণায় জমিদার হরিমোহন সেনের ষ্টেটে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে গোমস্তাগিরি করিতেন। তিনি সত্যবাদী, সরল এবং সুরসিক লোক ছিলেন এবং মজলিসী লোক ছিলেন বলিয়া তৎকালীন স্থানীয় বড় বড় লোকের মজলিসে সর্ব্বদাই নিমন্ত্রিত হইতেন। তিনি এরূপ সত্যবাদী ছিলেন যে যখন হরিমোহন সেন মহাশয় তাঁহাকে চাকরীতে বাহাল করেন তখন বলিয়াছিলেন, "আপনি ৬৲ টাকা মাস মাহিনা পাইবেন কিন্তু উপরি কিছু লইবেন না"। তাহাতে তিনি বলেন যে "আমার অনেক ছেলে-পুলে, ৬৲ টাকায় কিরূপে চলিবে—৩০৲ টাকা যদি দেন তবে উপরি পাওনার চেষ্টা করিব না,"—হরিমোহন বাবু তাঁহার সরলতা এবং সাধুতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার ৩০৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। তৎকালীন কোন গোমস্তার এরূপ বেতন ছিল না। তাঁহার পাঁচটি পুত্র; জ্যেষ্ঠ যদুনাথ অপুত্রক মারা যান—তিনি প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। মধ্যম শ্রীনাথ পোষ্ট মাষ্টারী করিতেন—তাঁহার এক কন্যা ছিল, সেই কন্যার দুই পুত্র এখন সালিখায় সীতানাথ বসুর লেনে বাস করিতেছে। তৃতীয় কালীনাথ চুঁচড়া ডফের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা পান এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে ১০৲ টাকা
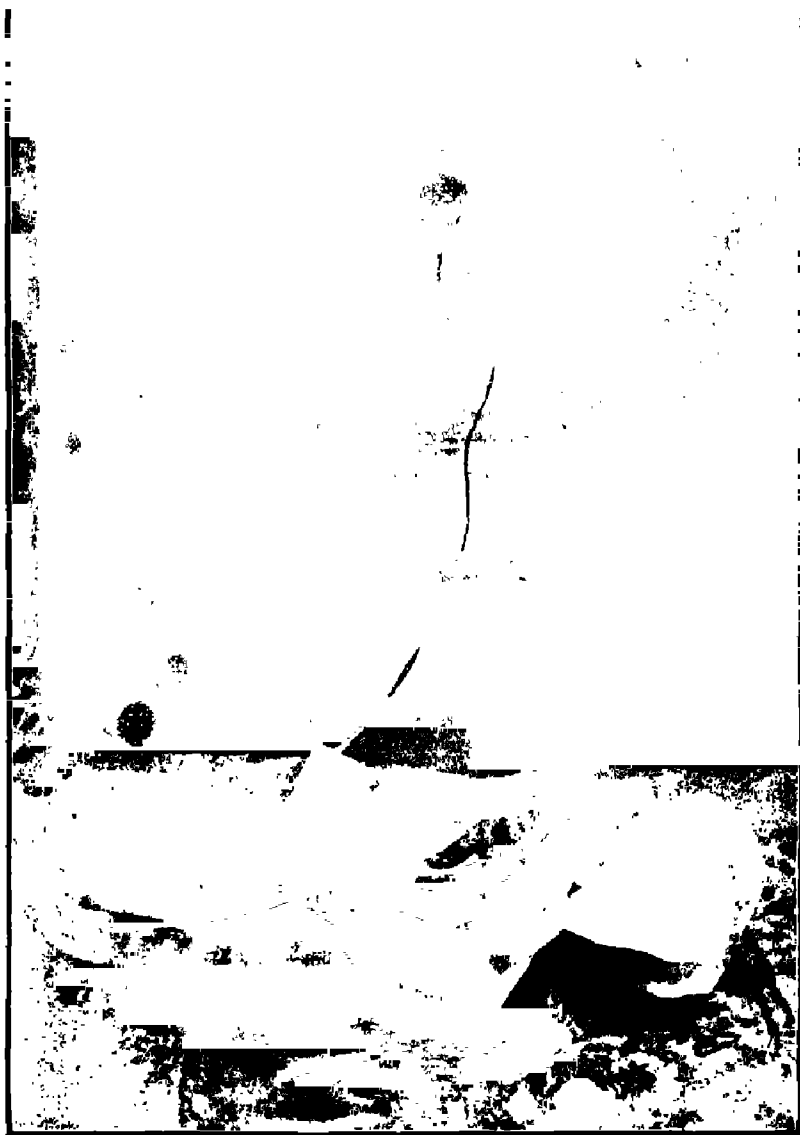
স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেতনের ব্রাঞ্চ পোষ্টমাষ্টারের পদ হইতে ২০০৲ টাকা বেতনের মজঃফরপুরের হেড্ পোষ্টমাষ্টারের পদে উন্নীত হন। সে প্রায় ৪০ বৎসর আগেকার কথা। তখন সবডিবিসনের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেরও ২০০৲ টাকা বেতন ছিল। ইনি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং সর্ব্বস্থানে সম্মান পাইতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনাথ এখন কলিকাতায় পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিসে চাকরী করেন। চতুর্থ সীতানাথ ইংরাজীতে পারদর্শী ছিলেন এবং ই, আই, রেলওয়ে কনসট্রাক্সনের সময় তুণ্ডলায় থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার তিন পুত্র—সত্যসখা, ব্রজনাথ ও নন্দদুলাল। ইহারা এখন মেদিনীপুরে নানারকম ব্যবসা করিতেছেন এবং উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

কনিষ্ঠ ক্ষেত্রনাথ সরল, সত্যবাদী, ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার বাল্যসুলভ সরলতায় সকলে মুগ্ধ হইত। তাঁহার পিতার এমৎ অবস্থা ছিল না যে তিনি তাঁহাকে উচ্চ শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার নিজ অধ্যবসায় গুণে তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। হালিসহরে মাতুলালয় সম্বন্ধীয় কোন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাটিতে চারটি খাইয়া ১৪ বৎসর বয়সে Spelling Book আরম্ভ করিয়া ২০ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্র পুরকাইত মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং স্নেহ করিতেন। এনট্রান্স পাস হইবার পর নিজগ্রাম নারায়ণপুরে আসেন এবং হুগলি কলেজে এফ-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন গ্রাম হইতে এক ক্রোশ হাঁটিয়া গঙ্গা পার হইয়া কলেজে আসিতে হইত; সেকালে রাস্তা ভাল ছিল না—বর্ষাকালে খুব কাদা ভাঙ্গিতে হইত। ক্ষেত্রনাথ যথাসময়ে এফ, এ পাশ করিয়া বি, এ পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আর্থিক কষ্ট হেতু কলেজে না ভর্ত্তি হইয়া প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তদানীন্তন গ্রাম্য মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক

হন। তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি কিরূপ সত্যবাদী ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বাড়াইবার জন্য তখন একটি প্রথা অবলম্বন করা হইত অর্থাৎ কাগজে কলমে তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৪০৲ টাকা। কিন্তু বাস্তবিক তিনি পাইতেন ৩০৲ টাকা অর্থাৎ ৪০৲ টাকাতে খাতায় সহি দিয়া ৩০৲ টাকা পাইতেন। স্কুলে ইনেস্‌পেক্টর পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কত টাকা পাও ?" তিনি উত্তরে বলিলেন "৩০৲ টাকা"। প্রশ্ন—"তবে তুমি ৪০৲ টাকায় কেন সহি দিয়াছ ?" উত্তর—"আমি আমার গ্রাম্য স্কুলে ১০৲ টাকা চাঁদা দিই"। তাহাতে ইনেস্‌পেক্টর বলেন—"বাঃ! তুমি পাও মাত্র ৪০৲ টাকা আর উহা হইতে ১০৲ টাকা চাঁদা দাও"। তারপরে অন্যান্য শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যত টাকার সহি দিয়াছেন তাহাই পাইয়া থাকেন এইরূপ বলেন। তাহাতে ইনস্‌পেক্টর বাবু বলেন "এখানে যেরূপ ষড়যন্ত্র দখিতেছি তাহাতে যে সত্য কথা বলিতেছে সেই-ই মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে ; সুতরাং গবর্ণমেণ্টে একথা রিপোর্ট করিলে বিশেষ কিছু ফলোদয় হইবে না"। তদানীন্তন স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয় তাঁহাকে এরূপভাবে ইন্‌সপেক্টরের নিকট বলার নিমিত্ত অনেক ভৎর্সনা করেন, এজন্য তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন। তাহার পর হুগলি কলেজে বি, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন। সেই সময় স্যার হেনরি• ক্যাম্বেল বঙ্গের ছোটলাট ছিলেন—তাঁহার হুকুমে হুগলি এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে এক একটি করিয়া দুইটি সিভিল সার্ভিস্ ক্লাস খোলা হয়, তিনি তাহাতে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করেন। হুগলি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল থোয়েটস্ সাহেব মহোদয় তাঁহাকে গরীব বলিয়া জানিতেন এবং স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন."তুমি গরীব, কতকগুলা অযথা অর্থ ব্যয় করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না, উহা স্যার হেনরি ক্যাম্বেলের খেয়াল মাত্র" এবং তাঁহার আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁহাকে ভর্ত্তি করিলেন না। তাঁহার সমপাঠী

গরীফা নিবাসী ৺ত্রৈলোক্যনাথ সেন মহাশয় সেই ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তাঁহার সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাহার পর তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া যশোহরের কালেকটরির হেড্ ক্লার্কের পদ ৮০৲ টাকা বেতনে গ্রহণ করেন, কেন না চাকরী না করিলে তাঁহার সংসার চলা ভার হইয়া উঠিল। ঐ হেড্ ক্লার্কের পদে ৫ বৎসর থাকিতে না থাকিতে তদানীন্তন কালেকটরির সেরেস্তাদার হালিসহরনিবাসী ৺গোবিন্দচন্দ্র বসু (ইনি সেকালের সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা পাস করিয়াছিলেন) পেন্সন লওয়ায় তিনি তাঁহার পদে উন্নীত হন। তখনকার কালেকটর মিঃ ই, জে, বার্টন সাহেব তাঁহাকে উদার, সরলপ্রকৃতির এবং সত্যবাদী বলিয়া যথেষ্ট ভালবাসিতেন এবং সমাদর করিতেন। বার্টন সাহেব মহোদয় পেন্সন লইয়া বিলাত গিয়া বাস করিবার কালীন তাঁহাকে বন্ধুভাবে বরাবর চিঠিপত্র দিতেন। ক্ষেত্রবাবু ইংরাজিতে সুলেখক ছিলেন, সেইজন্য বার্টন সাহেব এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালেকটরগণ তাঁহাকে বিশেষ আদর করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার হেড ক্লার্ক থাকার কালীন গবর্ণমেণ্ট সব্ ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অচিরে সেরেস্তাদার হইবেন এই আশায় উহা গ্রহণ করেন নাই। তখনকার সব্ ডেপুটীর বেতন ১০০৲ টাকা ছিল এবং মাঠে মাঠে জরিপ করিতে হইত, সেরেস্তাদারের বেতন ২০০৲ টাকা ছিল। পরে তিনি ডেপুটী কালেকটরের পদপ্রার্থি হওয়ায় তাঁহাকে বিভাগীয় পরীক্ষা (দপ্তরী পরীক্ষা) দিতে বলে, কিন্তু এই সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়ায় এবং মন উদাস হওয়ায় পরীক্ষার উদ্যোগ আয়োজন যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন। তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি যশোহরের পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ছিলেন,—অবসর পাইলেই লাইব্রেরির উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লাইব্রেরিতে বসিয়া পাঠ করিতেন। এই সময় তিনি ইংরাজীতে শিক্ষা

সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তিকাও লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তৎকালীন সিবিলিয়ানগণ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই ছিল যে তদানীন্তন কালেকটরগণ তাঁহাকে বহু গুণ সম্পন্ন দেখিয়া তাঁহাকে অনেক ক্ষমতা দেন, কিন্তু তিনি এক দিনের নিমিত্তও সে সমস্ত ক্ষমতার অপলাপ করিয়া একটি পয়সাও উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। এরূপ লোক সংসারে খুব বিরল। তিনি নড়াইলের জমীদারগণের গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইলে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে শালীসির বিচারক নিযুক্ত হয়েন এবং সেই কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে দৈনিক ১০৲ টাকা ফি প্রাপ্ত হইতেন। তিনি নড়াইলের চর সেটেলমেণ্ট করিবার নিমিত্ত Ex-officio অফিসার নিযুক্ত হয়েন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বাৎসরিক ২২০০০৲ টাকা আয় হয়। পরে চাঁচড়ার রাজাদের রাজা উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার জন্য স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন এবং তাঁহারই রিপোর্ট অনুসারে রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ রায় "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাসায় বন্ধুভাবে বেড়াইতে আসিতেন। তিনি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কাহারও অন্যায় ব্যবহার কিংবা কথা সহ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপে ২৭ বৎসর তেজের এবং মান্যের সহিত চাকরী করিয়া ১৯০০ খৃঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া নিজের গ্রাম্য বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চৌকিদারি ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া বহুদিন যাবৎ ঐ কার্য্য করেন। ১৬ বৎসর পেন্সন ভোগ করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে ১৯১৬ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারি (২৯শে পৌষ ১৩২২ সাল) রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তাঁহার পুত্রের ভাটপাড়া বাসাতে প্রাণত্যাগ করেন। ক্ষেত্রবাবু সরল, মিষ্টভাষী, দাতা, সত্যবাদী এবং উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আত্মীয় দরিদ্র বিধবাদিগকে গোপনে মাসহারা দিতেন এবং জীবনাবধি আর্ত্তের সহায়তা করিয়াছেন।

ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বজনের উপর তাঁহার মায়া মমতা অসীম ছিল, তিনি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে উদাসীন এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি পরহিতে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া মৃত্যুর সময় কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি পরম ধার্ম্মিক এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করেন নাই—জীবনাবধি কখনও অখাদ্য গ্রহণ করেন নাই, অথচ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তাঁহার মত উদার ছিল। ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অতুলনীয় নির্ভরতা ছিল। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই; সেই কারণে জীবনে অনেকের পক্ষে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই ফলবতী হইয়াছে অর্থাৎ এক কথায় তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। তিনি এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এখন ভাটপাড়াতে হোমিওপ্যাথি মতে যশের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি দরিদ্রের বন্ধু। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান আশুতোষ এখন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছেন। প্রবোধ বাবু সম্প্রতি গবর্ণর কর্ত্তৃক তাঁহার গ্রাম্য ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ক্ষেত্র বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিবসাবধি যশোহরের কালেকটরির হেড্ আসিস্‌ট্যান্টের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি পেন্সন লইয়াছেন এবং তাঁহার চতুর্থ জামাতা ডাক্তার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় বেহালার মিউনিসিপাল কমিসনার এবং মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন। এক জামাতা শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তেলীনিপাড়ার ৺সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয়। তিনি যশোহরের কালেকটরির একাউণ্টেণ্টের কার্য্য করেন।

বংশ তালিকা।

বন্দাঘাটী গাঁই। সর্ব্বানন্দী মেল।

রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান।

গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কুল ভঙ্গ করেন)
- রামহরি
  - রামকৃষ্ণ
    - জগদীশ্বর
      - বীরেশ্বর (স্ত্রী, রামধনা)
        - দেবীচরণ (স্ত্রী, হরসুন্দরী)
          - তারিণী চরণ (স্ত্রী, পার্ব্বতী)
            - যদুনাথ
            - শ্রীনাথ
              - বিনোদিনী (কন্যা)
                - জীবানন্দ
                - নিত্যানন্দ
            - কালীনাথ
              - যোগেন্দ্রনাথ
                - শিশুপুত্র
              - ১কন্যা
            - সীতানাথ
              - সত্যসখা
                - সতীশচন্দ্র
                - ৩কন্যা
              - ব্রজলাল
              - নন্দদুলাল
            - ক্ষেত্রনাথ

- প্রবোধ চন্দ্র
  - আশুতোষ
  - সন্তোষ
  - পরিতোষ
  - ৬ কন্যা
- ৫ কন্যা
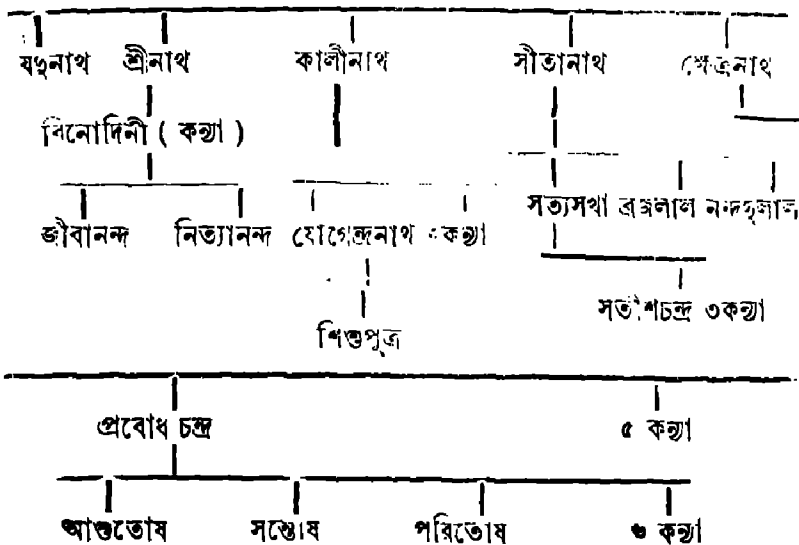
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত দেহুড়দা গ্রামের মহাশয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উপেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় পিতার সহিত নানাপ্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয় একজন সুশিক্ষিত ও আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে টোল স্থাপন করিয়া তাহার স্থায়ীত্বকল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। বালেশ্বর জেলার পানীয় জলের অভাব নিবারণের জন্য তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ তাঁহার পিতার নামে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

পিতার মৃত্যুর পর উপেন্দ্রচন্দ্র পিতার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া গত বিশ বৎসর কাল বহুবিধ দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার উইলিয়ম ডিউক বিহার ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড সিংহের নিকট উপেন্দ্রচন্দ্রকে পরিচিত করিবার জন্য একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি উপেন্দ্র বাবুকে জনহিতে ব্রতী জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় যে দিল্লীর দরবার হয়, সেই দরবারে উপেন্দ্রচন্দ্রকে একটি মেডেল ও সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার রবার্ট

কার্লাইল যখন বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই সময় হইতে তিনি উপেন্দ্রবাবুকে তাহার সদ্‌গুণের জন্য শ্রদ্ধা করিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি উপেন্দ্রচন্দ্রকে সিমলা শৈল হইতে লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে আমি পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব না বলিয়া আমার বিশেষ দুঃখ হইতেছে।"

উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিশনার লেভিঞ্জ সাহেব উপেন্দ্রচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "উপেন্দ্রচন্দ্র প্রজাবৎসল জমিদার ও জনহিতব্রতে নিযুক্ত আছেন।"

গত বিশবৎসর কাল উপেন্দ্রচন্দ্র অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ও লোকালবোর্ডের সদস্য পদে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের নানা জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি দেশের তন্তুবায়দিগের উন্নতিকল্পে এবং উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানালে ষ্টীমার চালাইবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। ইনি ডিষ্ট্রীক্ট এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট কমিটির কৃষি সমিতির সভ্য। ১৯০১ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ইনি আদম সুমারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইনি নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য অনেক সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকখানির নাম এস্থলে উল্লেখ করা গেল। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার উইলিয়ম ডিউক তাঁহাকে দিল্লী দরবার উপলক্ষে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করেন এবং শাসন কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতা করিতে তিনি সর্ব্বদা ইচ্ছুক বলিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করেন। ১৯০৮ সালে বালেশ্বরের কালেক্টর মিঃ বি, সি, সেন তাঁহাকে অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় প্রাচীন জমিদার বলিয়া একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ১৯২২ সালে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এম্ এন্ রায় তাঁহাকে সদর বেঞ্চে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

১৯০৬ সালে কৃষি বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ সি ডব্লিউ ওল্ডহাম তাঁহার কৃষি বিষয়ক কার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লেখেন। ১৯০১ সালে বঙ্গদেশের আদমসুমারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এস্ ও মালি বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক্ট আদমসুমারী অফিসারকে ঐ জেলার লোকগণনার হিসাব তাড়াতাড়ি দাখিল করায় ধন্যবাদ দিয়া পত্র লেখেন। তদুত্তরে বালেশ্বরের জেলা আদমসুমারী অফিসার তাঁহাকে লেখেন যে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্যেই তিনি তাড়াতাড়ি এই কার্য্য করিতে পারিয়াছেন।

বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এইচ্ ই বিল, আই সি এস্ লেখেন, উপেন্দ্র বাবু যে শুধু একজন সম্ভ্রান্ত লোক তাহা নহে, পরন্ত তিনি স্থানীয় তদন্ত প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। যাহাদের দরখাস্ত তাঁহার কাছে তদন্তের জন্য পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেহই এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নাই।

১৯০০ সালে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ও তাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

১৯২৩ সালে ডিষ্ট্রীক্ট এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট কমিটির সভায় তিনি চিতাই নালার বদ্ধমোহনা পরিষ্কার ও সুবর্ণরেখা নদীর মোহনা বিস্তৃত ও গভীর করিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ইহা ছাড়া উপেন্দ্র বাবু নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের জন্য আরও অনেক সম্মানসূচক সার্টিফিকেটাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে সেগুলির সবিস্তার উল্লেখ অসম্ভব।

রঙ্গপুর মন্থনার জমিদার বংশ।

রঙ্গপুর জেলার মন্থনা পরগণার জমিদার বংশের বর্ত্তমান নিবাস ভূমি পীরগাছা নামক গ্রাম। এই স্থানটী পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের সান্তাহার ও কাউনীয়া নামক শাখার উপর অবস্থিত এবং ত্রিস্রোতা নদী হইতেও বহু দূর নহে। রঙ্গপুর জেলা হইতে পীরগাছার দূরত্ব মাত্র ১৩ মাইল। মন্থনার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বৈষ্ণব মিশ্র। ইনি কখন কোথা হইতে আসিয়া পীরগাছায় বাসস্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আর জানিবার উপায় নাই। ইঁহার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, আমরা তাঁহার বংশাবলীর অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষের নাম পাইতেছি। প্রতি পুরুষের জীবন কাল ৩০ বৎসর ধরিলে তিনি এখন হইতে প্রায় ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, এরূপ মনে করা অন্যায় হইবে না। এখন ৪২৮ চৈতন্যাব্দ চলিতেছে। সুতরাং মনে করিতে হয় যে যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল, তখনই তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার নামটীতেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব কালের চিহ্ন রহিয়াছে।

বৈষ্ণব মিশ্রের দুইটী পুত্র, হরি গোস্বামী ও মুকুন্দ। হরি গোস্বামী ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ধর্ম্মকেই ভক্তি সহকারে অবলম্বন করিয়াছিলেন। হরি গোস্বামীর দুইটী পুত্র ছিল, কিন্তু তৎপর তাঁহার বংশাবলীর অন্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব মিশ্রের পুত্র মুকুন্দের দুইটী পুত্র সন্তান ছিল, কিন্তু একটী অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গগত হন, অপরটীর নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের দুই পুত্রের মধ্যে একটী নিঃসন্তান, অপর পুত্রের নাম জিতা মিশ্র। জিতা মিশ্রের পুত্রের নাম গোবিন্দরাম সান্ন্যাল। গোবিন্দরামের ছয়টী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাঁহাদের নাম কৃষ্ণ রাম চৌধুরী, রঘুরাম চক্রবর্ত্তী, অনন্তরাম চৌধুরী, নৃসিংহ রাম লস্কর, অযোধ্যারাম চৌধুরী

এবং দর্পনারায়ণ লস্কর। ইহারা কালে সকলেই সবিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং তজ্জন্যই সাধারণ বংশোপাধি সান্যালের নামের পরিবর্ত্তে চৌধুরী, লস্কর প্রভৃতি কর্ম্মজনিত পদবীও ব্যবহার করিতে থাকেন। তখন কোচবিহার রাজ্য ঘাঘট নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রঘুনাথ ব্যতীত অন্যান্য ভ্রাতাগণ উক্ত রাজ্যের নানাবিধ উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে ঘাঘটের অপর পাড়ে অবস্থিত কুণ্ড পরগণা পর্য্যন্ত মুসলমান রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল এবং মাহিগঞ্জ নামক স্থানের নিকটে ঘাঘট নদীর ধারে কোচবিহারে রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজ্যের সীমায় মুসলমান রাজ্য অবস্থিত হওয়ায় অনবরতই বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই সময় লস্কর ভ্রাতৃগণ কোচবিহার রাজ্যের অধীনস্থ ফৌজ লইয়া শত্রুগণের সহিত লড়াইএর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। এই লস্কর বংশের কাহারও সন্তান না হওয়ায়, কাহারও সন্তানের সন্তান না হওয়ায় এবং কাহারও বা কেবল কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় বংশ শূন্য হয়।

অন্য ভ্রাতা রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কোনরূপ রাজ কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্রের কেবল কন্যা সন্তান জন্মায় তাঁহার বংশও লোপ হয়।

গোবিন্দরামের অন্য তিন পুত্র কোচবিহারের অধীনে রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া "চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিঃ বুচানন রঙ্গপুরের চৌধুরীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে উঁহাদের পদমর্য্যাদা রাজার নীচেই ছিল, এবং উঁহাদের পদমর্য্যাদা সাধারণ তহশীলদার অপেক্ষা অনেক উচ্চ ছিল। তখন সম্পত্তির নানারূপ বিভাগ ও উপবিভাগ ছিল এবং নিম্নস্থ মালিকগণ উপরস্থ মালিকগণকে কেবল খাজনার জন্যই দাবী করিতেন, অপরাপর বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

চৌধুরী ভ্রাতৃগণের মধ্যে কৃত রাম ও অযোধ্যারামের কথা সংক্ষেপেই শেষ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণরামের বংশ তাঁহার পৌত্র নন্দরামের সময়েই শেষ হয়। অযোধ্যারামের অধস্তন পুরুষদের মধ্যে কেবল বেণী-মাধব নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

অন্যতম চৌধুরী অনন্তরাম বৈষ্ণব মিশ্রের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং তিনিই বর্ত্তমান জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কোচবিহার রাজ্যের নিকট হইতে বাঙ্গালা ১০১০ সালে সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার নাম হইতেই তাঁহার বাসস্থানের নাম "তালুক অনন্তরাম" নামে অভিহিত হয়। এই অনন্তরাম তালুকেরই প্রকাশ্য নাম বর্ত্তমানে পীরগাছা। অনন্তরামের পুত্রের নাম রাঘবেন্দ্র। রাঘবেন্দ্রের পুত্রের নাম যাদবেন্দ্রনারায়ণ। ইহারা পিতা পুত্র উভয়েই ব্রাহ্মণ ও ফকিরদিগকে বহু লাখেরাজ প্রদান করায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজে দাতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং অদ্যাবধিও স্মরণীয় হইয়া আছেন। যাদবেন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা ও ভক্তি পোষণ করিতেন এবং তজ্জন্য তিনি যাদব রায় ও গোপাল নামক দুইটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাদের পূজা নির্ব্বাহার্থে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের একটী সম্পত্তি দেবোত্তর স্বরূপে প্রদান করেন। এই বিগ্রহদ্বয় অদ্যাপিও জমীদার বাটীতে স্থাপিত থাকিয়া রীতিমতভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

যাদবেন্দ্রের পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণও পিতৃ পিতামহের পদানুসরণ করিয়া বহু লাখেরাজ ভূমি প্রদান করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় মৃত হওয়ায় বংশটীতে সর্ব্বপ্রথম ঔরসজাত পুত্রের অভাব হয় এবং যাদবেন্দ্রের বিধবা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী রাজেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বেই মন্থনার জমিদার বংশ কোচবিহার রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্ত্তে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বশ্যতা স্বীকার

করিতে বাধ্য হন। কাজির হাট, ফতেপুর, ইদ্রকপুর, এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র চাকলা, ক্রমে ক্রমে কোচবিহার রাজ্যের হস্তচ্যুত হইতে থাকে ও মুসলমান শাসনাধীনে আইসে। মুসলমান শাসনাধীনে আসিলেও সুবাদার কোচবিহারের অধীনস্থ চৌধুরীগণের হস্তেই তাহাদের সম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পণ করার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রথমতঃ মন্থনার জমিদার বংশ মুসলমানের অধীনে পরগণার মালিক হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলিয়া তাহাদের পূর্ব্বাধিকৃত অনেক সম্পত্তি পরহস্তগত হয়, কিন্তু যখন সুবাদার স্বয়ং ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হইয়া পরগণার নূতন বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন তখন তদানীন্তন জমীদার তাঁহার মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন ও নিজ প্রার্থনা জানান; কিন্তু তখন চাকলা ফতেপুরের অধিকাংশ স্থলেরই বন্দোবস্ত শেষ হইয়াছিল, মাত্র ৵০ দুই আনা অংশ অবশিষ্ট ছিল, ঐ ৵০ দুই আনা অংশই মন্থনা পরগণা নামে অভিহিত হইয়া চৌধুরী বংশের হস্তগত হয়, তারপর ক্রমে এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে, কিন্তু উক্ত পরগণা এ পর্য্যন্ত উল্লিখিত চৌধুরীবংশের জমিদারীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১১৯৪ সালে (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) রঙ্গপুর জেলায় ভীষণ বন্যা হইয়া ত্রিস্রোতার গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং লোকের গৃহ ও সম্পত্তি নাশ প্রভৃতি দুর্দ্দশার সঙ্গে সঙ্গে মড়ক ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এই সব দৈব দুর্ব্বিপাকে মন্থনা পরগণার যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ায়, রাজস্ব আদায়ে অন্তরায় উপস্থিত হয়। এই সময় জয়দুর্গা দেবীই মন্থনার ভূম্যধিকারিণী। তিনি পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে ৩৪৫৭৯৸৶১২॥০ টাকা সদর রাজস্ব প্রদান করিবার কোন উপায় না দেখিয়া রাজস্ব হ্রাসের প্রার্থনা জানান। তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব অনুসন্ধান করিয়া সদর রাজস্ব ১৩২৭৯৶১৩॥০ টাকা ধার্য্য করিলেন, কিন্তু জয়দুর্গাদেবী আরও ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা হ্রাসের প্রার্থনা জানান। ইহাতে কালেক্টর সাহেব সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া

সাজওয়ালের হস্তে জমিদারী প্রদান করেন; কিন্তু কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ ও রেভিনিউ বোর্ডের ডিরেক্টারগণের উহা অভিপ্রেত না হওয়ায় এবং দশশালা বন্দোবস্তের সময়ও জয়দুর্গাদেবী তাহার পূর্ব্বদাবী পরিত্যাগ না করায়, সদর রাজস্ব বিশেষভাবে হ্রাস করিয়াই নূতন বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত করা হয়।

জয়দুর্গাদেবীর পূর্ব্বোক্ত দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁহার জমিদারী কার্য্যদক্ষতাও অসাধারণ ছিল, তাঁহার দুইটী পুত্র হরেন্দ্র নারায়ণ ও ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ। রাজেন্দ্র জীবিত কালেই সম্পত্তি পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া যান। এমন কি মন্থনা পরগণা কালেক্টারীর তৌজিতে ১৯ এবং ২০ নম্বর এই দুই অংশে ভাগ করিয়া দুই পুত্রকে মালিক করিয়া যান, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই দুই পুত্রের সম্পত্তি বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে অভিহিত হইতে থাকে।

ছোট তরফের ভৈরবেন্দ্র নারায়ণের পুত্র জগদিন্দ্র নারায়ণ নানারূপ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সমুদয় পৈত্রিক ধন বিনষ্ট করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার জমিদারী তাজহাটের মহারাজা ৺গোবিন্দলাল রায়ের নিকট পত্তনী দিতে বাধ্য হন, জগদিন্দ্র মৃত্যুকালে তাঁহার এক বিধবা পত্নী ও হেমেন্দ্র নারায়ণ নামে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া যান। হেমেন্দ্র নারায়ণ তাঁহার পিতৃ ঋণের জন্য তাঁহার মালিকানা স্বত্বও বিক্রয় করিতে বাধ্য হন, হেমেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র যতীন্দ্র নারায়ণ জীবিত ছিলেন, কিন্তু যতীন্দ্র নারায়ণ বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, তজ্জন্য তাঁহার ভগ্নীদ্বয়ের পুত্রগণ এক্ষণে ছোট তরফের মালিক বলিয়া পরিচিত।

বড় তরফের হরেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ছিল, কিন্তু কেবল মহেন্দ্র নারায়ণ ভিন্ন পিতার মৃত্যু সময়ে অপর ভ্রাতাদ্বয় জীবিত ছিলেন না।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

মহেন্দ্র নারায়ণ অতি অল্প বয়সে গতাসু হন, তাঁহার বিধবা পত্নী রাধাপ্যারী চৌধুরাণী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ দেশপ্রসিদ্ধ অর্দ্ধকালী বংশের কন্যা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীর পাণিগ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ নিজগুণে তাঁহার বংশের যশোরাশি বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন. শিক্ষাগুণে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি নিরতিশয় কার্য্যপটু ও জমিদারী কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন, তিনি অতিশয় ভদ্র ছিলেন এবং নিরহঙ্কারী ও নিরভিমানী ছিলেন বলিয়া ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আপনার জন মনে করিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য তাঁহার রঙ্গপুরস্থ ভবনে একটী সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় এরূপ সুপরিচালিত ও সুবিখ্যাত হয় যে, উত্তর কালে স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্ এবং মিঃ সি এ মার্টিণ প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ও রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ এফ এইচ স্ক্রাইন সাহেব উহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

কলা বিদ্যা ছাড়াও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ শিকারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার মত ভাল শিকারী ও লক্ষ্য ভেদে সিদ্ধ হস্ত ব্যক্তি সচরাচর নয়ন-গোচর হয় না। তাঁহার দ্বারা হত প্রাণিগণের দেহাবশেষ রক্ষিত হইলে একটী প্রদর্শনীর যোগ্য হইত।

জমীদারী পরিচালনে তাঁহার নিপুণতার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজ বুদ্ধিতে তাঁহার জমিদারীর আয় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে প্রজাগণ তাঁহার উপর কোনরূপ বিরক্ত হয় নাই বা বিদ্রোহ করে নাই

তাঁহার অনেকগুলি হস্তী ছিল এবং সর্ব্ববিধ হস্তী বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে হস্তী সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল "হস্তীতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত

করেন। হস্তী সম্বন্ধে এই পুস্তক একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ, এই পুস্তকে হস্তীকে শিক্ষা দিবার সম্বন্ধে ও উহাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কোন পশু চিকিৎসক ঐ বিষয়ে ঐরূপ গ্রন্থ লিখিলেও আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। ইনি পীরগাছায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন ও উহার যাবতীয় ব্যয় ভার নিজেই বহন করেন, অদ্যাপিও এই চিকিৎসালয় বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার উপচীকির্ষাবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের দুইটী ঔরসজাত পুত্র ছিল, কিন্তু তাহারা শৈশবেই পরলোক গমন করায় তিনি তাঁহার পত্নী ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়া এবং নয়টী কন্যা সন্তান রাখিয়া ১৩০৫ সালে স্বর্গারোহণ করেন।

পূর্ব্বোক্ত জয়দুর্গা দেবীর মত পরবর্ত্তীকালে, এই বংশ ভৈরবেন্দ্রের বিধবা পত্নী হরসুন্দরী দেবীও সবিশেষ যশোস্বিনী হইয়াছিলেন, তিনি হরিহরেশ্বর নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার সেবা পূজার জন্য অনেক সম্পত্তি দান করেন, ঐ বিগ্রহ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছেন। জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী অতি অল্পকালেই জয়দুর্গা ও হরসুন্দরীর ন্যায় সুখ্যাতি অর্জ্জনে সক্ষমা হইয়াছিলেন, তিনিও স্বগৃহে ভবতারিণী নামক কালীমূর্ত্তি ও স্বীয় স্বামীর চিতার উপরে জ্ঞানেশ্বর নামক শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছিলেন এবং জমিদারী শাসনসংরক্ষণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামীব যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছিলেন। কন্যাদিগকে সুপাত্রে অর্পণ করার ব্যয়াদি নির্ব্বাহের পরও তিনি চারি সহস্র টাকা দান করিয়া সর্ব্বপ্রথম রঙ্গপুর নগরে পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত করেন, ইহা উত্তরবঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পশু চিকিৎসালয়। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ জন্য তিনি তাঁহার জমিদারীর বিভিন্ন স্থানে পুকুর ও ইঁদারা খনন করিয়া

৺ ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী

দিয়াছিলেন। রঙ্গপুর সহরের খনিত পুষ্করিণীটী যে লোকের কত উপকার করিতেছে, তাহা রঙ্গপুর সহরবাসী মাত্রই অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন দানধর্ম্মে তাঁহার অন্যান্য সদ্ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি পীরগাছায় একটী মাইনর স্কুল স্থাপন বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং উহার অধিকাংশ ব্যয়ই তিনি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও এই বিদ্যালয় প্রধানতঃ বড় তরফের সাহায্যেই চলিতেছে। এই ধর্ম্মপ্রাণা রমণী বর্ত্তমান বড় মন্থনার জমিদারীর মালিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া গত ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ ১৩৩০ সনের ২৯শে কার্ত্তিক সাবালক হন, তখন তাঁহার বয়স সবেমাত্র আঠার বৎসর। এই তরুণ বয়সেই তিনি এষ্টেটের গুরুভার লইতে বাধ্য হন। বালক হইয়াও তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত এষ্টেটের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শৈশব কাল হইতে বহু বাধা বিপত্তি স্বত্বেও তিনি নিজ অধ্যয়নাদিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ১৩৩০ সনে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। গত ১৩৩১ সনে তিনি মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদার ৺বিনায়ক দাস আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের এক মাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার স্বর্গীয় পিতার মত শিকার ও কলাবিদ্যায় কথঞ্চিৎ গুণপণা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে কালে তিনিও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের যশের অধিকারী হইবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মাতার সহিত তাঁহাদের দিনাজপুরস্থ জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়া তথাকার অনেক ব্যাঘ্র বিনাশ করিয়া প্রজাদের অনেক দুর্গতি নিবারণ করিয়াছিলেন। প্রজাগণ পরলোকগতা ভবসুন্দরী দেবী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণের উপর

এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা তাঁহাদিগকে একটী হস্তী উপহার স্বরূপ দান করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালে এরূপ প্রজাবাৎসল্য ও জমিদার-ভক্তির দৃষ্টান্ত বিরল। পূর্ব্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভূপেন্দ্র নারায়ণ ও তাঁহার ভগ্নিগণ মিলিতভাবে ভবেশ্বর নামক শিব, তাঁহার পিতার চিতার উপর স্থাপিত জ্ঞানেশ্বরের পার্শ্বে মাতার চিতাভস্মের উপর স্থাপিত করিয়াছেন।

১৩০৪ সালে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ভীষণ ভূমিকম্পে ইহাদের পীরগাছাস্থিত প্রাচীন বাসগৃহ ও মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীন মণ্ডপ দালানটী অতিশয় কারুকার্য্য খচিত ছিল, এখন তাহার ধ্বংসও প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে, সদর কাছারী ও বাসস্থান এখন সেখানে থাকিলেও, রাজবাটী পুনঃ নির্ম্মিত না হইলে পূর্ব্বশ্রী আর ফিরিয়া আসিবে না। বড় মন্থনার জমিদার রঙ্গপুর সহরের অর্দ্ধাংশের মালিক। তাঁহাদের রঙ্গপুর বাসভবনও ভূমিকম্পে ধ্বংশ হইয়াছিল, তারপর যে সৌধটী ঐস্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

মন্থনার জমিদার বংশীয়গণ প্রকৃত পক্ষে স্যান্ন্যাল বংশোদ্ভব ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে সিদ্ধ শ্রোত্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং এই সামাজিক সম্মান লাভের জন্য ও এই সম্মান সংরক্ষণের জন্য তাঁহারা অর্থ ও সামর্থ্যের এ পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটী করেন নাই।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

মস্থনা জমীদার বংশের বংশতরু।

জওজে
রামমোহন
সেহানবিশ
কালিদাস চক্রবর্ত্তী
জগন্নাথচক্রবর্ত্তী
রাজমোহন সান্ন্যাল
শরৎ সুন্দরী দেবী
জওজে
রামনাথ চক্রবর্ত্তী
রমণী মোহন
গিরিবালা
চারুবালা
অনন্তরাম চৌধুরী ৬
রাঘবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ৭
নামাজ্ঞাত
যাদবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ৮
নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ৯
রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দত্তক ১০
হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১১
ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১২
ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৩
দেবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (মৃত)
নাবালক পুত্র (মৃত)
হেমাঙ্গিনী দেবী
সরোজিনী দেবী
সৌদামিনী দেবী চৌধুরাণী
কুমুদিনী চৌধুরাণী
সুহাসিনী দেবী
বিন্দুবাসিনী দেবী (মৃত)
ক্ষিরোদবাসিনী দেবী
পূর্ণিমা দেবী
উর্মিলা দেবী
ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

কালীতলার শ্মশানস্থ শিবালয়।

২৩৪
জগদিন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
হেমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
তরঙ্গিণী দেবী
নৃপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
কমাঙ্গিনী দেবী
তুলসীদাস ভট্টাচার্য্য
ক্ষিতীশচন্দ্র রায় (মৃত)
সুরেশচন্দ্র রায়
শিশু পুত্র
নৃসিংহরাম লস্কর
লক্ষ্মীনারায়ণ
চন্দ্রনারায়ণ
ভবানী প্রসাদ
রামকান্ত লস্কর
কালীশঙ্কর লস্কর
দুর্গাপ্রসাদ
১ম কন্যা
২য় কন্যা
৩য় কন্যা
কালীপ্রসাদ লস্কর
ভুবনেশ্বরী
জয়দুর্গা
কুমুদিনী
কমলকামিনী
বিনোদিনী
অযোধ্যারাম চৌধুরী
কৃষ্ণরাম চৌধুরী
হরেকৃষ্ণ চৌধুরী
৪

কালীকান্ত চৌধুরী
কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী
কালীকান্ত চৌধুরী
দুর্গাকান্ত
সরস্বতীকান্ত
দয়াময়ী দেবী
ঈশানচন্দ্র চৌধুরী
দুর্গাময়ী দেবী জওজে নবকিশোর ভট্টাচার্য্য
রূপকান্ত চৌধুরী
কমলাকান্ত
তরণীকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
করুণাকান্ত
জয়াকান্ত
কৈলাসেশ্বরী জওজে কৃষ্ণকান্ত মৈত্র
বরদাকান্ত (মৃত্যু)
মথুরাকান্ত
গোবিন্দকান্ত
কন্যা
গুরুদাস চৌধুরী
ঈশ্বরচন্দ্র অবিবাহিতা (মৃত্যু)
বেণীমাধব
১ম কন্যা বিবাহ দিনাজপুর
২য় কন্যা জওজে হরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
হেমেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
কন্যা শরৎ কামিনী জওজে সর্ব্বানন্দ চক্রবর্ত্তী
কন্যা নামাজ্ঞাত জওজে কার্ত্তিকচন্দ্র মজুমদার
সারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী
দর্পনারায়ণ লস্কর
খড়্গনারায়ণ লস্কর

মস্থনা জমিদারের বংশতরু।

রূপনারায়ণ লস্কর
খগেশ্বর লস্কর
প্রাণেশ্বর লস্কর
শিবেশ্বর লস্কর
দয়াময়ী দেবী
অভয়া দেবী জওজে
কৃষ্ণপ্রাণ সেহানবিশ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক বি-এ, মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী সাঙ্কাডাঙ্গা গ্রামে। তথা হইতে তাঁহার পুরুষগণ নদীয়া জেলার গাঁইঘাটা থানার মাটীকোমরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গাঁইঘাটা বর্ত্তমানে যশোহরের অন্তর্গত। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ রায় জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে "ঘটক" উপাধি পান। রায় জগদীশের এক বংশধর অন্ধমুনি ঘটক অন্ধ ছিলেন। এই অন্ধাবস্থাতেই তিনি চারি চারিটী চতুষ্পাঠীতে পড়াইতেন। দেশে বিদেশে প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। নদীয়ার মহারাজা পুণ্যশ্লোক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মোত্তর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এখনও ভোগদখল করিতেছেন।

জন্মেজয় ঘটক মহাশয় ঘটকালী ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। তিনি জজ কোর্টের উকিল ছিলেন। ইঁহাদের এক শাখা মাটীকোমরা হইতে বাসস্থান উঠাইয়া কাঠডাঙ্গায় যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। অদ্যাপি তাঁহারা তথায় বাস করিতেছেন। নিবারণ বাবুর প্রপিতামহ হরিরাম, বাচস্পতি মহাশয়ও প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র, বাড়রী গাঁই, সবাই বাড়ুয্যের সন্তান, কাটাদিয়ার বন্দ্যো। পূর্ব্বে ইঁহারা বাঙ্গাল পাস মেল ছিলেন, বর্ত্তমানে ইঁহারা সর্ব্বানন্দী মেল।

নিবারণ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটী অব আর্টসের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি অবসর প্রাপ্ত মিউনিসিপাল ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্। এক্ষণে কলিকাতার তিনি অন্যতম অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। বর্ত্তমানে তিনি স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র বাবু ধরণীমোহন রায়ের

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক

ষ্টেটের ম্যানেজারী করিতেছেন। ৮৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহন রায়ের বাটী অবস্থিত। নিবারণ বাবু খিদিরপুর রামকমল মুখোপাধ্যায়ের লেনস্থ স্বর্গীয় কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি হাওড়া নীলমণি মল্লিকের লেনের ১৯নং বাটীটি ক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও তিনি তাঁহার জননী জন্মভূমিকে বিস্মৃত হন নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তিনি মাটিকামরায় গমন করিয়া থাকেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ এম-বি-ই ব্যারিষ্টার এট্-ল। কলিকাতা হাইকোর্টের মাষ্টার ও সরকারী রেফ্রী। বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় তিনি সেকেণ্ড লেফ্টেন্যাণ্ট্ রূপে কাজ করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারীতে প্রবৃত্ত হন। তিনি পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা নলিনী সুন্দরী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা স্ত্রী আর ইহলোকে নাই। তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীটে একখানি বাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার লালমোহন ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী উমারাণী দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ৩৫নং বাদুড়বাগান ষ্ট্রীটে বাস করেন।

তৃতীয় পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ অণ্ডার গ্রাজুয়েট। তিনি সব রেজিষ্ট্রার। বারাসতের শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে তিনি বিবাহ করেন।

রমেশ বাবু সিমলা রেলওয়ে বোর্ডের সিনিয়ার সহকারী অফিসার।

নিবারণ বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর সহিত গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছে। স্বর্ণলতার এক পুত্র ভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ। ভূপালের পুত্রের নাম নিতাইচন্দ্র

দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যলতা দেবীর সহিত হাওড়া কাসুন্দিয়ার কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। লাবণ্যলতার পুত্রগণের নাম রামচন্দ্র, শৈলেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্র। তাঁহার দুইটি কন্যাও আছেন।

কনিষ্ঠ কন্যা হেমলতা দেবীর সহিত হাওড়ার ৺যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি ভাগ্যদোষে আজ বিধবা।

কণিষ্ঠা কন্যা নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :–

(১৩) বৈনতেয়

(১৪) সুবুদ্ধি

(১৫) বিধুধেয়

(১৬) সুভিক্ষ

(১৭) ভয়াপহ

(১৮) ধবন (ধরণী)

(১৯) মহাদেব

(২০) মকরন্দ

(২১) দাশরথি

(২২) বনমালী

(২৩) ভব

(২৪) জিউ

দিগম্বর

(২৫) সর্ব্বানন্দ

(২৬) হিরণ্য

(২৭) সবাই

(২৮) ত্রিপুরারী

(২৯) যাদব

মধুসূদন

(৩০) কুমুদ
(৩০) কাশীহরি কাশীহরির বংশীয়েরা সাঞ্চাডাঙ্গা করিঞ্চা হইতে যাইয়া কুশদহ পরগণায় মাটিকোমরা গ্রামে বাস করেন।
(৩১) হরিরাম বাচস্পতি
(৩২) রামচন্দ্র
শ্যাম
(৩৩) মাধবচন্দ্র
(৩৩) গোবিন্দচন্দ্র তিনি বিশ্বনাথ শিরোমণির কন্যা শ্রীমতী দাক্ষায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন।
(৩৪) শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক (অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী এবং মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট (কলিকাতা) বিএ Late F. R. A. S.(Lond)তিনি খিদিরপুর নিবাসী কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। এবং মাটীকোমরা ও হাওড়া টাউনে বাস করেন।
(৩৫) স্থবর্ণলতা দেবী স্বামীর নাম অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ নিবাস গোয়াড়া কৃষ্ণনগর
(৩৫) কালীনাথ (মৃত)
ভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ
নিতাই মুখোপাধ্যায়

(৩৫) নরেন্দ্রনাথ ঘটক এম, বি, ই, বার এট-ল মাষ্টার এবং অফিসিয়াল রেফ্রী কলিকাতা হাইকোর্ট। ইনি জার্ম্মেণীর সহিত যুদ্ধে বৃটীশসম্রাট কর্ত্তৃক সেকেণ্ড লেফ্‌টন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদারের কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীকে বিবাহ করেন।

(৩৫) মনীন্দ্রনাথ ঘটক বি-এ, মৃত

প্রতিভাদেবী স্বামীর নাম মিঃ সত্যেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জ্জী বার-এট-ল

(৩৬) নিরেন্দ্রনাথ ঘটক

প্রভাতীদেবী

প্রতিমাদেবী

শ্রীমতী লাবণ্যলেতা দেবী স্বামী কাসুন্দিয়া নিবাসী নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

(৩৫) উপেন্দ্রনাথ ঘটক সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি কলিকাতা বাদুড়বাগান নিবাসী ডাক্তার লালমোহন ঘোষালের কন্যা শ্রীমতী উমারাণী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র মুখো

উপেন্দ্র মুখো

সত্যেন্দ্র মুখো

২টী কন্যা

(৩৭) নৃপেন্দ্রনাথ ঘটক সবরেজিষ্ট্রার তিনি বারাসতনিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিনাপাণি দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন।

হেমলতা দেবী স্বামী মৃত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আশালতা দেবী (মৃতা)

অনারেবল ডাঃ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, এম-এ, ডি-এল্।

দ্বারকানাথ মিত্র যে বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন সেই বংশের আদিনিবাস বালির নিকটবর্ত্তী বাসারা গ্রামে ছিল। এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন; ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বসবাসের জন্য ৬০নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। ৫৯।১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে যে বাটী অবস্থিত তাহা এখন ইঁহার বংশধরগণের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

মিত্রবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্যমশীল এবং স্বাবলম্বনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী রাঁচী নামক স্থানে গিয়া একটী বৃহৎ মোকাম স্থাপন করেন। সেখান হইতে ঘি প্রভৃতি চালান দিতেন, এই ব্যবসায় ক্রমশঃই বিস্তৃত হইয়া উঠে এবং তাহাতে লাভও যথেষ্ট হয়।

দ্বারকানাথের পিতার নাম যদুনাথ। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল নহে বলিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিহারের ছাপরা সহরে গিয়া ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, ইহার পর বৎসরই তিনি সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুনসেফী গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার চট্টগ্রামে বদলী হইবার আদেশ আসিলে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন। কারণ চট্টগ্রামে যাইতে তিনি সম্মত ছিলেন না। এই মুনসেফী চাকুরি তিনি এক বৎসর করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় ছাপরায় ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতির কার্য্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও খ্যাতিলাভ

মাননীয় ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র

করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছাপরায় ওকালতি করেন; তাহার পর অবসর লন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতার বাসভবনে—২৫নং নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি চারিটি পুত্র রাখিয়া যান; তাঁহাদের নাম—হেমচন্দ্র, দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ।

জ্যেষ্ঠ হেমচন্দ্র মিত্র বিহারের প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকিল, তাঁহার ওকালতির খ্যাতি যুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সেখানকার বড় বড় মোকদ্দমায় তিনি প্রায়ই নিযুক্ত থাকেন।

দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ছাপরা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছাপরা জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং এই কলেজ হইতেই এফ-এ, বি এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রিপণ কলেজ হইতে বি-এল পাশ করিয়া তিনি একুশ বৎসর বয়সে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন; ওকালতিতে তাঁহার পসার শীঘ্রই হয়। ওকালতি করিতে করিতেই তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে "মাষ্টার অফ-ল" পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি "হিন্দু আইনে নারীজাতির অবস্থা" "Position of women in Hindu Law" সম্বন্ধে একটী গবেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখেন এবং তাহার জন্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দে "ডক্টর অব্ ল" উপাধি লাভ করেন। এক্ষণে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ এডভোকেট। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ তাঁহাকে "ফেলো" নির্ব্বাচিত করেন এবং তিনি ১৯১৬ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত "ফেলো" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৪সালে সার বিনোদচন্দ্র মিত্র Council of State হইতে অবসর গ্রহণ করায় ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়া-ছেন। তিনি এখন Council of stateএ পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধি হইয়া-

ছেন। ডাক্তার মিত্র British Indian Associationএর একজন সদস্য এবং ইতঃপূর্ব্বে তিনি উহার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ডাক্তার মিত্র শ্যামপুকুরনিবাসী ৺বামাচরণ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন।

প্রিয়নাথ মিত্র এম এ বি এল, দ্বারভাঙ্গার অন্যতম প্রবীণ উকিল।

বৈকুণ্ঠনাথ পাটনা হাইকোর্টের একজন এডভোকেট, তিনি তথাকার বহু জন- হিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত আছেন।

দ্বারকানাথের খুড়তুতো ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার আশুতোষ মিত্রের নাম শিক্ষিতসমাজে সুপরিচিত। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি এডিনবরা হইতে এম, আর. সি পি ও এ, এল, সি, এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর তিনি কাশ্মীর রাজ্যে চীফ্ মেডিকেল অফিসার বা প্রধান ডাক্তারের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অতীব সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কাশ্মীর রাজ্যের শিক্ষা ও অর্থসচিব নিযুক্ত হন। তিনি কাশ্মীরবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাজধানী শ্রীনগরে ওলাউঠার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক ছিল এবং প্রতি বৎসরই বহু লোক এই রোগে প্রাণত্যাগ করিত। ডাক্তার আশুতোষ প্রাণপণ চেষ্টা ও উদ্যমে শ্রীনগরকে একরূপ ওলাউঠা শূন্য করিয়াছিলেন তিনি বহুমূত্র পীড়া সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কৈসর-ই হিন্দ স্বর্ণপদক লাভ করেন। ডাক্তার আশুতোষের একমাত্র কন্যার সহিত সিভিলিয়ান পরলোকগত মিঃ যতীন্দ্রনাথ রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ নড়াইলের জমীদার ছিলেন।

ডাক্তার দ্বারকানাথের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত

নারায়ণচন্দ্র করের বিবাহ হইয়াছে। ইনি হাইকোর্টের উকীল; ইহার পিতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র কর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত দেশপ্রসিদ্ধ ৺ ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র ৺ গিরীন্দ্রনাথ বসুর বিবাহ হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র মিত্রের একমাত্র কন্যার সহিত রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দত্তের বিবাহ হইয়াছে। ইনি ছাপড়ার উকীল।

ডাক্তার দ্বারকানাথের খুড়তুতো ভাই রমানাথ গভর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন, তিনি এক্ষণে করাচীতে রহিয়াছেন।

দ্বারকানাথ মিত্রের বংশ তালিকা।
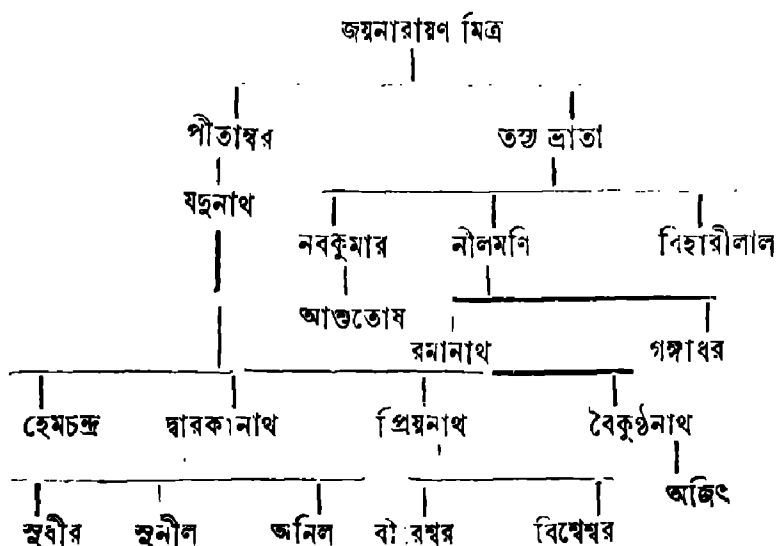
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম চৌধুরী।

কামরূপ জেলার ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর পাড়ে প্রসিদ্ধ নলবাড়ীর নিকট ধর্ম্মপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত নদোলা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গঙ্গারাম চৌধুরী মহাশয় আসাম কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ কলিতা জাতির অন্তর্ভুক্ত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই নদোলা গ্রামে তাঁহার প্রপিতামহ ৺চক্রধর চৌধুরী মহাশয় আসিয়া বাস করেন. তাহার পূর্ব্বে তিনি নলবাড়ীর নিকট কটোয়ালকুচি নামক গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতেন।

১৭৯১ শকাব্দের ৬ই আষাঢ় ইঁহার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর তখন ইঁহার পিতা, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, পৈতৃক সম্পত্তির দ্বারাই ইঁহার বিধবা জননী ইঁহাদের প্রতিপালন করিতেন।

ইনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তিও আছে। ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি ডিব্রুগড় সহরে বাস করিয়া থাকেন। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইঁহাকে "রায়সাহেব" উপাধি প্রদান করেন।

ইনি দুইবার দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রথমা পত্নীর নাম শ্রীমতী গিরিজাসুন্দরী এবং দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একটি কন্যা ও তিনটি পুত্র সন্তান, সকলেই নাবালক।

নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা প্রদত্ত হইল :—

রায় সাহেব গঙ্গারাম চৌধুরী

শ্রীগঙ্গারাম

জ্ঞানদাসুন্দরী (কন্যা) খগেন্দ্রনারায়ণ নগেন্দ্রনারায়ণ সত্যেন্দ্রনারায়ণ

স্বর্গীয় ধরণীধর মল্লিক

ধরণীধর বাবুর প্রপিতামহ রামদুলাল মল্লিক। তাঁহার প্রতাপের কথা এখনও তদ্দেশবাসী বৃদ্ধগণের মুখে কথিত হয় যে "দুলোল মল্লিকের দাপটে জঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বাঘে বলদে এক পাত্রে জলপান ক'রত।"

নীলকর সওদাগর ও স্থানীয় জমীদারের অত্যাচারের প্রতিরোধে সেই রামদুলাল মল্লিক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষ বাসস্থানটী গুরুকে দান করিয়া হাওড়া, দক্ষিণ বাঁাটরায় সামান্য জমী লইয়া অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিতে করিতে বিধবা পত্নী ও পুত্র রামতারককে রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। পিতার সুতা ও কাপড় সরবরাহের ব্যবসায়ের অবলম্বনে দিন যাপন করিতে করিতে পুত্র শম্ভুচরণকে রাখিয়া রামতারক মল্লিক মহাশয়ও অনন্তধামে প্রয়াণ করেন

কলিকাতা সহরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ায়—সে সময় মফঃস্বলের তন্তুবায়-গণ কলিকাতায় আসিয়া সূতা খরিদ করিতে আরম্ভ করায় শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় পূর্ব্বপুরুষের সূতার ব্যবসায় বন্ধ করিয়া উক্ত দক্ষিণ বাঁাটরা বাটীতে চালাঘরে সামান্যভাবে কাপড়, গুড় ও মুদিখানার কাজ আরম্ভ করেন।

তিনি একজন ধর্ম্মানুরক্ত সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। শম্ভুচরণের প্রথমা পত্নীর অতি অল্প বয়সেই মৃত্যু হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ১২৭৪ সালের ১৭ই আশ্বিন তারিখে ধরণীধর মল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

ইহারা বৈশ্যবর্ণান্তর্গত তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। শম্ভুচরণের দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি আপনার কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। একমাত্র পুত্র

ধরণীধর যাহাতে সুশিক্ষিত হয়—এ বিষয়ে তিনি প্রথম হইতেই যত্নবান ছিলেন। দোকানের কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বালক ধরণীধরকে সমগ্র শুভঙ্করী ও বাঙ্গালা বোধোদয় পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি আটবৎসর বয়সে পুত্রকে হাওড়া পঞ্চাননতলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।

পুত্রবৎসল বৃদ্ধ শম্ভুচরণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই পুত্রবধূ দেখিয়া সুখী হইবেন, এই আশায় মাত্র একাদশবর্ষ বয়সে পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। পুত্রের বিবাহের পর কয়েক মাসের মধ্যে শম্ভুচরণের মৃত্যু হয় এবং ধরণীবাবুর পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। এই অল্প বয়সে—জীবনের এই ঘাত প্রতিঘাতে—বালক ধরণীধর বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হইতেই ধরণী বাবুর ও সংসারের সমস্ত ভার মাতা সুখদাময়ীর উপর পতিত হয়। পুত্রের লেখাপড়ার উপর বিশেষ জেদ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লেখাপড়া হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

ধরণীবাবুর ছাত্রজীবন বড়ই কষ্টের ছিল। স্কুলে তিনি ফ্রী পড়িতেন। পাঠ্যপুস্তকগুলি স্থানীয় ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইত। এই সময় দোকানটির পরিচালক অন্য কেহ না থাকায়—জননী দোকানের সকল কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু ধরণীবাবুকে প্রত্যহই মাথায় করিয়া মুড়ির মোট কলিকাতায় পাইকারী খরিদ্দার দোকানদার-গণের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইত এবং ফিরিবার সময় দোকানের জিনিষপত্রগুলি কিনিয়া মাথায় করিয়া আনিতে হইত; তারপর তিনি স্কুলে যাইতেন।

তাঁহার স্বভাব চরিত্র অতিশয় শিষ্ট ছিল—পাঠে কখনও অবহেলা ছিল না। যে অধ্যবসায় ফলে ধরণীবাবু ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, ছাত্রজীবনেও তাহা পরিস্ফুট ছিল। তিনি যেটি ধরিতেন সেটী কখনও ছাড়িতেন না।

তাঁহার বন্ধুবর্গ বলেন "ধরণীকে আমরা সর্ব্বদাই আনন্দিত দেখিতাম। এত দুঃখ ও কষ্টে আমরা কখনও তাহাকে মলিন দেখি নাই। প্রসন্নতা তাহার চরিত্রের একটী উল্লেখযোগ্য গুণ।"

ধরণীবাবু চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়। সাংসারিক আর্থিক দুরবস্থা তাঁহাকে আর শিক্ষাপথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই।

ধরণীবাবু যখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ঠিক সেই সময়েই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাননতলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। ধরণীবাবু ঐ পদে মাসিক ছয় টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। স্কুল পরিচালনার অধিক কার্য্যই ধরণীবাবুকে নিষ্পন্ন করিতে হইত। তিনি ছাত্রগণকে গণিত শিক্ষা দিতেন। তিনি যখন প্রথম মাষ্টারীতে নিযুক্ত হন তখন তাঁহার বয়স যদিও অল্প ছিল, তথাপি তাঁহার এরূপ গাম্ভীর্য্য ছিল যে ছাত্রেরা কিছুতেই অবাধ্য হইতে পারিত না, বরং সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় করিত। ধরণীবাবুও ছাত্রগণকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিসে ছাত্রগণের মঙ্গল হয় এবং স্কুলটীর ভিত্তি সুদৃঢ় হয়—এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল। অবকাশের সময় ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রায়ই কলিকাতার দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিতে যাইতেন। অধিকাংশ ছাত্রই সকালে এবং সন্ধ্যাকালে ধরণীবাবুর বাটিতে পড়িতে যাইত; তিনি অনেককেই বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতেন। ছাত্রসমাগম এত বেশী হইত যে -- ধরণীবাবুর বাটী যেন একটী পাঠশালা হইয়া উঠিত। দুঃস্থ ছাত্রগণকে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন, কোনও ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকের অভাব হইলে প্রায়ই নিজ অর্থে তাহা ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং কখনও বা অর্থাভাবে পুস্তকের অনুলিপি স্বহস্তে লিখিয়া দিতেন। এমত অর্থাভাব সত্ত্বেও তিনি কয়েকটী ছাত্রের ভরণপোষণের সাহায্য পর্য্যন্ত করিতেন। এই সকল কারণে ছাত্রগণ তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি

করিত। এই সময় হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'ধরণী মাষ্টার' নামে পরিচিত হন।

ধরণীবাবু অধ্যাপনা কার্য্যে ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকগণের নিকট এতই প্রিয় ও বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি ইংরাজী না জানিলেও ছাত্রগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হন, এবং তাঁহারও ছাত্রগণের উপর এরূপ একান্ত স্নেহ ছিল যে, কেবলমাত্র এই কারণেই তিনি বাটীতে ফাষ্টবুক হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন। এই সময়েই তিনি ফাষ্টবুক্ অফ্ রিডিং এর অর্থপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র বাঙ্গালা শিখিয়া শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে ফাষ্টবুক পড়িবার উপযুক্ত অর্থপুস্তক ধরণীবাবু প্রথম প্রণয়ন করেন; তাঁহার পূর্ব্বে ঐ প্রকার অর্থপুস্তক ছিল না। ধরণীবাবুর চেষ্টায় পঞ্চাননতলা স্কুল হইতে উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা দিবার প্রথম ব্যবস্থা হয়।

এই সময় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বিশেষরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেক্রেটারী মহাশয় স্কুলটীর উন্নতিকল্পে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন, কিন্তু স্বাধীনহৃদয়, ধরণীবাবু ঐ সকল নিয়মের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে পারেন নাই। যিনি ভবিষ্যতে স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা আপনার উন্নতির পথ প্রসারিত করিবেন, তাঁহার পক্ষে পরাধীনতা নিশ্চয়ই যে কষ্টকর তাহা বলা বাহুল্য। তাহা ছাড়া এই সময় তিনি ২৲ দুই টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট আবেদন করেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। এই সমস্ত কারণে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া এবং জেদের বশে—পঁচিশ বৎসর বয়সে ঐ মাষ্টারী পদ ত্যাগ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাধীন কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। পূর্ব্বোক্ত মাষ্টারী পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় ১৯ বৎসর বয়সে তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন, এই দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার মৃত প্রথমা পত্নীর সহোদরা। বিবাহের দুই বৎসর পরে ধরণীবাবুর মাতৃবিয়োগ হয়।

উপরোক্ত মাষ্টারীপদ ত্যাগ করিয়াই দক্ষিণ ব্যাঁটরা পঞ্চাননতলা রোডে, "সাউথ ব্যাঁটরা মাইনর স্কুল" নাম দিয়া তিনি একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ স্কুলটী সাধারণের নিকট 'ধরণী মাষ্টারের স্কুল' নামে পরিচিত হয়। এই স্কুল স্থাপনই তাঁহার জীবনের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য স্বাধীন কার্য্য। একজন নিঃস্ব দরিদ্রসন্তান—ছয় টাকা বেতনের মাষ্টারের পক্ষে এ কার্য্য যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু দরিদ্রতা সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ধরণীবাবুর অটল অধ্যবসায় ও বিপুল পরিশ্রম সকল বাধাকেই অতিক্রম করিয়াছিল; তাঁহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ এই স্কুল স্থাপন কার্য্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রায় ক্ষীরদাপ্রসাদ পাল বাহাদুর স্কুল স্থাপনাকার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। স্কুলটী রায় বাহাদুরের একটী খোলার ঘরে স্থাপিত হয়, তিনি ইহার জন্য ভাড়া লইতেন না। স্কুল পরিচালন কার্য্যে তিনি সুখ্যাতির সহিত সিদ্ধিলাভ করায় এই সময় হইতেই তাঁহার অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ধরণীবাবু স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে সাহিত্য পড়াইতেন; তাঁহার স্বরের গাম্ভীর্য্য ও শিক্ষাপ্রণালী এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে—স্কুলের সম্মুখে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া অনেকেই তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিতেন। যাহার মুখনিঃসৃত স্বরলহরী একদিন ধ্বনিত হইয়া ছাত্রগণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিত ও পার্শ্বস্থিত পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—সেই স্বরতরঙ্গের মৃদু কম্পন বৈজ্ঞানিকের চক্ষে আজও আকাশের সূক্ষ্ম অংশে লীন আছে—কিন্তু তিনি আজ কোথায়?

স্কুল পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরলোকগত উপরোক্ত রায় বাহাদুরের কাষ্ঠ ব্যবসায়ে যোগদান করেন। অচিরেই তিনি ব্যবসাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। রায় বাহাদুর বরাবরই তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং 'মাষ্টার মহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন। রায়

বাহাদুরের নিকট প্রায় এক বৎসর কাল চাকুরী করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই সময়ে সকল দিক রক্ষা করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে এবং বিশেষতঃ রায় বাহাদুর তাঁহার প্রদত্ত গৃহ হইতে স্কুলটীকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করায়, স্কুলটী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। ধরণীবাবু নিজে প্রায় সাত বৎসর কাল স্কুলটীর পরিচালনা করিয়াছিলেন।

এই সময় ধরণীবাবু আপন পুত্রের গৃহ শিক্ষকতা কার্য্যে জনৈক শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাকেই উক্ত স্কুলটী পরিচালনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। ধরণী বাবুর অনুরোধে ও সহায়তায় স্কুলটী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়রূপে উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। পরে তাঁহার অক্ষমতা জন্য ইং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধরণীবাবুর বংশধরগণ উক্ত শিক্ষালয়ের পরিচালন ভার লইয়াছেন এবং ধরণীবাবুর বিধবা পত্নীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে 'গঙ্গা দেবী প্রতিষ্ঠান' নামে উক্ত স্কুলের বালিকা বিভাগও হইয়াছে।

স্বাধীন ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য, ধরণীবাবু তাঁহার হৃদয় নিহিত পুরুষোচিত সমস্ত বৃত্তিগুলির প্রবল পরিচালনা করেন। মাত্র ষোল টাকা মূলধন লইয়া তিনি ব্যবসাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সময়ে অধিক টাকার প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার শ্যালক স্বর্গীয় ভূষণচন্দ্র পাল মহাশয়ের ১নং মীরবহর ঘাট ষ্ট্রীটস্থ দোকান হইতে হাওলাত লইতেন। ঐ দোকান ঘরেই প্রায় চারি বৎসরকাল তাঁহার অর্ডার সাপ্লাই কার্য্যের অফিস ছিল। এই সময়ে রায় বাহাদুরের প্রতিযোগী কাষ্ঠ ব্যবসায়ী স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। বস্তুতঃ গিরীশবাবুর সাহায্য ধরণী বাবুর উন্নতির একটী সোপান। এজন্য তিনি আজীবন গিরীশবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ধরণীবাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততা, অর্থের অসচ্ছলতা নিবন্ধন ব্যবসা

ক্ষেত্রের সকল অসুবিধাই দূর করিয়াছিল। অচিরেই তিনি মহাজনদিগের নিকট এরূপ বিশ্বস্ত হইয়া উঠেন যে তাঁহার প্রয়োজনমত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই মহাজনেরা ধারে ছাড়িয়া দিতেন। অর্ডার সাপ্লাইএর কার্য্য চারি বৎসর করিবার পর তিনি কাষ্ঠের ব্যবসায়ের উপর বিশেষরূপ নির্ভর করেন। কাষ্ঠের ব্যবসাটীকে উন্নত করিবার নিমিত্ত তিনি হাওড়া পঞ্চানন-তলার রোডে অফিসটী উঠাইয়া আনেন এবং ঐ সময় হইতে ব্যবসাটীরও ক্রমশঃ উন্নতি আরম্ভ হয়।

প্রথমে তিনি কলিকাতাস্থ মহাজনদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়া অফিস অঞ্চলে সরবরাহ করিতেন। ব্যবসাটী কিছু কাল এইরূপ চালাইয়া তিনি কটক, নাগপুর ও আসাম মোকাম হইতে কাষ্ঠ আমদানী আরম্ভ করেন। এখনও নাগপুর ও কটকে তাঁহার ডিপো আছে। তিনি কলিকাতার প্রায় সমস্ত বড় বড় অফিসেই কাষ্ঠ সরবরাহ করিতেন। অফিসের পরিচালক সাহেবগণ তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন,—অনেকেরই সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। পোর্ট কমিশনারের ষ্টোর কিপার—মিঃ টি, জে, পণ্টুন্ তাঁহার নিকট হইতে সখ করিয়া বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন। পণ্টুন্ সাহেবের চেষ্টায় তাঁহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। ধরণীবাবু ব্যবসা ক্ষেত্রে ডি, মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ পনের বৎসর কাল এই ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল; ইতিমধ্যে তিনি লৌহের ব্যবসাও আরম্ভ করেন।

ধরণীবাবু ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। পিতামাতার এবং দেব দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্রতিমা পূজার উপর তাঁহার আকাঙ্খা দৃষ্ট হয়। বাল্যকালে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময় তিনি একটী অতি ক্ষুদ্র প্রতিমা আনয়ন করিতেন। প্রতিমার মূল্য দুই আনার অধিক হইত না। তাঁহার আর্থিক অবস্থা একটু উন্নত

হইবার পর—গত ১৩০৯ সাল হইতে প্রতি বৎসর তিনি বাটীতে দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা পূজা আনিতেন; তাঁহার বাটীতে রাস ও দোলযাত্রাও হইত। তাঁহার পূজার একটু বিশেষত্ব ছিল। ভদ্রলোকদের পরিতৃপ্তির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন, দরিদ্র ভোজনে তদপেক্ষা অধিক আনন্দলাভ করিতেন। কাঙ্গালীভোজন তাঁহার পূজার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। ধরণীবাবু শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; অথচ দেবীপূজায় তাঁহার বাটীতে কোন প্রকার বলি হইত না। আমরা যাহাকে স্বদেশীভাব বলি তিনি তাহার বিশেষ পোষক ছিলেন এবং যতদূর সম্ভব দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। প্রতিমার অঙ্গে বিলাতী সাজের পরিবর্ত্তে মৃণ্ময় অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, ক্রমশ: তিনি রৌপ্য ও স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নাট্যকলা ও বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পঞ্চাননতলা স্কুলে যখন তিনি মাষ্টারী করিতেন, সেই সময়ে সখের যাত্রা ও থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। রাবণবধের পালায় রাবণ ও সিন্ধুবধের পালায় মন্ত্রীর অংশ অভিনয় করিতেন। হরিধনবাবু বলেন, "আমি ধরণীর অভিনয় দেখিয়াছি, অভিনয়কার্য্যে তাহার বিশেষ দক্ষতা ছিল।"

বঙ্গভাষার প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আস্থা দেখা যায়। ছাত্রজীবনে—পিতা শম্ভুচরণের দোকানে অবকাশ পাইলেই তিনি রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার পঠনপ্রণালী এত সুন্দর ছিল যে, তৎকালীন বৃদ্ধরাও বালক ধরণীর পাঠ শুনিতে সমবেত হইতেন। তাঁহার যে সময় পঞ্চাননতলা রোডে স্কুল ছিল সেই সময়ে তিনি "কবিতা কোরক" নামে একখানি স্কুলপাঠ্য কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির স্থান উচ্চে না হইলেও তিনি যে উদ্দেশ্যে পুস্তকটীর রচনা করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে সফল হইয়াছিল।

পুস্তকখানির আভাস দিবার নিমিত্ত তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বালকগণকে বিনয়ী হইবার জন্য তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন :—

বিনয় শিখাতে তরু ফলভরে নত।
দেখ নদী নীচ দিকে হইতেছে গত॥

এই লেখার সহিত তাঁহার চরিত্রগত বিশেষ সাদৃশ্য ছিল, তিনি কখনও কাহারও সহিত উচুমাথায় কথা কহিতেন না। আর একস্থলে লিখিত আছে যে :—

সমানে সমানে সদা প্রণয় রাখিবে।
নীচ জনে দয়া আর স্নেহ দেখাইবে॥

বলা বাহুল্য ধরণীবাবুর বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যদিও "নীচ জনে দয়া আর স্নেহ" দেখাইবার জন্য স্থায়ী কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার নীচজনে দয়া ও স্নেহের অভাব ছিল না। তিনি যে অনেকগুলি দুঃস্থ ছাত্রের বিদ্যা-শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের সাহায্য করিতেন একথা পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করিতেন।

জননীর প্রতি তাঁহার যে কিরূপ ভক্তি ছিল তাহা এই লেখাটুকু পড়িলে বুঝা যায় :—

এ জগতে কেহ মার, শুধিতে কি পারে ধার,
ভক্তিভরে শত বার, বল মুখে মা আমার।

পিতৃসেবা যে কতদূর পুণ্যকর্ম্ম তাহা বালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্য একস্থলে লিখিয়াছেন :—

তপ, জপ, ব্রত ধর্ম্মে যত পুণ্য আছে।
এ সব নহেক তুল্য পিতৃ সেবা কাছে॥

দুঃখের বিষয় মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি এই পুণ্য কর্ম্মের সম্যক ফলভাগী হইতে পারেন নাই।

ধরণীবাবু বিষয়ী লোক ছিলেন। সময় যে কতদূর মূল্যবান তাহা তিনি বুঝিতেন। ইংরাজীতে যাহাকে Punctuality বা দৃঢ় নিয়মিতা বলে ধরণীবাবুর তাহা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলেন, "ধরণী যখন আমাদের স্কুলে ছয় টাকা বেতনে মাষ্টারী করিত—তখনও তাহার নিকট সর্ব্বদাই একটী ঘড়ি দেখিতাম। ধরণী বলিত যে একটী ঘড়ি না রাখিলে যথা সময়ে সকল কাজ করা যায় না।" সময় সম্বন্ধে তিনি কবিতা-কোরকে একস্থানে লিখিয়াছেন :—

সময় অমূল্য ধন শুন দিয়া মন,
বৃথায় ক্ষণেক তার ক'রনা যাপন।

তাঁহার এই উপদেশ অন্যে পালন করিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তিনি স্বয়ং এই নীতি পালন করিয়া শেষ জীবনে সুখী হইয়াছিলেন।

তিনি ক্রোধ সম্বন্ধে একস্থলে লিখিয়াছেন :—

ক্রোধ পরিহার কর অনিবার
হয়োনা ক্রোধের দাস।
নাহি পাবে সুখ ঘটে চির দুঃখ
ক্রোধে করে সর্ব্বনাশ॥

ছাত্রগণকে যদিও এই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ক্রোধের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। তাঁহার সহযোগী শিক্ষক শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে মহাশয় বলেন,—"ধরণীবাবুর স্বভাব চরিত্র অতিশয় নির্ম্মল ছিল, কিন্তু তিনি জেদী ছিলেন—তিনি যেটুকু ঠিক বলিয়া মনে করিতেন তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে রাগিয়া

যাইতেন।" তাঁহার অশেষ গুণরাশি এই সামান্য দোষটিকে সাধারণের চক্ষে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। লোকে বলিত, ধরণীবাবু বড় রাসভারি।

তিনি ঐ সময়ে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অর্থাভাবে সেগুলি প্রকাশিত করিতে পারেন নাই। হরিশ্চন্দ্র, ধ্রুব, প্রহ্লাদচরিত, নামক তাঁহার লিখিত পুস্তক তিনখানির জীর্ণ হস্তলিপি আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এইস্থানে একটী আক্ষেপের কথা না বলিয়া থাকা যায় না। তাঁহার আর্থিক অবস্থা যখন অসচ্ছল ছিল, তখন তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় সবিশেষ নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু উক্ত অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে চর্চ্চা কমিয়া আসে।

সাধারণতঃ লোকে যাহা চায় ধরণীবাবুর ভাগ্যে সে সমস্ত ঘটিয়াছিল। পিতৃমাতৃবিয়োগ-জনিত শোক ভিন্ন তিনি জীবনে উল্লেখযোগ্য অন্য কোন প্রকার শোক প্রাপ্ত হন নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি পূজাদি ক্রিয়া কলাপের দ্বারা সংসারের সকল সুখই লাভ করিয়াছিলেন।

দেশভ্রমণে তিনি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেন, সময় পাইলে তিনি মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রাও করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দরিদ্রগণের সহিত বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিতেন। ব্যবসায়ের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায়ই কটক যাইতে হইত, তথায় তাঁহার খ্যাতি এরূপ ছিল যে মল্লিক বাবু আসিয়াছেন শুনিলে তাঁহার বাসার সম্মুখে অনেক দরিদ্রের সমাগম হইত। তিনি তাহাদিগকে যথাসাধ্য অর্থ ও আহার্য্য দানে পরিতৃপ্ত করিতেন।

বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর কাল তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শেষ দেড়বৎসর কাল কাজ কর্ম্ম বিশেষ কিছু দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি কুটুম্ব

ও বন্ধু বান্ধবগণের সমস্ত সংবাদ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকিতেন। আত্মীয় কুটম্বগণের সহিত তাঁহার যেরূপ আন্তরিকতা ছিল, এরূপ অল্পই দেখা যায়।

চিকিৎসকের চেষ্টা, ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়ন ও আত্মীয় স্বজনের কাতর প্রার্থনা তাঁহার রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় বায়ু পরিবর্ত্তনে রোগের উপশম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কাশীধামে প্রায় একমাস কাল ছিলেন; যখন কাশী হইতে হাওড়ার বাসবাটীতে পুনরায় প্রত্যাগমন করেন তখন তাঁহার জীবনের আর কোনও আশা ছিল না। কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সাংসারিক সকল বিষয়ে যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করেন। মৃত্যুর প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার একটী বিবাহযোগ্যা কন্যার বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া সাংসারিক ভার অনেকটা লাঘব করিয়া গিয়াছেন।

কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রায় একমাস কাল তিনি জীবিত ছিলেন। "কেমন আছেন" একথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতেন —"থাকাথাকি আর কি—মার যা ইচ্ছা পূর্ণ হবে!" সত্যই মার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল, মা আপনার আদরের সন্তানকে বুকে তুলিয়া লইলেন। সন ১৩২১ সাল ৪ঠা পৌষ আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বেলা দেড় ঘটিকার সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমারের মুখে তারকব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে এবং তাঁহারই হস্তস্থিত একখানি দুর্গাদেবীর চিত্র দেখিতে দেখিতে তিনি অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী, পাঁচটী পুত্র, ছয়টী কন্যা, একটী পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে চারিদিকে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও কোন স্থানে এক কপর্দ্দক ঋণ রাখিয়া যান নাই।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মল্লিক স্বদেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

ধরণীবাবুর বংশ-লতা।

কাশ্যপ গোত্র।
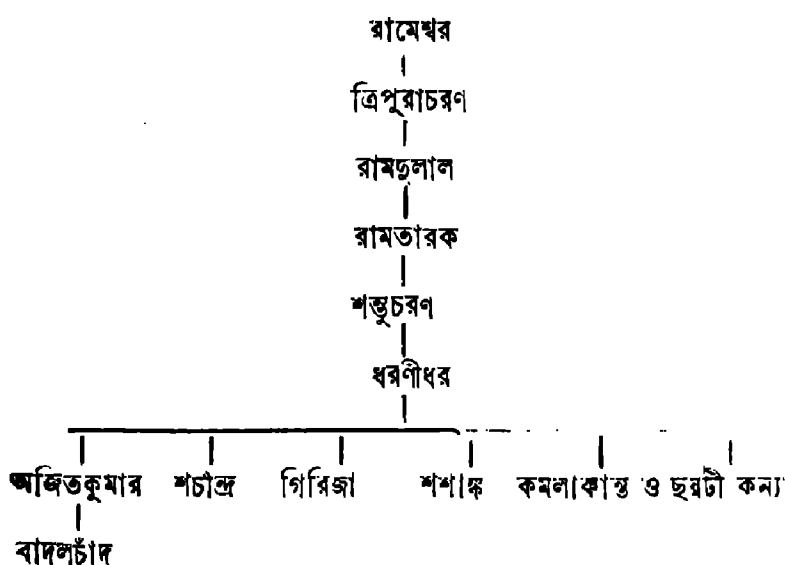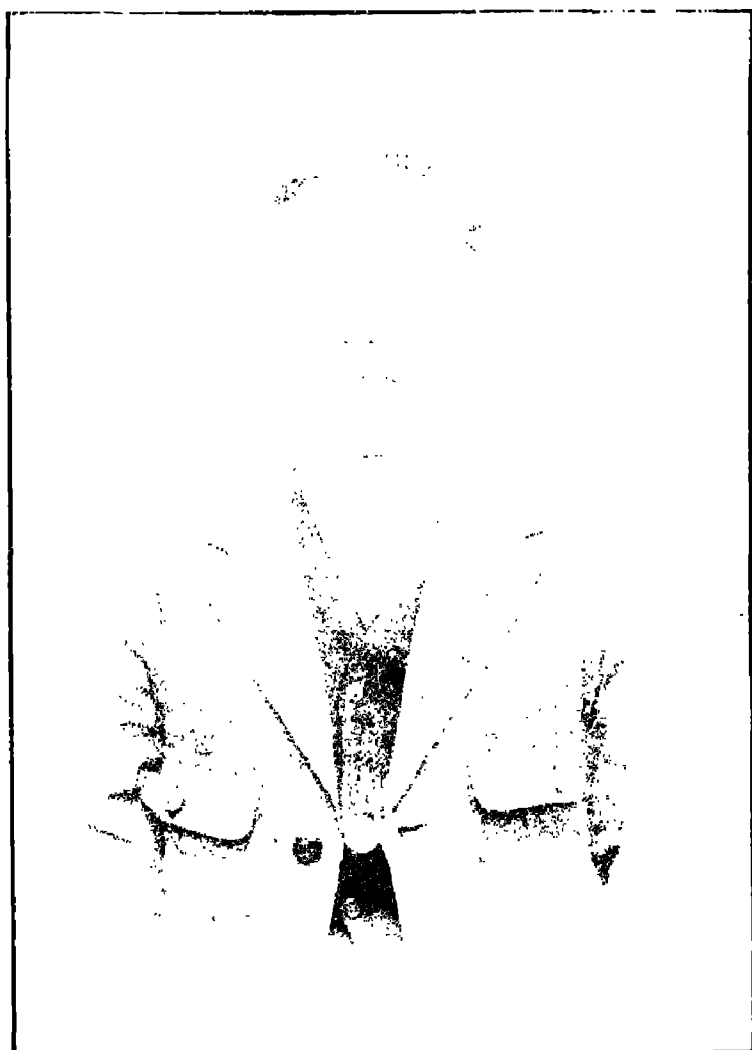
শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার সেন

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন।

"Full many a gem of Purest ray serene
The dark unfathomed cover of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air."

বিশ্বনিয়ন্তার রহস্যময় সৃষ্টি কৌশলে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রতিনিয়ত লীলাময়ের কত লীলা অভিনয় হইতেছে, ক্ষুদ্র মানব, আমরা তাহার গূঢ় রহস্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি! কোথায় কাহার ইঙ্গিতে ঐ অনন্ত, অতল, সুনীল জলধির উচ্চবীচি মালা বিদীর্ণ করিয়া শস্যশ্যামল নয়নাভিরাম দ্বীপাবলী কেমন দর্পভরে সমুদ্র শাসন করিতেছে, আবার কোথায় কাহার ভ্রূকুটীতে ঐ সৌধ কিরীটিনী সুরম্য নগরী জল বুদবুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইতেছে, কাহার ইচ্ছায় বারিধির বুকে জোয়ার ভাটা, অমানিশার পর পৌর্ণমাসী, নিদাঘের পর বরিষার ধারা, শীতের পর বসন্তের মলয়ানিল, রাজার ভবন বিজন কানন, আবার পথের কাঙ্গাল রাজাধিরাজ, আবার কাহার লীলায় রত্নাকরের গর্ভে হাঙ্গর কুম্ভীর, গোলাপের গায়ে কণ্টক, ফণিধরের মুখে হলাহল, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক; কর্ত্তব্যের পথে কণ্টক। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান প্রকৃতি, জাতি এবং ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া কত আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, কত বিপ্লব, কত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়, কত ভাঙ্গা গড়া নিত্য নূতন অভিনয় করিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে কত জাতি এবং ব্যক্তিবিশেষের উত্থান পতন হইতেছে, জার্ম্মাণীর বীরদর্পে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল, ব্রিটিশ সিংহের হুঙ্কারে জর্ম্মান কৈশর নির্ব্বাসিত হইল, ক্ষুদ্র জাপান সেইদিন দুনিয়ায় জন্ম নিল, রুস ভল্লুকের রক্তপানে জগতকে

স্তম্ভিত করিল, নেপোলিয়ানের বীর দর্পে ফরাসী রাজতন্ত্র চুরমার হইয়া গেল, চাণক্যের কূটনীতিতে নন্দবংশ ধ্বংস হইল, শিবাজীর কূটবুদ্ধিতে দিল্লীর মসনদ কাঁপিয়া উঠিল, আত্মহত্যায় ব্যর্থ প্রয়াস ক্লাইভের বীরদর্পে ভারতের বৃটিশ পতাকা উড়িতে লাগিল। ব্যষ্টি, সমষ্টি ও জাতির ইতিহাসে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এইরূপে প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হইতেছে। মহাপুরুষদের কর্ম্মের ধারা, বংশের মৌলিকতা, উত্থান পতন, জীবনসংগ্রাম ইত্যাদির পর্য্যালোচনায় জাতি ও বংশের লুপ্ত স্মৃতি জাগ্রত হয়, নৈরাশ্যপূর্ণ, অবসাদগ্রস্থ জাতির ভিতর একটা উচ্চাভিলাষ, একটা উন্মাদনা জন্মাইয়া দিয়া উন্নতির ক্রমোন্নত সোপানে তাহাদিগকে উন্নীত করে।

আজ আমাদের সহৃদয় পাঠক পাঠিকার করকমলে এক অমূল্য রত্ন প্রদত্ত হইতেছে, যে রত্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল, উদীয়মান প্রাতর্ভাস্কর রশ্মিতে বাঙ্গালার পূরব গগন আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, যে রত্ন বক্ষে ধারণ করিয়া প্রকৃতির লীলা ক্ষেত্রে সাগর মেখলা, কানন কুন্তলা, চট্টলা ধন্য হইয়াছে।

এই রত্নের নাম শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন। সমগ্র ভারতে আসাম ব্রহ্মদেশ হইতে সিংহল, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এমন কি সুদূর কাবুল পর্য্যন্ত বহির্ভারতে চীন, জাপান, মার্কিণ, ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মেণী প্রভৃতি জগতের সমস্ত সভ্যদেশে ব্যবসা প্রসঙ্গে তিনি "পি কে, সেন" নামে পরিচিত। তিনি একজন স্বাবলম্বী ও স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি উচ্চ বৈদ্যবংশ সম্ভূত, শক্ত্রী গোত্র, তিনি প্রবর দ্রোহসেনের ধারা। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বানীয়াভোগ গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা সকল সময়ে স্বাধীনজীবি ছিলেন। সে বহুদিনের কথা, চট্টগ্রাম তখন শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কানন, পার্ব্বত্য জাতির আবাসস্থল। মোগলের গৌরব-রবি যখন বাঙ্গালার পূর্ব্বগগন

যাত্রামণি সেন—পিতা। উমাতারা দেবী—মাতা

প্রসন্নকুমার সেন

আলোকিত করিয়া তুলিল, মোগলের বিজয় কেতন যখন বাঙ্গালার নগরে নগরে উড়িতে লাগিল, বহির্ব্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে চট্টগ্রাম বণিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিপথে পড়িল, পার্ব্বত্য জাতি সমূহ পলাইয়া গেল, চট্টলার বিজন কানন সুরম্য নগরীতে পরিণত হইল, দেশীয়, বিদেশীয়, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির সমৃদ্ধিশালী বিপণীতে পরিণত হইল, তখন প্রসন্ন বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ বিষয় কর্ম্মচ্ছলে তাঁহাদের আদি বাসস্থান যশোহর জেলা হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যবিধাতা চট্টগ্রামে সুপ্রসন্ন হওয়ায় তাঁহারা বোয়না, সারোয়াতলী, নয়াপাড়া, ফতেয়াবাদ, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে কালক্রমে বাসস্থান স্থাপন করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশের নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার হইতে লাগিল। চট্টগ্রামে পটীয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে অধুনা তাঁহাদের বংশের অনেক সমৃদ্ধিশালী বনিয়াদী বংশধরগণ বর্ত্তমান আছে। বৈদ্যবংশোচিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন কবিরাজী ব্যবসা প্রসন্ন বাবুর বংশের একটা বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবসায়ের জন্যই তাঁহারা সুদূর যশোহর হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর জ্যেষ্ঠ তাত স্বর্গীয় নিত্যানন্দ সেন মহাশয় ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহরে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী (Jeweller) ছিলেন। ফতেয়াবাদ গ্রামে তাঁহার অপরিসীম ধন দৌলতের কথা এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রসন্ন বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় রাজবল্লভ সেন দৌহিত্র সূত্রে প্রভূত ধন সম্পদের মালিক হইয়া ফতেয়াবাদ হইতে গুজরাগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গুজরার অন্য নাম নয়াপাড়া, কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের জন্মভূমি। সেই দিনের কথা; স্বর্গীয় রাজবল্লভ সেন নয়াপাড়ার নূতন অধিবাসী, তখন কবিবর ৺নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ভাববন্যায় বাঙ্গালার নগর পল্লী প্লাবিত হইতেছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ মদিরায় বাঙ্গালায় নূতন বাতাস বহিতেছিল। ৺রাজ বল্লভ সেন প্রভূত প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী, তদুপরি নূতন বাসিন্দা, তাঁহার মাথা

ঘুরিয়া গেল, বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। সুযোগ বুঝিয়া স্বার্থান্বেষীরা স্ব, স্ব, স্বার্থ সিদ্ধি করিতে লাগিল। তিনি প্রভূত ঋণ জালে জড়িত হইলেন, নানা মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইলেন। নিজ কর্ম্মদোষে সুশাসনের অভাবে ঋণের দায়ে প্রভূত ভূসম্পত্তি স্বল্পমূল্যে লাট নিলাম হইয়া গেল। পরিশেষে তিনি একমাত্র পুত্র স্বর্গীয় যাত্রামণি সেনকে স্বকৃত প্রভূত ঋণ জালে আবদ্ধ রাখিয়া ১৮৮৭ খৃঃ ১০ই আগষ্ট ললিতা সপ্তমী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। স্বর্গীয় যাত্রামণি সেন মহাশয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট তারিখে গুজরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর ন্যায় তখন গ্রামে গ্রামে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ইত্যাদি ছিল না, গুরুমহাশয়ের গ্রাম্য পাঠশালাতেই তাঁহার শিক্ষা জীবন সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎপর তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন এবং নিজ গ্রামে থাকিয়া কবিরাজী ব্যবসা করিতে লাগিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, ৺শ্যামামায়ের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি মন্ত্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রবলে এবং স্বীয় মুষ্টিযোগের প্রভাবে তিনি শুধু দৈহিক নহে, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রোগ ইত্যাদিও আরোগ্য করিতে পারিতেন। মন্ত্রবলে বিষধর ভুজঙ্গও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বশীকরণ চিকিৎসাদির কথা এখনও প্রবাদের ন্যায় দেশবাসীর মুখে শ্রুত হয়। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে সুখে দুঃখে ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইত না, প্রশান্ত বারিধির ন্যায় সৌম্য, শান্ত ও হাস্যময় ছিল—তাঁহার মূর্ত্তি। দরিদ্র হইলেও তিনি পরোপকারী ছিলেন, পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। কত রোগক্লিষ্ট নিঃসহায় তাঁহার দয়ায় প্রাণ দান পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভগবান বুঝি ধর্ম্মের অগ্নি পরীক্ষা করিবার জন্যই মানুষকে বিপদে

সেন মহাশয় কারখানায় যাইতেছেন।
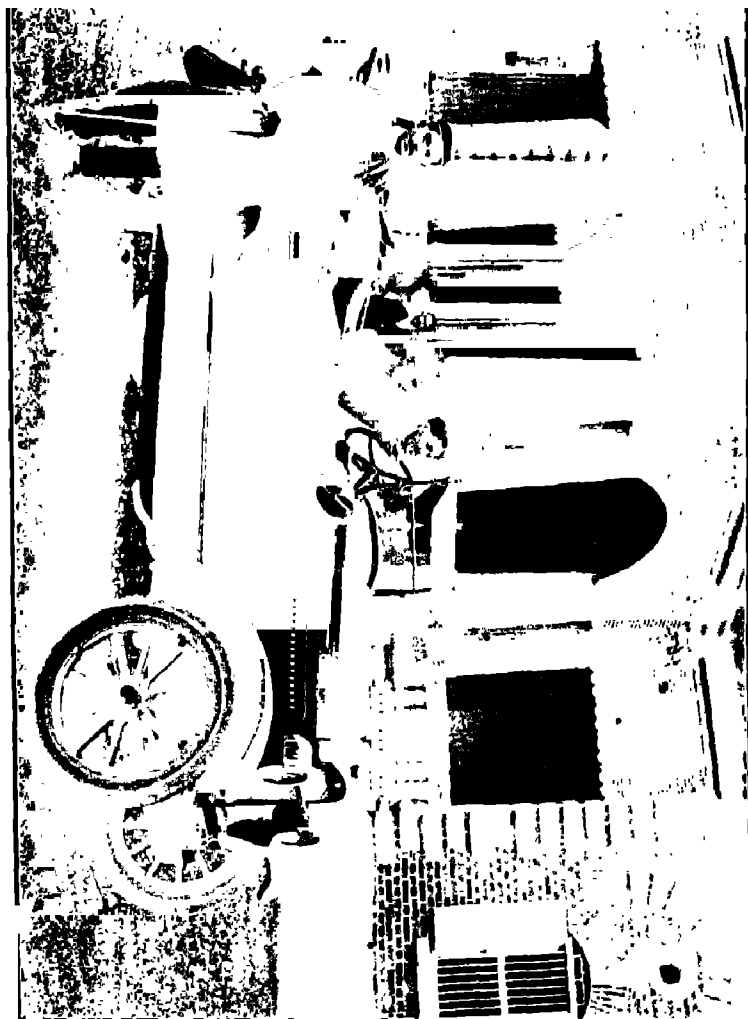
ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও ৺যাত্রামণি সেনের পরোপকারিতা ও মহাপ্রাণতা সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই আজ গৃহে অন্ন নাই, পুত্র কন্যা ক্ষুধায় আকুল, তদুপরি ঋণের দায়, মহাযম মহাজন আসিয়া বাড়ীতে হাজির, ভূসম্পত্তি যাহা ছিল সব নিল, শেষে বাস্তু ভিটা নিয়া টানাটানি, ঘরের দরজা কণ্টকময়, খেরা দিয়াও মহাজনগণ সন্তুষ্ট হইল না, যমদূতের ন্যায় আরক্ত লোচনে কত কি শাসাইল। কিন্তু তিনি নির্ব্বিকার পুরুষ, হিমাচলের ন্যায় অটল, কি এক শক্তিতে তিনি শক্তিমান। পাশেই দেবিরূপিণী শক্তি পত্নী উমাতারা। বুঝি, মা ৺ভবানী তাঁহার সন্তানগণকে বিপদে অভয় দিবার জন্যই নিজেই কখন মাতৃরূপে, কখন স্ত্রীরূপে, কখনও বা কন্যারূপে প্রভৃতি নানা শক্তিতে অবতীর্ণা হন। এই উমাতারাও যেন সাক্ষাৎ "উমা" রূপেই অবতীর্ণা। এই সাধ্বী, ধর্ম্মশীলা, বুদ্ধিমতী মহিলার অসাধারণ শক্তিতেই, ৺যাত্রামণি সেন শক্তিমান ছিলেন। বিপদে হতাশ না হইয়া তিনি বরং স্বামীর উৎসাহ বর্দ্ধনই করিতেন। এই অভাবের মধ্যেও তিনি তাঁহার বার্ষিক দোল দুর্গোৎসব বার মাসের তের পার্ব্বণ সমস্ত বজায় রাখিতেন। দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহার আতিথেয়তা প্রশংসনীয়। কোনও অতিথি যে কোন সময়ে তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হয় নাই। কত অনাথা তাঁহার আশ্রয় পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি করুণাময়ী, তাঁহার স্বামীভক্তি অতুলনীয়, তাঁহার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। যাত্রামণি সেন মহাশয় এইরূপে যখন দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছিলেন, শেষ জীবনে যখন ২য় পুত্র প্রসন্নবাবুর সৌভাগ্য-রবি উদিত হইতেছিল, তখন এক দিবস তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৬ মাস পূর্ব্বে সুস্থ অবস্থায় তিনি কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কত ঘণ্টার সময় কি অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করিবেন এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটিবে তাহা পরিবারস্থ সকলকে বলিয়া

রাখেন এবং ঠিক সেই তারিখেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই সোমবার কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথিতে স্বীয় পল্লীভবনে ভাগবত গীতা শুনিতে শুনিতে দিবা ১ ঘটিকার সময় ৫৬ বৎসর বয়সে পূর্ব্বকথিত অবস্থায় সতীসাধ্বী পত্নী উমাতারা দেবী, তিন কন্যা ও ছয় পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া যাত্রামণি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কালীকুমার সেন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই জুন রবিবার কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মধ্য ইংরেজী পর্য্যন্ত অধ্যয়নকরতঃ বর্ত্তমানে প্রভূত যশের সহিত চট্টগ্রাম সহরে কবিরাজী ব্যবসা করিতেছেন। তিনি একজন ধর্ম্মভীরু ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। নানা শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নের আলোচনায়, শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে এবং সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ লাভে তিনি অপরিসীম আনন্দানুভব করেন। তিনি জনপ্রিয়, সরল, দয়ালু এবং উদার। মাতৃপিতৃ ভক্তি পরায়ণ কালীকুমার সেন তাঁহার পিতার ন্যায় গরীব দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন। সুখে দুঃখে তাঁহার সদা হাসি মুখ। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র শ্রীশ্রীপদকুসুম সেন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুন রবিবার কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীতে পড়িতেছেন। কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে প্রসন্ন বাবু স্বয়ং বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া চট্টগ্রামের বৈদ্যকুল শিরোমণি বিশ্ববিখ্যাত বৃটীশ রাজদূত স্বর্গীয় রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, চট্টগ্রামের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল দাসের সহিত মহাসমারোহে শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবীর শুভ বিবাহ দেন। এই বিবাহ যেরূপ

কর্ণফুলী তীরে

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনের গুদাম ও কারখানা

জাঁক জমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা চট্টগ্রামের একটী স্মরণীয় ঘটনা।

স্বর্গীয় যাত্রামণি সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র চট্টলার গৌরব, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর ১২৯১ সালের ১লা আশ্বিন মঙ্গলবার দিন মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। আদর্শ মাতা উমাতারা মাতৃরূপে দয়াবতী হইলেও পুত্রগণের শিক্ষায় ও শাসনে তাঁহার ক্রটী ছিল না। নানা প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও তিনি হতাশ হন নাই, বরং পুত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনই করিয়াছিলেন। তখন প্রসন্নবাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ভূসম্পত্তি সব গিয়াছে, তদুপরি প্রভূত ঋণ, তাঁহার কবিরাজী ব্যবসায়ের সামান্য উপার্জ্জনই পরিবারের একমাত্র সম্বল। অতি কষ্টে দিন চলিতেছে। আজ গৃহে অন্ন নাই, মাতা পুত্রকে আত্মীয়ের বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন, পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেতন দিতে অক্ষম, মাতা গুরুমহাশয়ের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক বোতল দুধ, কি অন্য খাদ্য বস্তু পাঠাইয়া দিতেন। চট্টলার গ্রাম্য বিদ্যালয়ে তখনও বিদ্যাসাগরী আমলের প্রথা প্রচলিত ছিল। মুদ্রার পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যাদির দ্বারাও ছাত্রের বেতন দেওয়া হইত, গুরুমহাশয়েরও অনুগ্রহ ও দয়া যথেষ্ট ছিল। তখন যে শিক্ষা হইত, যে গুরুভক্তি ছিল, এখন শতমুদ্রা বিনিময়েও তাহা দুর্লভ, এইরূপে মধ্য ইংরেজী স্কুলে প্রসন্নবাবুর শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার সেই গুরুমহাশয়ের দয়া এখনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই; সেই গুরুমহাশয় বর্ত্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সেন। গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ প্রসন্নবাবু এখনও উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে প্রতি বৎসর শত শত মুদ্রা ব্যয়ে গুরু দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রসন্নবাবু মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রাউজান উচ্চ ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অধ্যবসায়ী ও

মেধাবী ছিলেন। এই অধ্যবসায় বলে তিনি জীবনে বিশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া স্কুলের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অবৈতনিক ছাত্র (Fee-Student) রূপে গ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি গৃহে শিক্ষকের কার্য্য করিয়া অন্নের সংস্থান করিতেন। গৃহশিক্ষকের কার্য্য কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ এবং যিনি গৃহশিক্ষক রাখেন তাঁহার কিরূপ বিবেচনা শক্তি, অন্তরের উদারতা ও দূরদর্শীতার প্রয়োজন তাহা কয়জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? প্রসন্ন বাবু ছাত্রজীবনে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। যে বাড়ীতে শিক্ষকের কাজ করিতেন স্কুল হইতে তাহা প্রায় ৫ মাইল দূরে। প্রত্যহ পান্তা খাইয়া ৫ মাইল হাঁটিয়া প্রসন্নবাবুকে স্কুলে আসিতে হইত, মধ্যে মধ্যে লবণ সংযোগেও পান্তা খাইতে হইত। কারণ গৃহ শিক্ষকের জন্য এত সকালে পাক করে কে? স্কুল ছুটী হইলে পুনঃ দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি বাসাবাড়ীতে পৌঁছিতেন। তখন তাঁহার কলেবর পথপ্রশ্রান্ত, ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। কিন্তু গৃহস্বামী তখনও তাঁহাকে রেহাই দিতেন না, ছেলে পড়াইতে তাগাদা দিতেন; এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাকে শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যেও নিযুক্ত করিতেন। বৈকালে খেতে দিতেন—দুপুরের জল দেওয়া বাসী ভাত ও সামান্য শাকশব্জী তরকারী। এই ভাবে তিনি অনেক বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন, পরন্তু ইহাকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য মনে করিতেন। এইরূপে প্রসন্নবাবুর পাঠ্যজীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এত কষ্টের ভিতর দিয়াও তাঁহাকে ক্লাসে ১ম, ২য়, কি ৩য় স্থান অধিকার করিতে হইত, তা না হইলে অবৈতনিক ছাত্ররূপে স্কুলে থাকিতে পারিতেন না। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক (Examination course) খুব শক্ত ছিল, অর্থপুস্তকও তেমন ছিল না; দু' একটা থাকিলেও তাহা ক্রয় করিবার সামর্থ্য প্রসন্নবাবুর ছিল না। তাই তাঁহাকে অর্থ লিখিয়া

সেন মহাশয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও কার্পাস-রমণীগণ

পড়িতে হইত। তখন এণ্ট্রান্স্ শ্রেণীতে অনেক কঠিন অঙ্ক কষিতে হইত। প্রসন্নবাবু সাহিত্যে ও অঙ্ক শাস্ত্রে খুব নিপুণ ছিলেন, কেহ কখনও জটিল অঙ্ক না বুঝিলে তিনি তাহা সমাধা করিয়া দিতেন। রাউজান স্কুলে তিনিই "ছাত্র সম্মিলনীর" প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বেশ বক্তৃতা দিতে পারিতেন। এই সমস্ত কারণে শুধু ছাত্র মহলে নহে, শিক্ষক মহলেও তিনি "প্রসন্ন মাষ্টার" নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কালে যে তিনি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইবেন, ছাত্র জীবনে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চৈত্র মাসে চট্টগ্রাম "মহামুনি মেলা" নামে একমাস ব্যাপী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। একবার তিনি এই মেলায় স্ফূর্ত্তি খেলার দ্বারা বহুশত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ টাকা অপব্যয় না করিয়া তদ্দ্বারা জমি খরিদ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র জীবনে এইরূপ ব্যবসাবুদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

১৯০৫ সনে সমগ্র বঙ্গদেশে "স্বদেশী আন্দোলন" নামে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাঙ্গালার অনেক যুবক স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা, পৈতৃক ঋণের দায়, মহাজনের অত্যাচার, পরিবারের নিরূপায় অবস্থা তদুপরি স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রভাব; এই সমস্ত কারণে প্রসন্ন বাবু ১৯০৬ সনের অক্টোবর মাসে রাউজান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেন। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ তিনি গ্রামে গ্রামে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি যে স্থানে যাইতেন, প্রসন্ন মাষ্টারের নামে সেই স্থানে অনেক লোক আসিয়া জুটিত। একবার তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে প্রত্যহ অনেক লোকের সমাগম হইতেছিল। তাঁহার আত্মীয় তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলেন। তেজস্বী প্রসন্নবাবু

তাহা জানিতে পারিয়া অভুক্ত অবস্থায় দুপুরের সময় আত্মীয়ের বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। তিনি আর বাড়ী গেলেন না, বরাবর হাঁটিয়া জনৈক বন্ধুসহ সীতাকুণ্ড যাইবার মানসে চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যা, দুজনেই সহরে অপরিচিত, কিন্তু অসহায়ের সহায় ভগবান তাঁহাদের আশ্রয় ও অন্নের সংস্থান করিয়া দিলেন। চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স কৃষ্ণদাস অমরচান্দ রায়ের ডবলমুরিংস্থিত গদীতে প্রসন্ন বাবুর জনৈক ছাত্র চাকরী করিত, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা সেই গদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রে তথায় বিজয়া দশমী উপলক্ষে প্রীতি ভোজ ছিল; প্রসন্ন মাষ্টারের নাম শুনিয়া সেই গদীর ম্যানেজার বাবু স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় কোনও খাদ্যের অভাব হইয়াছিল না। পরদিন প্রাতে বন্ধুসহ প্রসন্নবাবু চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রসন্নবাবু কপর্দ্দকহীন, কথা ছিল তাঁহার বন্ধু তাঁহার টিকিট কিনিয়া দিবেন। কিন্তু উপযুক্ত সঙ্গী নিজের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, প্রসন্নবাবুর জন্য ছয় আনা পয়সা ব্যয় করিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রসন্নবাবু অশ্রুপ্লুত নয়নে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চটুল মায়ের ক্রোড়ে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সীতাকুণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন কেন? তাই তিনি পড়িয়া রহিলেন। চিন্তায় দেহ অবসন্ন, নিকটে এক দোকানের বারান্দায় তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, নিদ্রাদেবী আসিয়া অলক্ষ্যে তাঁহাকে কোলে লইলেন। ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দুপুর দুটা, ক্ষুধায় চিন্তায় অবসন্ন দেহ। ক্লান্ত কলেবরে তিনি অনতিদূরে নন্দন কাননে পূর্ব্ব পরিচিত জনৈক ভদ্রলোকের বাসা-বাটীতে উঠিলেন। ভদ্রলোকটী আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানীতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেইখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিস
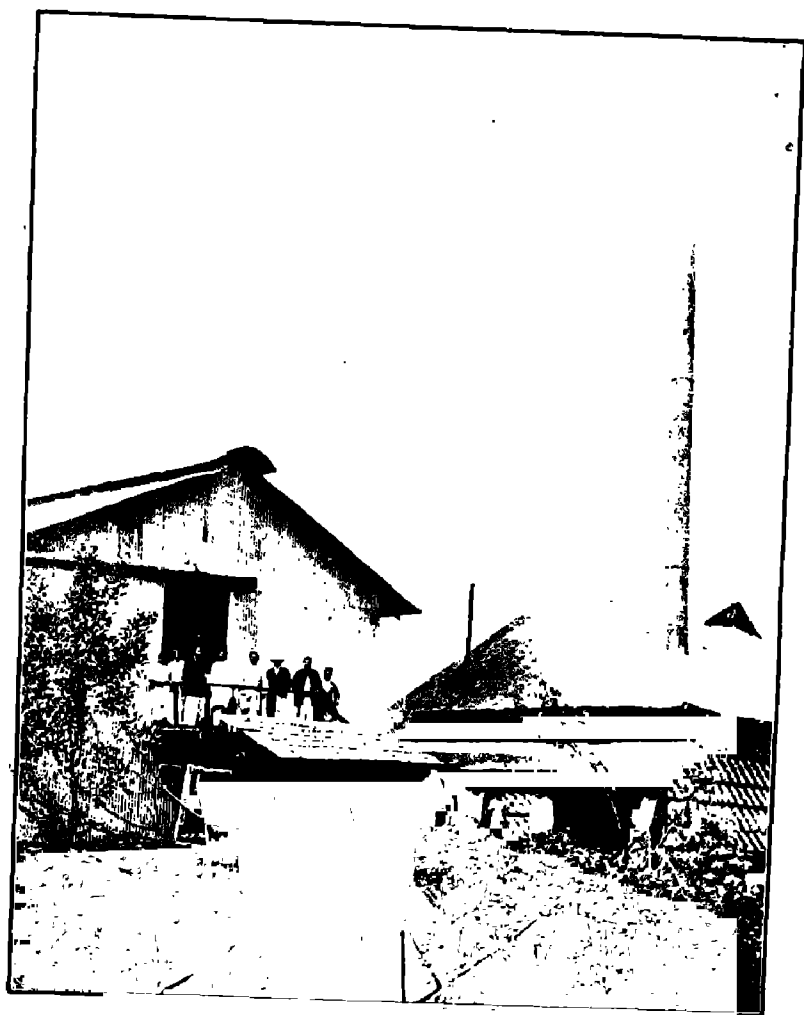
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনের
তুলাপেঁজার কারখানা ও তৈলের কল

সমূহে চাকরীর অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। সমস্ত আফিসে বিফল মনোরথ হইয়া পরিশেষে উপরোক্ত ভদ্রলোকের সাহায্যে তিনি রেল কোম্পানীতে মাসিক ১২৲ টাকা বেতনে এক চাকরী গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজের অগ্রণী ধনকুবের খান সাহেব আবদুল রহমান দোভাষীর সহিত ব্যবসা প্রসঙ্গে রেলওয়ে আফিসে ঘটনাক্রমে প্রসন্ন বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় হয়। দোভাষী সাহেব তাঁহার সততা ও অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রসন্ন বাবুকে নিজের আফিসে ১৯০৬ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তখন দোভাষী সাহেবের আর্থিক অবস্থা এখনকার মত ছিল না, সামান্য কারবার ছিল মাত্র। প্রসন্ন বাবুর কর্ম্ম গ্রহণের পর হইতেই দোভাষী সাহেবের অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রসন্ন বাবুর উদ্যমশীলতার ফলে ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল দেখিয়া খান সাহেব নিজব্যয়ে তাঁহাকে বুককিপিং, টাইপ রাইটিং ও কমার্শিয়াল কোর্সে শিক্ষিত করাইয়া আনেন। ১৯০৭ সালে প্রসন্ন বাবু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে দোভাষী সাহেব তাঁহাকে এটর্ণীর ক্ষমতা দিয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজ হইতে ৫০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করান। চট্টগ্রামে জনৈক সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীযুক্তা বিমলাবালা দেবী। তিনি দান ও আতিথেয়তা গুণে সুপ্রতিষ্ঠ, তিনি ধর্ম্মভীরু, উদার. ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও নিরহঙ্কার এবং দাস দাসীর প্রতি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার। এক কথায় তিনি গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবার উপযুক্ত। দাস দাসীর উপর নির্ভর না করিয়া তিনি স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে তিনি জানেন না। তাঁহার প্রফুল্ল অন্তঃকরণ, ছোট বড় লোকের সহিত তাঁহার সরলতা,

বদান্যতা, পরিবারস্থ সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিবাহের পর হইতে প্রসন্ন বাবুর ভাগ্যবিধাতা সুপ্রসন্ন হইতে লাগিল; তাঁহার উদ্যমশীলতায় ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া দোভাষী সাহেব প্রসন্ন বাবুর মাসিক বেতন ১৫০৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দিলেন, তখন প্রসন্ন বাবু দোভাষী সাহেবের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহার উপর সমস্ত কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া দোভাষী সাহেব নিশ্চিন্ত থাকিতেন; তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। দোভাষী সাহেবেরও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রসন্ন বাবু নিজে স্বাধীনভাবে চট্টগ্রামে একটী ষ্টেশনারী দোকান খোলেন। তাঁহার এক সহোদর এই দোকান পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ভ্রাতার ও কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্যে দোকানে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা লোকসান হওয়ায় দোকান উঠিয়া যায় এবং তাঁহার সহোদর রেঙ্গুণে চলিয়া যান।

অধ্যবসায়ী প্রসন্ন বাবু এই সময়ে Burmah Oil Companyর Agency গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামে কেরোসিন, লবণ প্রভৃতির ব্যবসা আরম্ভ করেন। সদর ঘাট রোডে আফিস খুলিয়া ধান, রেঙ্গুণ চাউল প্রভৃতির পাইকারী কারবার ও Whole Sale Bussiness আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার ব্যবসা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহু সহস্র টাকা মূলধন না হইলে তাহা সুচারুরূপে পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। চট্টগ্রামের অনেক মহাজনের নিকট টাকা চাওয়া সত্ত্বেও তিনি বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে একজন সম্ভ্রান্ত ও সদাশয় ইংরেজ বন্ধু প্রসন্ন বাবুর সততা ও কার্য্যদক্ষতা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মূলধন দিয়া সাহায্য করেন। প্রসন্ন বাবু এখনও সেই সমস্ত ইংরেজ বন্ধুর কথা ভুলিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য এই সময়েও প্রসন্ন বাবু দোভাষী সাহেবের

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ। চেয়ারে উপবিষ্ট।
ইঁহার পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণ নিম্নতলে উপবিষ্ট।

ম্যানেজারের কার্য্যে থাকিয়া তাহা সুচারুরূপে পরিচালনা করিতেছিলেন এবং বিগত ইউরোপের মহাসমরের সময় যখন এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে ধান, চাউল ইত্যাদি বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানীর জন্য ষ্টীমারের ভয়ঙ্কর অভাব অনুভূত হইতেছিল তখন প্রসন্ন বাবুরই উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি Sailling ship প্রস্তুত হওয়াতে দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। চট্টগ্রাম বন্দর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বহির্ব্বাণিজ্যের একমাত্র কেন্দ্রস্থান বলিয়া এই বন্দরে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান বন্দর হইতে পণ্যদ্রব্য (Export and Import) লইয়া অনেক ষ্টীমার (Direct Foreign Ships) আসা যাওয়া করিয়া থাকে। প্রসন্ন বাবু বহুদিন যাবৎ Stevedoring and Dubashing business ম্যানেজারের পদে থাকার দরুণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বিভিন্ন জাতীয় কাপ্তেন, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ের মালিক প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা আলাপ পরিচয়ের সুবিধা পাওয়াতে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা লাভজনক ব্যবসায়ের চিন্তা করিতেন। এই চিন্তার ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া চাল মুগরা তৈলের কল হাইড্রলিক অয়েল প্রেস স্থাপন করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে একচেটিয়া বন্দোবস্ত লওয়াতে তিনি চালমুগরা তৈল বিক্রয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। প্রসন্নবাবুর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের Handling business management এর সময়ে একদা জাভা হইতে একখানি ষ্টীমার মদ প্রস্তুতের জন্য বহু সহস্র গুড়ের ঝুড়ি লইয়া চট্টগ্রাম আসে। ঝুড়ি গুলি ষ্টীমার হইতে খালাস করিয়া খোলা জেটীতে রাখা হইয়াছিল এমন সময় অকস্মাৎ ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে গুড়গুলি গলিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। সেই সময়ে প্রসন্নবাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়া অনেক কুলীর সাহায্যে মালগুলি রক্ষা

করেন। উক্ত মালের কর্ত্তা তাঁহার এইরূপ অযাচিত সাহায্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া সামান্য মূল্য গ্রহণে প্রসন্নবাবুকে ৫ শত ঝুড়ি গুড় দান করেন। তদবধি ১৯১৪ সালে তিনি জাভাদ্বীপ হইতে গুড় আমদানী করিয়া চট্টগ্রাম ডবলমুরিংএ গুড়ের কারখানা স্থাপন করেন। তাঁহার Molasses Factoryর গুড় সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগে আকিয়াব, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে সুলভে সরবরাহ করা হইতেছে। গত ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় ধান, চাউল ও লবণের কারবার করিয়াও তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবসায়ের বিশেষ বিস্তৃতি হওয়ায় এবং স্বয়ং ব্যবসায় তত্ত্বাবধানে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তিনি ১৯০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দোভাষী সাহেবের কার্য্যত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন।

দরিদ্র চট্টগ্রামবাসীর দৈনন্দিন খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে সরিষার তৈল একটী প্রধান উপকরণ। বিদেশ হইতে আমদানী চর্ব্বি এবং Lard মিশ্রিত ভেজাল তৈল খাইয়া স্বদেশবাসী নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া অহরহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এতদ্দর্শনে কোমল হৃদয় প্রসন্ন বাবুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং কি প্রকারে দেশবাসীর এই গুরুতর অভাব মোচন করিতে পারা যায় তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৯২০ সালে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটী প্রকাণ্ড তৈলের কল (P. K. Sen Oil Mill) স্থাপন পূর্ব্বক দেশবাসীর এক গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। এই কলে তিসি, সরিষা, কৃষ্ণতৈল, বাদাম, নারিকেল, রেড়ী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিশুদ্ধ তৈল (ভেজিটেবল অয়েল) প্রস্তুত হয়। তৈলের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন এবং এই বিশুদ্ধতার জন্যই আন্তর্জ্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে (International Industrial

Exhibition) এ প্রসন্নবাবু স্বর্ণ পদক (Gold medal) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের তদানীন্তন সিভিলসার্জ্জন লেফেটন্যান্ট কর্ণেল আর্ণেষ্ট ফ্রান্সিস সাহেব চালমুগরা প্রভৃতি তৈলের কারখানা পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন :—

Lieut Col. E. E.Francis, V. D. Assam Bengal Railway

Chief medical officer. Chittagong, 28th Feb. 1920.

I have inspected Chittagong Oil mills of Babu P. K. Sen, merchant of this town. He manufactures chulmoogra oil of great purity. The oil is prepared from the seeds of "TARAKTOGENOS KURZII" only, It is cold drawn. The hydraulic Press which he uses was Imported from England under my supervision. The oil passes all the tests described by me in the "Extra Pharmacopœia."

Babu P. K. Sen also manufactures, Castor oil and Cocoanut oil. I have ascertained that both are of the highest medicinal purity.

Sd.

Ernest. Francis, Lieut C. O. L. :

V. D. ; M. R. C. S. (End) L. S. A. (Lond)

Civil Surgeon, Chittagong.

Chief Medical officer. A, B. Railway.

চালমুগরা তৈলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার্থ মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের জনৈক রাজপ্রতিনিধি প্রসন্ন বাবুর কারখানা পরিদর্শন করিতে আসেন।

সমস্ত পর্য্যবেক্ষণে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রসংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন :—

UNITED SATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Bureau of plant Industry

WASHINGTON. (America)

Foreign Seed & plant Introduction

Whom it may concern,

This is to certify that I have this day visited Prasanna kumar Sen's establishment and Chaulmoogra Oil Factory, and that I have inspected the seeds used by him. I have found that the seeds used in the expression of the oil are the true "TARAKTOGENOS KURZII" and not those belonging to "GYNOCARDIA ODARATA". the oil as expressed is cold drawn and no heat is used.

Sd.

Joseph F. Rock

Agricultural Explorer.

Chittagong, U. S. Dept : of Agriculture

Feb : 24-1921. Bureau of Plant Industry.

Foreign seed & Plant Introduction.

স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি ২০টী তাঁত বসাইয়া অনেক কাপড় প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু কর্ম্মচারীদের অবহেলায় বহু টাকা লোকসান হওয়ায় তিনি তাঁত উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

১৯২০ সালে অধ্যবসায়ী প্রসন্নবাবু প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া

Cotton Ginning Factory নামে সদর ঘাটে একটী বিরাট সূতার কল স্থাপন করেন। এই Factory তে প্রতিদিন সতের শত লোক অবিরত কার্য্য করিতেছে। অতঃপর তিনি "পি, কে, সেনের চালমুগরা মলম" নামে সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্মরোগের এক সুপ্রসিদ্ধ অবর্থ মহৌষধ ও "প্রসন্ন বটীকা" নামে সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্লীহাদির অমোঘ মহৌষধ আবিষ্কার করিয়া তাহার সুলভমূল্য নির্দ্ধারিত করায় সহস্র সহস্র দরিদ্র রোগী বিশেষ উপকৃত হইয়া ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে এবং ভারতের নগরে, পল্লীতে, দরিদ্রদের কুটীরে পর্য্যন্ত পি, কে, সেনের নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় ক্ষণজন্মা ভাগ্যবান পুরুষ বাঙ্গালায় বিরল। তিনি আদর্শ কর্ম্মী। বাঙ্গালার লক্ষ ভ্রষ্ট নিরুপায় যুবকবৃন্দ এই কর্ম্মীর জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার নীতি অনুসরণ করিলে, যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইতে পারেন, শ্মশান বাঙ্গালা আবার সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হইতে পারে, "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" আবার হাসিয়া উঠিতে পারে।

প্রসন্ন বাবু নিজের ব্যবসা বুদ্ধিকে শুধু নিজের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। অনেক লোক তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং উপদেশে উৎসাহিত হইয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপপূর্ব্বক বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছে। চট্টগ্রামের অনেক সদনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়া থাকেন, বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। পরোপকারই তাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র। বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশ প্রাণ, প্রসন্নবাবু বহু সভা সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, বহু দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন এবং বহু অর্থ সাহায্য করিতেছেন। তন্মধ্যে Chambers of Commerce, Chitta-

gong Association, Bangia Sahitya Parisad, Frien'ds Union Club, K. C. De Institute, Indian Merchants Association, Congress and Khilaphat Commitee বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি—Indian Merchant Association এর vice chairman, চট্টগ্রাম যাত্রামোহন Hall, নয়াপাড়া হাইস্কুল ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছেন। কেহ তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইয়া বিফল মনোরথ হয় নাই। উত্তরবঙ্গ বন্যার সময়, পূর্ব্ববঙ্গ ও কক্স বাজার বাত্যা-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে তিনি যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছিলেন।

নামের জন্য তিনি লালায়িত নহেন, গুপ্তদানই তাঁহার বেশী। দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যায়, ছোট বড় পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলের নিকট তাঁহার সরলতা; অহঙ্কার কাহাকে বলে তিনি জানেন না। তিনি জনপ্রিয়, মিষ্টভাষী, সদালাপী। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, তাঁহার সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয় এবং অনেক উপদেশ ও উৎসাহ পাওয়া যায়। তিনি খুব ধর্ম্মভীরু। মাতাপিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি প্রতি বৎসর পিতৃশ্রাদ্ধে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। নানা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে তাঁহার নাম জড়িত আছে। সীতাকুণ্ড "ব্যাসাশ্রমের" শঙ্কর মঠের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক; নানা ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহার এককালীন, বার্ষিক এবং মাসিক অনেক অর্থ সাহায্য আছে। তিনি প্রত্যহ নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাপূজাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হিন্দুর আচার সংস্কার (উপনয়নাদি), পূজাপার্ব্বনাদি তিনি শাস্ত্রমতে সম্পাদন করিয়া থাকেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে. তিনিও পিতার ন্যায় ৺শ্যামামায়ের উপাসক। খাঁটী হিন্দু হইলেও তাঁহার নিকট গোঁড়ামী নাই। তিনি উদার হিন্দু। হিন্দু হইয়াও তিনি মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে

সাহায্য করিয়া থাকেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পথের কাঙ্গাল পর্য্যন্ত সকলের তিনি প্রিয়পাত্র। তিনি যে শুধু দেশবাসীর প্রিয়পাত্র তাহা নহে, রাজপুরুষদের নিকটও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে খুব ভালবাসেন, সভা সমিতিতে, লাট দরবারে তিনি সম্মানের সহিত আহুত হইয়া থাকেন।

প্রসন্নবাবুর ৪ পুত্র ও ১ কন্যা। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রতুলকুমার সেন ১৯০৯ খৃঃ অঃ ৩১ অক্টোবর রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন ম্যাট্রিকুলেশন পড়িতেছেন। কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবী, বর্ত্তমানে Khastagir Girls স্কুলে পড়িতেছেন। ২য় পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার সেন, ৩য় পুত্র শ্রীমান্ প্রমোদকুমার সেন এবং ৪র্থ পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধ কুমার সেন।

৺যাত্রামণি সেন মহাশয়ের ৩য় পুত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন ১৮৮৬ খৃঃ অঃ ৩১শে মার্চ্চ রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লবণের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনিও একজন অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ী। চট্টগ্রাম সদরঘাট রোডে তাঁহার আদিবাসগৃহ আছে। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা।

চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শশীকুমার সেন ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর রবিবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নয়াপড়া গ্রামে প্রসন্নবাবুর পল্লী ভবনে বাস করেন এবং তথাকার ভূসম্পত্তির সংরক্ষণাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা।

পঞ্চমপুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পি, কে সেন মিলে Mechanical Enginearএর কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার দুই কন্যা।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ম্যাট্রিকুলেশন ও আই এস্ সি

পরীক্ষায় ১ম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি এস্ সি অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনিও প্রসন্নবাবুর স্থায় মেধাবী, অধ্যবসায়ী ও ব্যবসা বুদ্ধিতে পারদর্শী। ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ব্যবসায়ে তিনি প্রসন্নবাবুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। তিনিও প্রসন্নবাবুর স্থায় বিনয়ী, নিরহঙ্কারী, সরল, উদার, দয়ালু এবং লোকপ্রিয়। কালে যে তিনি উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করিবেন এখন হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেনের বংশাবলী।

শক্তি্র গোত্র, ত্রিপ্রবর শক্তি্র, বশিষ্ঠ, পরাশর।

৺বলরাম সেন

৺প্রাণকৃষ্ণ সেন

৺শিশুরাম সেন

৺রামদুলাল সেন স্ত্রী৺যশোদা দেবী।

৺রাজবল্লভ সেন স্ত্রী৺আরাধুনী দেবী।

৺যাত্রামণি সেন স্ত্রী শ্রীমতী উমাতারা দেবী।

শ্রীপ্রতুলকুমার সেন শ্রীমতী আশালতা দেবী শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন

শ্রীপ্রমোদকুমার সেন শ্রীপ্রবোধকুমার সেন

(৩ শ্রীনিশিকান্ত সেন

স্ত্রী শ্রীমতী মোক্ষদাবালা দেবী

(৪) শ্রীশশীকুমার সেন

স্ত্রী শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী

শ্রীমতিলাল সেন

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী

শ্রীবিধুভূষণ সেন

শ্রীপ্রিয়ভূষণ সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ সেন

শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী

(৫) শ্রীবিপিনবিহারী সেন

স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী

(৬) শ্রীরমণীমোহন সেন

স্ত্রী শ্রীমতী কিরণবালা দেবী

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী

শ্রীমতী ভানুপ্রভা দেবী

শ্রীমতী জ্যোতিঃপ্রভা দেবী

স্বৰ্গীয় বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রেল তারিখে বঙ্গভাষার প্রথম দার্শনিক পণ্ডিত স্বনামধন্য বীরেশ্বর পাঁড়ে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত কায়বা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারী জেলা বিভাগের পরে বনগ্রাম মহকুমা জেলা যশোহরের অন্তবর্ত্তী হয়। ইনি স্বর্গীয় মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র; ইহারা তিন সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ কেদারেশ্বর, মধ্যম বীরেশ্বর এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। উত্তর পশ্চিম হইতে যে সকল কনোজ ব্রাহ্মণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করেন কায়বার সুবিখ্যাত পাঁড়ে বংশ তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গগত মায়ারাম পাঁড়ে বঙ্গদেশে এই পাঁড়ে বংশের আদি পুরুষ। তিনি প্রথমে পূর্ব্বোক্ত বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সামটা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। পরে উক্ত বংশের রাজারাম পাঁড়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ পাঁড়ের মৃত্যুর পরে তাহার বালক ভ্রাতুষ্পুত্র টিকারাম ও রামচন্দ্রকে লইয়া কায়বা গ্রামে আসিয়া নূতন বসবাস স্থাপন করেন। রাজারামের পুত্র অযোধ্যারাম সামটা গ্রামে পৈতৃক বাটীতেই রহিলেন। মায়ারামের কায়বা বংশে কনকচন্দ্র পাঁড়ে বিপুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন এবং কায়বা গ্রামে রাজপ্রাসাদের ন্যায় বাসভবন ও তৎসংলগ্ন অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ অতিথিশালা, দেবমন্দির ও পুষ্করিণী আদি প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপলক্ষে এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে দীন দুঃখীকে অন্নবস্ত্রদানও তাঁহার একরূপ নিত্য ক্রিয়া ছিল। সে সময়ে এখনকারমত রেলওয়ে ছিল না; এজন্য প্রত্যেক গঙ্গাস্নানের পর্ব্ব উপলক্ষে পূর্ব্ব দেশীয় সহস্র সহস্র লোক গঙ্গাস্নানে গমনাগমনের সময় তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতেন। সরকার প্রদত্ত উপাধি না হইলেও সর্ব্বসাধারণের

নিকট তিনি 'কনক রাজা' নামেই অভিহিত হইতেন। কনকচন্দ্রের সময় কোন ক্রিয়া উপলক্ষে একবার তাঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাগম হয়, সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি অদ্যাপি ইহাঁদের বাটীতে সংরক্ষিত আছে। বঙ্গভাষার সামাজিকনীতি অভিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে বুঝিতে পারিবেন তাঁহার সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, মর্য্যাদা এবং অর্থবল কিরূপ ছিল। শতগুণা নিবাসী ফতেচাঁদ প্রধানের কন্যা বিমলা দেবীর সহিত কনক পাঁড়ের বিবাহ হয়। সন ১৩৩৩ সালের ২রা বৈশাখ তারিখে কনক পাঁড়ের মৃত্যু হয়। কনকচন্দ্রের সাধ্বী পত্নী তাঁহার সহমৃতা হন। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে প্রথম মৃত্যুঞ্জয় মধ্যম গিরিশ, তৃতীয় গৌরীশ এবং চতুর্থ উমেশ। ইহাঁরাও পিতার ন্যায় সৎগুণ বিশিষ্ট, দেবদ্বিজে ভক্ত, অতিথি-বৎসল এবং দানশীল ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্রদিগের মধ্যে বীরেশ্বরই সুদর্শন ছিলেন, এজন্য পিতা-মাতার অধিক স্নেহই যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার সন্দেহ নাই — বীরেশ্বর অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। শৈশবেই তাঁহার বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইবেন। সকলের সে অনুমান মিথ্যা হয় নাই; বীরেশ্বর বিশিষ্ট ব্যক্তির অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন। বীরেশ্বর অমর হইয়াছেন, যতদিন বাংলা ভাষা ভারতে থাকিবে ততদিন বীরেশ্বরের নাম ভারত হইতে মুছিয়া যাইবে না। বীরেশ্বরের স্থান বাংলা সাহিত্যের উচ্চতম সোপানে।

সুদর্শন, শান্ত প্রকৃতি মেধাবী বীরেশ্বরের বাল্যকাল হইতেই শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। যে সময় তাঁহার সম বয়স্কেরা ক্রীড়া ও আমোদে অতিবাহিত করিতেন, বীরেশ্বর শিক্ষকের নিকটে বসিয়া নূতন কিছু শিখিবার চেষ্টা করিতেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ইহার বাল্য-কালেই কলেজের শিক্ষা শেষ করিতে হইলেও এই শিক্ষার অনুরাগের ফলেই তিনি এত বড় হইতে পারিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নিকট

শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে

শিক্ষা শেষ করিয়া বীরেশ্বর বিদ্যাশিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন ; শিক্ষায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ দেখিয়া, শিক্ষকেরা সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু এই প্রবল অনুরাগই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার অন্তরায় হইল। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলেজ ছাড়াইয়া বাটীতে লইয়া আসেন। একটু সুস্থ হইয়া তিনি পুনরায় কলেজে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পিতা তাঁহাকে বাটীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে বলেন। অগত্যা তিনি তাঁহাদের কুলপুরোহিত পণ্ডিত মোহন চন্দ্র চূড়ামণির নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং নিজেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন ; ইহার ফলে উত্তরকালে তিনি বালকদিগের শিক্ষার জন্য "বিজ্ঞান সার' নামক একখানি গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন, তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় সহজে বিজ্ঞান শিক্ষার অন্য পুস্তক ছিল না।

সতের বৎসর বয়সের সময় বীরেশ্বর লীলাবতী নামক সংস্কৃত বীজগণিত পুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিদ্যালয় পাঠ্য প্রথম পুস্তক প্রসিদ্ধ আর্য্যচরিত রচিত হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিজ্ঞান সার রচিত হয়। শিক্ষায় তাঁহার যেমন অনুরাগ ছিল শিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার সেইরূপ আগ্রহ ছিল। স্বীয় গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা না থাকায় বীরেশ্বর নিজব্যয়ে স্বগ্রামে একটী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে দরিদ্রগণকে বেতন দিতে হইত না।

বীরেশ্বর প্রাণপাত করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। আর্য্যদর্শন প্রভৃতি তৎকালীন মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে নিয়মিত ভাবে তাঁহার প্রবন্ধাদি বাহির হইত। খৃষ্টীয় ১৮৮২ অব্দে তাঁহার "মানবতত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা দর্শন প্রকাশিত হয়। সাহিত্য সেবী

হইলেও কথা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। স্কুল পাঠ্য ভিন্ন তাঁহার অন্য সমস্ত পুস্তকই দর্শন শ্রেণীর অন্তর্গত হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল; তিনি নিজে প্রত্যহ পূজা পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। মানব তত্ত্ব প্রকাশের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ অব্দে তাঁহার সামাজিক নক্সা "অদ্ভূত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রতীচ্য দেশের স্ত্রী স্বাধীনতা এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের অবস্থা কিরূপ বিসদৃশ্য, বিকট ও বীভৎস হইতে পারে তাহারই ভবিষ্যৎ চিত্র তিনি বিশদরূপে এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছিলেন। ইহার ছায়া লইয়া কয়েক বৎসর পরে ষ্টার থিয়েটারের প্রথিত যশা নাট্য লেখক অমৃত বাবু তাজ্জব ব্যাপার নামক প্রহসন প্রনয়ণ করেন, এক সময়ে তিনি সহচরী, জাহ্নবী ও বিজ্ঞান দর্পণ নামক তিনখানি কথা সাহিত্য, ধর্ম্মসাহিত্য এবং বিজ্ঞান সাহিত্যমূলক মাসিকপত্র একত্র সম্পাদন করিতেন —১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃক তিনি বঙ্গভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন, পরে তিনি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রনয়ণে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যালয়ে সকলে বালকদিগকে ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত গল্প ও জীবন চরিতাদি সম্বলিত বাংলা পুস্তক পড়ান হয় দেখিয়া তিনি ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিখ্যাত চরিত্র অবলম্বন করিয়া আর্য্য শিক্ষা, আর্য্য পাঠ; চারুশিক্ষা ১ম ২য় ৩য় এবং বালকদিগের নীতি শিক্ষার জন্য সংস্কৃত নীতি গ্রন্থ উদ্ধৃত করিয়া নীতিকথা মালা নামক পুস্তক প্রনয়ণ করেন। ইহা ভিন্ন বালকদিগের জন্য একখানি ক্ষুদ্র এবং বয়স্কদিগের জন্য একখানি বৃহৎ বাংলা ব্যাকরণ প্রনয়ণ করেন। তাহার পরে কবিতাপাঠ নামক ১ম ২য় ৩য় কবিতা পুস্তকও প্রকাশ করেন, প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য ভাষা শিক্ষা ১ম ২য় ৩য় ও প্রনয়ণ করিয়াছিলেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য বীরেশ্বর নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কর্ত্তব্য বিচ্যুত হন নাই।

মহাকবি নবীন চন্দ্র সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস পাঠ করিয়া উক্ত পুস্তকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি ও প্রাচীন ঋষিদের প্রতি নবীন বাবুর অহেতুক দোষারোপ, ঘৃণা নিন্দা, ব্যঙ্গ এবং কুৎসিৎ আক্রমণে তিনি নিতান্ত কুপিত হইয়া "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে উক্ত পুস্তকের এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ও সমালোচনা শিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেকেরই ঐ পুস্তকখানি পাঠ করা উচিৎ। নবীনবাবুর উক্ত পুস্তকত্রয়ের পাণ্ডুলিপি দেখিয় মনীষি বঙ্কিম চন্দ্র তাহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত দিয়াছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশের পরে তিনি সাহিত্য পরিষৎ পত্রে বাংলা পুস্তকের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু নানাদিক হইতে বন্ধুবর্গের অনুরোধ ও অসন্তোষে বাধ্য হইয়া তিনি পুস্তক সমালোচনা পরিত্যাগ করেন।

তৎপ্রণীত ঐ সকল পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি অনেকবার উচ্চপ্রাথমিক মধ্য বাংলা ও মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

তাঁহার কোন কোন পুস্তক এখনও পর্য্যন্ত অনেক বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে মনোনিবেশ করিলেও তিনি দর্শন শাস্ত্রের পুস্তক প্রণয়ন পরিত্যাগ করেন নাই এবং তাহার ফলে তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব নামক দুইখানি ধর্ম্মদর্শন পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বই বাংলা ভাষার শেষ পুস্তক। ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা সমস্ত তর্ক খণ্ড করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক মানবতত্ত্বের ইংরাজী অনুবাদ Man প্রকাশ করেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নানা প্রকার পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদে বিব্রত

হইয়া তিনি গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব কলিকাতায় বসিয়া ভোগ করিতে আসেন নাই। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ ছিল স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি, স্বদেশী শিল্পের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ অনুরাগ ছিল। সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জমিদার পুত্র হইয়া ও নিজে জমিদার হইয়াও স্বদেশী বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য এবং স্বদেশবাসীর স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ আকর্ষণ করিবার জন্য ৬১নং কলেজ ষ্ট্রীটে 'নববাস" নামক একখানি স্বদেশী বস্ত্রের দোকান স্থাপন করেন। দোকানদার ৬৲ টাকার জিনিষ ৮৲ টাকা মূল্য বলিয়া বিক্রয় করিত, এজন্য তিনিই কলিকাতায় প্রথম একদরে জিনিষ বিক্রয় প্রচলিত করিতে আরম্ভ করেন। এই দোকানেই দেশের সমস্ত বিজ্ঞমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প, প্রভৃতি নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ জল্পনা হইত। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূদেব বাবু, রমেশচন্দ্র দত্ত ও কেশবচন্দ্র সেনের সহিতই তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার অসামান্য তর্ক-শক্তি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে "নৈয়ায়িক" আখ্যা দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে একরূপ সদাব্রত ছিল। আহারের সময় যে কোন লোক বিনা প্রশ্নে তাঁহার বাটীতে আহার করিতে পারিত। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র মনোমোহন পাঁড়েও পিতার যে সমস্ত সদগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার মধ্যে কলিকাতার বাটীতে এই সদাব্রতই প্রধান।

নানা প্রকার বৈষয়িক গোলমালে তাঁহার পৈতৃক দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়া যায়; এই জন্য তিনি নিতান্ত মনক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিন যাপন করিতেন। ঈশানী সদয় হইয়া শেষে তাঁহার ক্ষোভ দূর করিয়াছিলেন। বিডন ষ্ট্রীটের বাসায় বীরেশ্বর আবার

তাঁহার বোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাশীধামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা তাঁহার বহুদিন হইতেই ছিল, তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল, কিন্তু বীরেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই; মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বর তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সন ১৩১৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারিখে বীরেশ্বর পুত্র পৌত্রাদিতে বেষ্টিত হইয়া বারাণসী ধামে দেহ রক্ষা করেন।

১২৭৭ সালে, ৮ই শ্রাবণ, রবিবার যশোহর জেলার অন্তর্গত কায়বা গ্রামে মনোমোহন বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত কায়বা মাইনর স্কুলে পাঠ করেন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী হইলেও কালের পরিবর্ত্তনে বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আইসে, পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগকালে বীরেশ্বর বাবু সামান্য অংশ প্রাপ্ত হন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া ১২৮৬ সালে পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বীরেশ্বর বাবু সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পুত্রকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে ফ্রী ভর্ত্তি করিয়া দেন। উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া মনোমোহন বাবু এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে ঝোঁক ছিল, চাকুরী করিতে একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু বীরেশ্বর বাবুর অবস্থাও তখন এরূপ সচ্ছল নহে, যাহাতে তিনি পুত্রকে ব্যবসা করিবার জন্য কিছু মূলধন দিতে পারেন। উদ্যমশীল মনোমোহন বাবু নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে ২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাটীর সিঁড়ির নীচে ৭৲ সাত টাকার একটী ছোট ঘর ভাড়া করিয়া, বিনা মূলধনে "পাঁড়ে ব্রাদার্স" নামে

একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি প্রত্যহ অন্যান্য পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আনিয়া বিক্রয় করিতেন, যাহা কমিশন পাইতেন, তাহাই মাত্র তাঁহাব লাভ হইত। তাঁহার সাধুতা, বিনয় এবং উদ্যমশীলতা দর্শনে গুরুদাস বাবু এবং মনোমোহন লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী কবিবর স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বসুজ মহাশয় মনোমোহন বাবুর উদ্যমশীলতার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহার নামে একখানি গান বাঁধিয়াছিলেন। এইরূপে সকলের ভালবাসা ও সাহায্য পাইয়া এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে দুই বৎসরের মধ্যে পুস্তকালয়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। বীরেশ্বর বাবু প্রত্যহই পুস্তকালয়ে আসিয়া বসিতেন। তিনি স্বয়ং প্রথিতনামা সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যে এবং সৌজন্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ তথায় বহু সাহিত্যিক সমবেত হইয়া নানাবিষয়ক সাহিত্য আলোচনা করিতেন। পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষিবর্গের সম্মিলনে পুস্তকালয় বীণাপাণি বাগ্দেবীর আনন্দ নিকেতন স্বরূপ প্রতীয়মান হইত।

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, ব্যবসার দিকে বাল্যাবধি মনোমোহন বাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাজারের বস্ত্র ব্যবসায়িগণকে অসম্ভব চড়া দরে তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, ইহারা যে মূল্যে বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে, তাহার উপর সামান্য লাভ রাখিয়া যদ্যপি বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে স্বদেশী তন্তুবায়গণকেও উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং সাধারণের স্বদেশীয় বস্ত্র পরিধানের প্রতি অনুরাগও বৃদ্ধি করা হয়। তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত পুস্তকাগারের এক পার্শ্বেই সুলভ মূল্যে তাঁতের কাপড় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ১৸০ ও ২৲ দুই টাকায় জোড়া দেশী কাপড়ের বিজ্ঞাপন পাঠে সাধারণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, দলে দলে গ্রাহকগণ আসিয়া সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিতে লাগিল। দিন দিন

রঙ্গালয়ের এত উন্নতি হইতে লাগিল যে কার্য্যে সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত মনো-মোহন বাবু পুস্তকালয় তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মনোমোহন বাবুর পিতৃষস্রেয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া থিয়েটার করিবার অভিপ্রায়ে হাতিবাগানে একটী ঘর ভাড়া করিয়া আখড়া বসান। গিরিশচন্দ্রের "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" রিহারস্তাল চলিতে থাকে। কবিবর স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের উপর বীণা থিয়েটার (উপস্থিত তথায় রিপণ থিয়েটার বায়স্কোপ হইতেছে) সে সময়ে খালি পড়িয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ 'সুধাসিন্ধু" পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত থিয়েটার বাটীর সে সময়ে সত্বাধিকারী ছিলেন।

উক্ত বন্ধুত্রয় বীণা থিয়েটারটী খরিদ করিয়া লইবার মানসে নলডাঙ্গার জমীদার শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দেব রায়কে গিয়া ধরেন। ক্ষিতীশ বাবু বীণা থিয়েটার ক্রয় করিতে সম্মত হইয়া উক্ত থিয়েটারের বাটীর মালিক প্রিয়নাথ বাবুকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করেন এবং বাকী শীঘ্রই পরিশোধ করিয়া দিবার কথা হয়। মহা উৎসাহে সম্প্রদায় বীণা থিয়েটারে গিয়া "অজ্ঞাতবাসের" রিহারস্তাল দিতে লাগিলেন। এই সময়ে থিয়েটার সম্প্রদায় মনোমোহন বাবুর নিকট আবশ্যকমত টাকাকড়ি ঋণ গ্রহণ করিতেন। এই সূত্রে থিয়েটারের সহিত মনোমোহন বাবুর প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নূতন থিয়েটারের "প্যাণ্ডোরা থিয়েটার" নামকরণ পূর্ব্বক সহরে বিজ্ঞাপন ঘোষিত হইল। যখন নলডাঙ্গার ক্ষিতীশ বাবুর ভ্রাতা ও মাতাঠাকুরাণীর নিকট সংবাদ পঁহুছিল, ক্ষিতীশ বাবু 'কাপ্তেন' হইয়া বিস্তর টাকা খরচ করিয়া কলিকাতায় থিয়েটার করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিশেষরূপে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কৌশল করিয়া তাঁহাকে

দেশে ধরিয়া লইয়া যাইলেন। ক্ষিতীশ বাবু দেশে আবদ্ধ হইয়া থাকায় থিয়েটারও উঠিয়া যাইল। মনোমোহন বাবু ক্ষিতীশ বাবুকে যে টাকা কৰ্জ্জ দিয়াছিলেন বহু তাগাদা করিয়া তাহা না পাইয়া শেষে আদালতের সাহায্যে আদায় করিয়া লন।

পূর্ব্বোক্ত সুরেন্দ্র বাবুর (মনোমোহন বাবুর পিস্‌তুতো ভাই) এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। সুরেনবাবু মনোমোহন বাবুকে শুন্য বক্‌রাদার করিয়া উভয়ে কণ্ট্রাক্টরীর কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিলেন মনোমোহন বাবু কাপড়ের দোকান এবং কণ্ট্রাক্টরীর কার্য্য উভয়ই চালাইতে থাকেন।

সুরেন বাবুর সহিত প্রথম কণ্ট্রাক্টরীর কার্য্যে লোকসান হওয়ায় তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া মনোমোহন বাবু স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। অধিকন্তু প্লাম্বারিং কার্য্য শিখিয়া পরীক্ষা প্রদানে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া কণ্ট্রাক্টরী এবং প্লাম্বারিং উভয় কার্য্যই পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্য তিনজন বখ্‌রাদারের (স্বর্গীয় হেমচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র রায় এবং বিমানবিহারী সরকার) সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আফিসে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করেন।

উক্ত বিরাট বাটী নির্ম্মাণকালীন সঙ্গে সঙ্গে ইটখোলা, শুরকির কল, বালির খটি ইত্যাদি কারবার খোলেন, সুব্যবস্থা এবং যত্নপূর্ব্বক তত্ত্বাবধানে তিনি প্রত্যেক কারবারেই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইনি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতে যে পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য না হন, সে পর্য্যন্ত সে কার্য্যসাধনে কোনওরূপ উপেক্ষা বা ত্রুটি যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। আমরা তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি, তিনি প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবার অগ্রে স্থির করিয়া লন, অদ্য কি কি কার্য্য করিতে হইবে এবং রাত্রে শয়নকালীন হিসাব করিয়া দেখেন, কি কি কার্য্য করিলাম। যে ব্যক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া

এইরূপ সতর্কতার সহিত হিসাব করিয়া কার্য্য করেন, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি যে প্রসন্না হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

সাধারণ রঙ্গালয়ের সহিত কিরূপে তিনি সংশ্লিষ্ট হইলেন, এইবারে আমরা সেই ঘটনা বিবৃত করিব। স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র মনোমোহন বাবুর মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের সত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত মহেন্দ্র বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। এই সূত্রে মনোমোহন বাবুর সহিত অমর বাবুরও পরিচয় এবং সদ্ভাব হয়। প্রয়োজন হইলেই অমর বাবু মনোমোহন বাবুর নিকট টাকা ধার লইতেন। প্রথম প্রথম অমর বাবু টাকা শোধ করিয়া দিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ নানা কারণে জড়াইয়া পড়ায় এবং ঋণের পরিমাণও অধিক হওয়ায়, ১৩১১ সালে তিনি তাঁহার মিনার্ভা থিয়েটারের দুই বৎসরের লিজ মনোমোহন বাবুর নামে লিখিয়া দেন।

অমর বাবু যে সময়ে সগৌরবে ক্লাসিক থিয়েটার চালাইতেছিলেন, সে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী স্বর্গীয় প্রিয়নাথ দাস ও বেণীভূষণ রায়। অমর বাবু তিন হাজার মাত্র টাকা অগ্রিম দিয়া তিন বৎসরের জন্য মিনার্ভা থিয়েটার লিজ লইয়া দুইটী থিয়েটারই চালাইতে থাকেন। কিন্তু প্রায় এক বৎসর অভিনয় করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে লোকসান হইতে লাগিল। এদিকে প্রিয়নাথ বাবু এবং বেণীভূষণ বাবুকে অবশিষ্ট চারি হাজার টাকা না দিলে লিজ কাঁচিয়া যায়। এই সঙ্কট অবস্থায় মিনার্ভা থিয়েটারের বাকী দুই বৎসরের লিজ হস্তান্তর করিয়া দিয়া অমর বাবু মনোমোহন বাবুর ঋণ পরিশোধ করেন। টাকা আদায়ের অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা মনোমোহন বাবু উক্ত লিজ লইতে বাধ্য হইলেন।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং শিক্ষক শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেবকে মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার করিয়া মনোমোহন বাবু তাঁহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। চুণি বাবুকে মাসিক ৭৫০৲ টাকা করিয়া ভাড়া

দিতে হইবে। উক্ত টাকা হইতে বেণীভূষণ বাবুদের ৬০০৲ শত টাকা থিয়েটারের ভাড়া দিয়া মনোমোহন বাবুর মাসিক ১৫০৲ শত টাকা থাকিবে। ইহা ছাড়া থিয়েটার সংক্রান্ত (রিহারস্যাল ব্যতীত) অন্যান্য বিষয় তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত মনোমোহন বাবু শত করা ৫৲ টাকা করিয়া কমিশন পাইবেন।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র, মনো-মোহন বাবুর মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ "শিশির পাবলিশিং হাউসের" সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র, বি এ মহাশয়ের পিতা। মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। ইনি মনোমোহন বাবুর সহিত বরাবর বাল্য সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় ও কাপড়ের দোকানে ইনি সদাসর্ব্বদা আসিতেন এবং মনোমোহন বাবুকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিতেন। মনোমোহন বাবু যে সময় কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন মহেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা (বর্ত্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয় সে সময় কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার হইয়া ফরিদপুরে কার্য্য করিতেন। মহেন্দ্র বাবু উপেন্দ্র বাবুকে দিয়া ফরিদপুরের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডে একটী বিল্ডিংএর কার্য্যভার মনোমোহন বাবুকে যোগাড় করিয়া দেন। মনোমোহন বাবু উক্ত বিল্ডিংএর কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুও কিরূপ বন্ধুবৎসল ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনায় আমরা তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

মনোমোহন বাবুর থিয়েটারে যোগ দিবার পূর্ব্বে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় জগবন্ধু বসুর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের সহিত স্থির করিয়া আসিয়া মনোমোহন বাবুকে বলেন—"কন্যার বিবাহ ত স্থির করিয়া আসিলাম, কিন্তু আমার হাতে পয়সা কড়ি কিছু নাই, পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে সরিকানি গণ্ডগোল ও দেনা থাকায়

সেখান হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই, ওকালতিতে তেমন কিছু হয় না, ভাইদের লেখা পড়ার ব্যয় ও বাসা খরচ কোনমতে চলিয়া যাইতেছে। আমার কন্যার বিবাহের ভার তোমাকে লইতে হইবে, টাকাকড়ি যাহা লাগে তাহা দিয়া, আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ২০০০৲ দুই হাজার টাকা মাত্র সাহায্য করিয়াছেন। মনোমোহন বাবুর হস্তে সে সময়ে ছয় হাজার টাকা ছিল, তিনি তৎসমস্তই মহেন্দ্রবাবুকে প্রদান করেন। মহেন্দ্রবাবু সেই টাকা লইয়া কম্বুলিয়াটোলায় রামচন্দ্র মৈত্রের লেনে মৈত্রদের বৃহৎ বাটী ভাড়া করিয়া মহাসমারোহ করিয়া কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। মনোমোহন বাবু বলিয়াছিলেন, তোমার সুবিধামত আমার টাকা পরিশোধ করিও। মহেন্দ্রবাবু যে সময়ে মিনার্ভা থিয়াটারের শূন্য বখরাদার হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার লভ্যাংশ হইতে মনোমোহন বাবুর উক্ত টাকা পরিশোধ করেন।

বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মনোমোহন বাবুর বাল্যবন্ধু ছিলেন। অপরেশ বাবুর পিতা সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার স্বর্গীয় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনোমোহন বাবুর স্থাপিত পুস্তকালয় ও কাপড়ের দোকানে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বীরেশ্বর বাবুর নিকট প্রত্যহই আসিতেন। অপরেশ বাবুও দিবসের অধিকাংশ সময় মনোমোহন বাবুর বস্ত্রালয়ে আসিয়া অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ক্ষিতিশ বাবু দেশে আবদ্ধ হইয়া পড়ায় "প্যাণ্ডোরা থিয়েটার" রিহার্স্যাল অবস্থায় উঠিয়া যায়; তৎপরে মুনীন্দ্রনাথ গুপ্তের বাটীতে অপরেশ বাবু প্রভৃতি মিলিত হইয়া পুনরায় থিয়েটার করিবার আশায় আখড়া বসাইলেন। সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

"সংবাদ প্রভাকর" যাহার অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত তাঁহার দৌহিত্র মুনীন্দ্র বাবু বজায় রাখিয়া আসিতেছিলেন, অপরেশ বাবু তাহাতে সহায়তাও করিতেন। মুনীন্দ্র বাবু ইঁহাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন, তিনি থিয়েটারে অভিনয়ার্থে কয়েকখানি নাটকও লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর অপরেশ বাবু নাট্যানুরাগ বশতঃ প্রাইভেট থিয়েটারে যোগদান করিয়া নড়াইল প্রভৃতি স্থানে অবৈতনিক অভিনয় করিয়া বেড়াইতেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যে সময়ে চুণি বাবু অধ্যক্ষ হইয়া থিয়েটার চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে মনোমোহন বাবু মধ্যে মধ্যে অপরেশ বাবুকে বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটকে দুই একটী ভূমিকা Part) দিয়া মিনার্ভায় অভিনয় করাইতেন। যে সময় তিনি মালদহে বায়নায় গিয়াছিলেন তখন অপরেশ বাবুকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, অপরেশ বাবু তাহাতে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। এইরূপ মনোমোহন বাবু অপরেশ বাবুকে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকেন।

চুণি বাবুর মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া কয়েক মাস অভিনয় করিবার পর মিনার্ভায় উপহার দেওয়া আরম্ভ হইল। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত এইরূপ ব্যবস্থা হইল; তিনি প্রত্যেক দর্শককে স্থানোপযোগী উপহারের পুস্তক যোগাইবেন এবং বিনামূল্যে হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া দিবেন, থিয়েটার সম্প্রদায় কেবল অভিনয় ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন।

অতুল গ্রন্থাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ও শব্দকল্পদ্রুম পর্য্যন্ত উপহার চলিল। ১৩১১ সালের শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত উপহার চলিতে থাকে, প্রতি অভিনয় রজনীতে বহুসংখ্যক দর্শক সমাগমে থিয়েটারে বেশ লাভ হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীগণের সমাগম ও সুবন্দোবস্তে "মিনার্ভা থিয়েটার" অচিরে সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মাঘ মাসে মালদহে বায়নায়

গিয়া চুণি বাবুর সহিত কোন কারণে মনোমোহন বাবুর মনোমালিন্য ঘটে। এজন্য তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া থিয়েটারের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন এবং চুণি বাবু স্বয়ং থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

চুণিবাবু দুই এক সপ্তাহ থিয়েটার চালাইয়া দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝিয়া মহেন্দ্র বাবুর নিকট থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন। মহেন্দ্র বাবু মধ্যস্থ হইলেন,—চুণি বাবুর কর্ত্তৃত্বকালীন দৃশ্য পট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য চুণি বাবু এক হাজার টাকা নগদ পাইলেন, এবং থিয়েটারের অন্যান্য যাহা দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহন বাবু স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

চুণি বাবু থিয়েটার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সুবিখ্যাত নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে থিয়েটারে আনিয়া সম্প্রদায়ের শক্তি সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

চুণি বাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে মনোমোহন বাবু থিয়েটার ভাড়া দিতে চাহিলেন। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"থিয়েটারে লোকসান হইবে না, কেন ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ? আমার কথায় বিশ্বাস কর, স্বয়ং থিয়েটার চালাও।" মহেন্দ্র বাবুর আগ্রহ দেখিয়া মনোমোহন বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—আমার নানা-কার্য্য, থিয়েটার লইয়া তো আবদ্ধ থাকিতে পারিব না, তবে তুমি যদি বখরা লইয়া আমার সহিত কার্য্যে যোগ দাও,—তাহা হইলে আমি থিয়েটার চালাইতে সম্মত আছি।" সেইরূপ হইল, মহেন্দ্রবাবু হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি এক তৃতীয়াংশ অংশ গ্রহণে Legal adviser হইলেন। উভয়ে থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। মনোমোহন বাবু চুণিবাবুর অধ্যক্ষতার সময়ে তাহার সুপরিচিত পূর্ব্বোল্লিখিত প্যাণ্ডোরা থিয়েটারের অপরেশ বাবুকে থিয়েটারে আনিয়াছিলেন। অপরেশ বাবু মিনার্ভা

থিয়েটারের সহিত মালদহেও গিয়াছিলেন। চুণি বাবুর স্থলে তাঁহাকেই ম্যানেজার করা হইল। এই সময়ে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নাট্যাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন।

মিনার্ভায় আসিয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে "হর-গৌরী" নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করেন। ১৩১১ সালের ২০শে ফাল্গুন শিবরাত্রিতে তাহা অভিনীত হয়। তাহার পর মাসেই ২৭শে চৈত্র মহাসমারোহে তাঁহার নূতন সামাজিক নাটক "বলিদান" অভিনীত হয়। বলিদান নাটকাভিনয়ে সহরে যেরূপ উচ্চ প্রশংসা ধ্বনি উঠিয়াছিল, অর্থাগম কিন্তু সেরূপ হয় নাই। তবে উপহার বন্ধ হইবার পর রঙ্গালয়ে দর্শকের সংখ্যা যেরূপ কমিয়া আসিতেছিল, "বলিদান" অভিনয় হইতে তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময়ে থিয়েটার দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রথম দল কলিকাতায় অভিনয় করিতে লাগিল, দ্বিতীয় দল কটক ও পুরীতে গিয়া কিছুদিন অভিনয় চালাইয়াছিল। আবশ্যকমত অভিনেতৃগণ শনিবার প্রাতে পুরী হইতে আসিয়া কলিকাতায় অভিনয়পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সোমবারে পুরী চলিয়া যাইতেন।

চুণিবাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর মনোমোহন বাবু যৎকালে স্বয়ং থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে মহেন্দ্র বাবুর সহিত মনোমোহন বাবুর এইরূপ মৌখিক বন্দোবস্ত হয় যে, থিয়েটারের ভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৫০৲ টাকা তিনি লইবেন। ইহা বাদে থিয়েটারে যাহা লাভ হইবে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ তিনি পাইবেন। এইরূপ মৌখিক কথানুসারে মনোমোহন বাবু থিয়েটার চালাইতে থাকিলেন। মহেন্দ্র বাবুর সহিত কোন লেখাপড়া হয় নাই,

মাত্র তিনি মুখে কথা দিয়াছিলেন। মহেন্দ্র বাবু সে সময়ে হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। মনোমোহন বাবু থিয়েটার পরিচালনের নিমিত্ত আবশ্যকমত টাকাকড়ি নিজ ঘর হইতে দিতেন, মহেন্দ্র বাবু কেবলমাত্র থিয়েটার সম্বন্ধীয় পরামর্শ প্রদান এবং থিয়েটার সংক্রান্ত উকিলের কার্য্য করিতেন। যেদিন কোর্ট বন্ধ থাকিত, সেদিন থিয়েটারে সন্ধ্যার পর আসিতেন।

১৩১৬ সালে মহেন্দ্র বাবুর তৃতীয় ভ্রাতা ননী বাবু, বি, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাত যাইয়া লেখাপড়া করিবার মানসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রবাবুকে তাঁহার আন্তরিক বাসনা জ্ঞাপন করেন। ভ্রাতৃবৎসল মহেন্দ্র বাবু মনোমোহন বাবুকে বলেন, "আমার যাহা আয়, সমস্তই খরচ হইয়া যায়; তুমি যদি কিছু সাহায্য কর, তাহা হইলে ননীকে আমি বিলাত পাঠাইতে পারি।" মনোমোহন বাবু মহেন্দ্রবাবুর কথায় তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা করিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তৎপর হইতে মহেন্দ্র বাবু, তাঁহার থিয়েটারের লভ্যের এক তৃতীয়াংশের উপর দুই শত টাকা করিয়া অধিক পাইতেন। মনোমোহন বাবু যতদিন থিয়েটার চালাইয়াছিলেন, উক্ত দুই শত টাকা মহেন্দ্রবাবুকে দিয়া আসিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় শরৎ কুমার রায় বি, এ, মহাশয় মনোমোহন বাবুর বাল্যবন্ধু এবং কনট্রাক্টারি কার্য্যের একজন অংশীদার ছিলেন। মনোমোহন বাবুর পিতা বীরেশ্বর বাবুর সহিত শরৎবাবুর পিতা স্বর্গীয় প্রসন্নচন্দ্র রায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই উভয় পরিবার বহুদিন হইতে বংশ পরম্পরায় সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

মনোমোহন বাবুর থিয়েটার পরিচালনের প্রথম হইতেই শরৎ বাবু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মিনার্ভা থিয়েটারে আসিতেন। মনোমোহন বাবু যে সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার লইয়া পুরী, কটক ইত্যাদি স্থানে থাকিতেন,

সে সময়ে কলিকাতায় মিনার্ভা থিয়েটার শরৎবাবু তত্ত্বাবধান করিতেন। থিয়েটারে সে সময়ে বিশেষ লাভ হইত না, এ কারণ মহেন্দ্র বাবু থিয়েটারে প্রায়ই আসিতেন না। শরৎবাবু মনোমোহন বাবুর তরফে কার্য্য চালাইতেন।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটার তিন বৎসরের জন্য প্রথমে লিজ লইয়াছিলেন। প্রথম বৎসর তিনি স্বয়ং থিয়েটার পরিচালন করিয়া পরে বাকী দুই বৎসরের লিজ মনোমোহন বাবুকে হস্তান্তর করিয়া দিয়া, তাঁহার ঋণ পরিশোধ করেন। নানা কারণে এই সময়ে (১৩১২ সাল) মিনার্ভা থিয়েটার হাইকোর্ট হইতে প্রকাশ্য নিলামে উঠে। মনোমোহন বাবু ৫৯৪০০৲ টাকায় ডাকিয়া লইয়া উক্ত থিয়েটারের সর্ব্ব সত্ত্বে সত্ত্ববান হইলেন।

বলিদান নাটকাভিনয়ের পর সুবিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গীয় ডি, এল, রায়ের ঐতিহাসিক নাটক "রাণাপ্রতাপ" মিনার্ভায় অভিনীত হয়। এই নাটকখানি প্রথমে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার কর্তৃপক্ষের সহিত অভিনয় সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মনোমালিন্য হওয়ায়, তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণকে উক্ত নাটকখানি অভিনয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে নিখুঁতভাবে নাটকখানি অভিনীত হয়। অভিনয় দর্শনে দ্বিজেন্দ্র বাবু পরম প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিনি মফঃস্বলের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কিছুদিন পরেই তিনি তিন বৎসরের ছুটি লইয়া, মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দুর্গাদাস, নুরজাহান, সোরাব রুস্তম, মেবার পতন, সাজাহান, প্রভৃতি নাটকগুলি যথাক্রমে মিনার্ভায় অভিনীত হইতে থাকে।

মিনার্ভা থিয়েটার হইতে এরূপ উৎসাহ না পাইলে দ্বিজেন্দ্রবাবু এত শীঘ্র সাধারণের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন না। মিনার্ভায়

তখন স্বয়ং নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যাচার্য্য ও নাট্যকার। তৎপরে সুবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র তাঁহার সহযোগী হইয়া মিনার্ভার জন্য নাটকাদি লিখিতেছিলেন।

রাণাপ্রতাপ অভিনীত হইবার কয়েক সপ্তাহ পরে যে সময়ে গিরিশচন্দ্রের "সিরাজুদ্দৌলা নাটকের রিহারস্যাল চলিতেছে, অপরেশবাবু হঠাৎ মনোমোহন বাবুকে (১৩১২ সালের ভাদ্রমাস) একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠান, "তিনি আর থিয়েটার করিবেন না, যেন তাঁহার নাম আর না দেওয়া হয়।" তিনি মনোমোহন বাবুর পিতৃস্বস্রেয় সুরেন্দ্র বাবুর সহিত কন্‌ট্রাক্‌টরী কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। অপরেশ বাবু চলিয়া যাইবার পর গিরিশবাবুর নাম 'ম্যানেজার' বলিয়া ছাপা হইতে লাগিল।

যথা সময়ে মহাসমারোহে সিরাজুদ্দৌলা নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় দর্শনে সর্ব্বসাধারণ পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপর বৎসর গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিম ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হয়। সে সময়ে বঙ্গ বিভাগে (Partition of Bengal) দেশব্যাপি তুমুল স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, উক্ত নাটক দুইখানি স্বদেশ প্রেমাত্মক হওয়ায় রঙ্গালয়ে লোকারণ্য হইতে লাগিল। মিনার্ভার যশঃ সৌরভে সমস্ত বঙ্গদেশ আমোদিত হইয়া উঠিল।

মিনার্ভা থিয়েটারের অসাধারণ উন্নতি এবং অর্থাগম দর্শনে পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় শরৎকুমার রায় মনোমোহন বাবুকে তাঁহাকে তাঁহার থিয়েটারের অংশীদার করিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করেন। মনোমোহন বাবু শরৎবাবুকে বলেন, "আমি মহেন্দ্র বাবুকে লাভের এক তৃতীয় অংশ দিব বলিয়াছি। যদিও তাঁহার সহিত কোন লেখাপড়া নাই এবং তুমি আমার অন্যান্য কার্য্যের বখরাদার; তাহা বলিয়া মহেন্দ্রকে কথা দিয়া

আবার তাহা ভঙ্গ করিয়া তোমাকে অংশীদার করিতে পারিব না। শরৎ বাবু ইহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; পরে ১৩১৫ সালে যে সময়ে গোপাল লাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার (অমর বাবু এই থিয়েটার গোপাল বাবুর নিকট হইতে লিজ লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়াছিলেন) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে বিজ্ঞাপিত হয়, সে সময়ে মনোমোহন বাবুও উক্ত থিয়েটার খরিদ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শরৎ বাবু এক লক্ষ আট হাজার টাকা উচ্চ দর দিয়া খরিদ করেন।

শরৎ বাবু এই থিয়েটার ক্রয় করিয়া তাঁহাদের সাধারণ বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ৺কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই, মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ মিত্র (মনোমোহন বাবু ও শরৎ বাবুর কন্ট্রাক্‌টরি কার্য্যের অন্যতম অংশীদার) মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে দিয়া মনোমোহন বাবুকে বলিয়া পাঠান, "আমরা দুই জনে দুইটী থিয়েটার খরিদ করিয়াছি। এক্ষণে এস, আমরা যেমন কন্ট্রাকটরি কার্য্যে দুই জনে বখরাদার ছিলাম, সেইরূপ থিয়েটারের কার্য্যেও দুই জনে বখরাদার হইয়া কার্য্য করি।" ইহাতে মনোমোহন বাবু পুনরায় সেই একই উত্তর দেন,—"আমি মহেন্দ্রবাবুকে এক তৃতীয়াংশ বখরা দিব বলিয়াছি,—আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে পারিব না।" ইহাতে শরৎ বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া মনোমোহন বাবুর মিনার্ভা থিয়েটার নষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। যখন দেখিলেন মনোমোহন বাবু অটল, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে একান্ত অসম্মত, তখন শরৎ বাবু তাঁহার ক্রীত থিয়েটার স্বয়ং পরিচালনা করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং উক্ত জীর্ণ থিয়েটার সুসংস্কৃত করিয়া মহাসমারোহে "কোহিনুর থিয়েটার" নাম দিয়া খুলিলেন। মনোমোহন বাবুর মিনার্ভা থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী-

-গণকে দ্বিগুণ বেতন ও বোনাস দিয়া তিনি তাঁহার থিয়েটারে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী পরলোকগতা তিনকড়ি দাসী, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, পরলোকগতা সুশীলাসুন্দরী ও সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র, স্বর্গীয় নৃনীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টু বাবু) প্রভৃতি মিনার্ভা হইতে কোহিনুরে চলিয়া যান, সর্ব্বশেষে গিরিশ বাবুকে দশ হাজার টাকা ও সুরেন্দ্র বাবু (দানি বাবুকে) তিন হাজার টাকা বোনাস ও মোটা বেতন দিয়া তাঁহার কোহিনুরে লইয়া গিয়া নাট্যামোদীগণের বিস্ময়োৎপাদন এবং সহরে একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

মনোমোহন বাবু অনন্যোপায় হইয়া সুবিখ্যাত নটনাট্যকার স্বর্গীয় অমেরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে মিনার্ভা থিয়েটারে লইয়া আসিয়া কার্য্য চালাইতে থাকেন এবং এগ্রিমেণ্ট থাকিতে সুশীলা সুন্দরী থিয়েটার হইতে চলিয়া যাওয়ায় হাইকোর্টে তাঁহার নামে ইনজাংসন সুটের নালিস করেন।

কোহিনুর থিয়েটার খুলিবার দুই তিন মাস পরেই শরৎ বাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে থিয়েটারেও নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। গিরিশ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকেই আবার মিনার্ভায় যোগদান করিলেন।

মনোমোহন বাবু কর্তৃক পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে যে স[illegible] নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বলিদান, সিরাজুদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি শিবাজী, শাস্তি কি শান্তি, শঙ্করাচার্য্য ও য্যায়সা-কা ত্যায়সা, ঋকুমারী,—দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান, অতুলকৃষ্ণের শিরী ফরহাদ, তুফানী. লুলিয়া, হিন্দাহাফেজ, রংরাজ, ঠিকে ভুল,—ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'বাঙ্গালার মসনদ' ও 'পলিন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল

নাটক ও গীতিনাট্যের অভিনয়ে মিনার্ভা বিপুল অর্থ ও অসীম যশঃ অর্জ্জন করিয়া বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলির মধ্যে সর্ব্ববাদীসম্মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

১৩১৮ সালে মনোমোহন বাবুর পিতা বীরেশ্বর বাবু কাশীধামে গমন করিয়া জীবনের শেষভাগ তথায় বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং মনোমোহন বাবুও তাঁহার নিকট থাকেন, এরূপ মনোভাব পুত্রকে জানান। পিতৃভক্ত সন্তান পিতার অভিপ্রায় মত কাশীধামে একটী বাটী এবং একটী শিবালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। মনোমত স্থানে জমি ক্রয়-পুর্ব্বক বাটী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পিতার সহিত একত্রে কাশীবাস করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থিয়েটার ছাড়িয়া দিবেন, স্থির করেন। মিনার্ভা থিয়েটার বহুপূর্ব্বে তিনি ৬০ হাজার টাকার নিলামে খরিদ করিয়া যথেষ্ট সংস্কার সাধন এবং থিয়েটার-সংলগ্ন পূর্ব্বদিকের জমিতে ৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নূতন হোটেল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমগ্র থিয়েটার বাটীর মূল্য লক্ষাধিক টাকা হইলেও, তিনি প্রথমে যে দামে থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন ও হোটেল বাটী তৈয়ারী করিতে যাহা খরচ পড়িয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২২ বাইশ হাজার টাকা মাত্র লইয়া মহেন্দ্র বাবুকে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দেন।

উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং সুবিখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা অভিনেত্রীগণ-পরিশোভিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটারে পূর্ণ অধিকার পাইয়া মহেন্দ্রবাবু মনোমোহন বাবুকে তাঁহার অংশের নিমিত্ত মাসিক ১৮০০৲ আঠার শত টাকা করিয়া ভাড়া দিতে স্বীকৃত হন। দশ বৎসরের নিমিত্ত লিজ লেখাপড়া হয়। ঐ লিজের একটী বিশেষ সর্ত্ত থাকে, যদ্যপি মহেন্দ্রবাবুর হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে লিজও ক্যান্সেল হইয়া যাইবে। মহেন্দ্র বাবু সে সময়ে বহুমূত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

সাত আট মাস কাশীধামে বাস করিবার পর মনোমোহন বাবুর পিতার ৺কাশী প্রাপ্তি হয়। কাশীতে নূতন বাটী এবং শিব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

পিতার মৃত্যুর পর মনোমোহন বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পিতার দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন এবং পরবৎসর কাশীতে যাইয়া পিতার সপিণ্ডকরণ এবং কাশীর সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়াদি করেন। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয় মনোমোহন বাবুর ভট্টপল্লার গুরু বংশীয়, তিনিই ইহার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবাবু পরমোৎসাহে মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এক বৎসর গত হইতে না হইতে মহেন্দ্রবাবু অকালে পরলোক গমন করেন। বীরেশ্বরবাবু ইহার দুই মাস পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করেন। এগ্রিমেন্টের সর্ত্তানুসারে লিজ ক্যান্সেল হইয়া যাওয়ায় মনোমোহন বাবু পুনরায় থিয়েটার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের গৃহলক্ষ্মী এবং ক্ষীরোদ বাবুর ভীষ্ম, আহেরিয়া, রূপের ডালি প্রভৃতি নাটকাদি এই সময়ে অভিনীত হয়। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং অভিনেতা অভিনেত্রীগণের একত্র সংমিলন এক মাত্র মনোমোহন বাবুর পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারেই হইয়াছিল। অবশিষ্ট ছিলেন ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম সত্বাধিকারী, সুবিখ্যাত নট-নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়; তাঁহাকেও মনোমোহন বাবু এই সময়ে তাঁহার মিনার্ভায় নাট্যাচার্য্য, নাট্যকারও অভিনেতারূপে আনয়ন করেন। অমৃত বাবুর রচিত "নবযৌবন" নামক নূতন নাটক মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হয়।

মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র নাবালক ছিলেন। কিছুদিন পরেই মহেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত

উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ, মহেন্দ্রবাবুর পুত্রের গার্জ্জেন স্বরূপ মনোমোহন বাবুর নামে কলিকাতা হাইকোর্টে থিয়েটারের পার্টিসন এবং হিসাবপত্রের (Account) জন্য নালিশ করেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মনোমোহন বাবু ১৩২০ সালে প্রকাশ্য নিলামে কোহিনুর থিয়েটার কিনিয়া লন। এক্ষণে তিনি তাঁহার মিনার্ভার ¼ অংশ উপেন বাবুকে ভাড়া দিয়া তাঁহার সহিত মামলা মীমাংসা করিয়া লইলেন এবং স্বীয় নামে মনোমোহন থিয়েটার নামকরণ পূর্ব্বক কোহিনুরে আসিয়া থিয়েটার করিতে থাকেন। 'কণ্ঠহার' এবং তৎপর 'মোগলপাঠান' নাটকাভিনয়ে মনোমোহন থিয়েটারের সুনাম অচিরে দেশময় সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কএক বৎসর পরে মনোমোহন বাবু তাঁহার মিনার্ভা থিয়েটারের ½ অংশ একলক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় এবং শিশির বাবু তাঁহার ¼ অংশ (যাহা তাঁহার পিতা ২২ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন) ৭০ সত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করেন।

মোগলপাঠানের পর পাণিপথ, পিয়ারেনজর, দেবলাদেবী, বিষবৃক্ষ, পরদেশী, হিন্দুবীর, বঙ্গেবর্গী প্রভৃতি নাটকাদি অভিনয় করিয়া মনোমোহন থিয়েটার বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সুদীর্ঘকালব্যাপি সুযশঃ ও অর্থাগম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এরূপ অপ্রতিহত-ভাবে থিয়েটার পরিচালন করিতে মনোমোহন বাবুর ন্যায় এরূপ কোনও থিয়েটারের সত্বাধিকারীকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। থিয়েটার করিতে আসিয়া বহুসংখ্যক প্রোপ্রাইটার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, ঈশ্বর কৃপায় মনোমোহন বাবু থিয়েটার হইতে আজ বঙ্গদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর জমীদার।

থিয়েটারের অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কর্ম্মচারীবৃন্দের সুখস্বাচ্ছন্দের

দিকে তাঁহার সতত লক্ষ্য পরিলক্ষিত হইত। গভর্ণমেণ্টের আফিসের ন্যায় মাস কাবার হইলে তাঁহারা বেতন তো পাইতেন। অধিকন্তু দায়ে ও দরকারে জানাইবামাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। মনোমোহন থিয়েটারের কার্য্য পাইবার নিমিত্ত সেই জন্যই অভিনেতৃবর্গের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

মনোমোহন বাবুর জন্মপত্রিকায় বৃহস্পতি নবমাধিপতি হইয়া একাদশ গৃহে অর্থাৎ আয় স্থানে অবস্থিত। ভাগ্যলক্ষ্মী সেই নিমিত্তই তাঁহার প্রতি সতত প্রসন্ন। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া তিনি বহু জমীদারী ক্রয় এবং কলিকাতায় বহু সংখ্যক বাটী নির্ম্মাণ ও পৈতৃক নষ্ট সম্পত্তিগুলির পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃভক্তি, দানশীলতা, বিদ্যানুরাগ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় নিম্নলিখিত কীর্ত্তিরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। তিনি তাঁহার জন্মভূমি কায়বা গ্রামে পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া পিতৃ-স্মৃতি রক্ষার্থ "বীরেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়" নামক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং চিকিৎসালয়ের খরচ চালাইবার নিমিত্ত বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ও দুইজন তাঁহার সহকারী এবং একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ রাখিয়াছেন।

২। যশোহরে টোলের নিমিত্ত জমি ও বাটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। দৌলতপুর কলেজ সংলগ্ন চতুষ্পাঠীর গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত পাঁচ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৩। সম্প্রতি কুশদহ পরগণায় বিস্তৃত জমিদারি ক্রয় করিয়া তথায় বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠি নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

৪। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদিক হাসপাতাল বাটী প্রস্তুত এবং আয়ুর্ব্বেদিক হাসপাতালের জন্য তিনি লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি হইয়া-

ছেন। সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় এম, এ, এম্ বি, মহাশয় এই আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালের উদ্যোগ কর্ত্তা।

বারেশ্বর বাবু আজীবন স্বদেশবৎসল এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, পুত্রও পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতার ন্যায় মনোমোহন বাবুও কখনও বিলাতী বস্ত্র পরিধান করেন না। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই আমরা তাঁহাকে মটকা কাপড় ও গরদের কোট পরিতে দেখিয়া আসিতেছি। পূর্ব্বপুরুষগণের অনুসরণে ইনিও বরাবর দুর্গোৎসব, পূজাপার্ব্বণ, অতিথি সৎকার, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণবিদায় ইত্যাদি বংশগতধারা বজায় রাখিয়া বংশের গৌরব ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক বৎসর দুর্গোৎসবে বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত শত সহস্র ব্যক্তিকে অকাতর ব্যয়ে ইনি পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করান। বিষয়কার্য্যে ইনি মিতব্যয়ী, কিন্তু লোকজনকে খাওয়াইবার সময় ইনি নানাস্থান হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণ আয়োজনে একবারে মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনকালীন কএক বৎসর ধরিয়া সরস্বতী পূজার সময় মনোমোহন বাবুকে বিডন গার্ডেনে কলিকাতাবাসীমাত্রেই অকাতর ব্যয়ে সহস্র সহস্র কাঙ্গালী ভোজন করাইতে দেখিয়াছেন।

বহু ছাত্রকে ইনি আহার প্রদান এবং বহু পণ্ডিতকে তাঁহাদের চতুষ্পাঠী পরিচালনে সাহায্য করিয়া থাকেন। গ্রাম সম্পর্কীয় এবং আত্মীয় স্বজনের প্রীতির কলরবে সর্ব্বদা তাঁ'র কলিকাতা ভবন মুখরিত।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার স্বকৃত উপার্জ্জনের সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ট্রাষ্টী ডিড্ করিয়া তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান কায়বাগ্রামে অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী, জাতীয় বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য বড় দিঘী প্রভৃতি, যশোহরে জাতীয় বিদ্যালয়, খুলনায়

চতুষ্পাঠী প্রভৃতি তাঁহার পিতা ৺বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের নামে সমস্ত কার্য্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঐ ট্রাষ্টী ডিডে কলিকাতায় রাজা দীনেন্দ্র নারায়ণ ষ্ট্রীটে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে বীরেশ্বর দাতব্য আয়ুর্ব্বেদিক হাসপাতালের জন্য বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্বরই উক্ত আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতাল খোলা হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

যশোহর জেলায় জল কষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি বৎসর তিনি ২।১টী পুষ্করণী নিজ ব্যয়ে কাটাইয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন।

মনোমোহন বাবু মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি সাব ডিভিসেনের অধীন বাঘডাঙ্গার মধ্যম রাজা ৺উপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দেবীকে বিবাহ করেন।

ঐ বাঘডাঙ্গার রাজবংশের ক্রিয়া কলাপ ও বিগ্রহ সেবা ইত্যাদি চিরপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের বাটীতে ৺রাজ রাজেশ্বরী লক্ষ্মী নারায়ণ ও শত শিব পূজা প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে, ইঁহারা ফতেসিং পরগণার জমিদার ছিলেন; কালে সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র যৎসামান্য দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তাহাতে কোনরূপে দেব সেবা কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।

মনোমোহন বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। প্রথম রত্নেশ্বর পাঁড়ে, দ্বিতীয় শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পাঁড়ে ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীখগেন্দ্র মোহন পাঁড়ে। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ইন্দু দেবী ও কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি সুজলা দেবী।

জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান ডাক্তার সীতা নাথ প্রধান এম্, এস, সি, ও কনিষ্ঠ শ্রীমান সতী নাথ মিশ্র বি, এ। মনোমোহন বাবু জামাতাদিগকে বাল্যকাল হইতে নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন।

মনোমোহন বাবু কলিকাতায় ১।১ এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে

১০।১২টী স্কুলের ও কলেজের ছাত্রকে স্থান দিয়াছেন এবং তাহাদের আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ইহা ভিন্ন অনেক গরীব আত্মীয় তাঁহার বাটীতে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

মনোমোহন বাবু সন ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে তাঁহার মনোমোহন থিয়েটার শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ভাদুড়ী ও নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় দ্বয়কে মাসিক ২৭৫০৲ নেট ভাড়ায় পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত লিজ দিয়া থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

এই স্বনামধন্য কর্ম্মীর দীর্ঘ জীবন আমরা ঈশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনা করি।

শ্রীমনোমোহন পাঁড়ে।
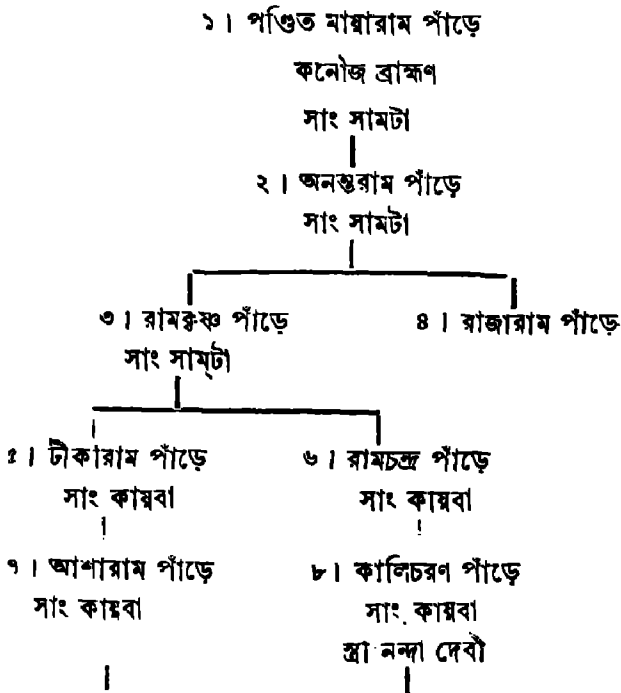
৯। ভবানীপ্রসাদ পাঁড়ে
সাং কায়বা
(নিঃসন্তান)

১০। কুবির পাঁড়ে
সাং কায়বা
(নিঃসন্তান)

১১। দুর্গাপ্রসাদ পাঁড়ে
সাং কায়বা
স্ত্রী সরস্বতী দেবী

১২। জগমোহন পাঁড়ে
সাং কায়বা
মৃত্যু ১২৩৩ সালের ২ বৈশাখ বৈশাখী শুক্লষষ্ঠী তিথি স্ত্রী বিমলাসুন্দরী দেবী মৃত্যু ১২৩৩ সাল ৩রা বৈশাখ শুক্ল সপ্তমী তিথি।

১৩। কনকচন্দ্র পাঁড়ে
সাং কায়বা

১৪। গৌরসুন্দর পাঁড়ে
সাং কায়বা
(নিঃসন্তান)
স্ত্রী দুর্গাময়ী দেবী

১৯। ভগবানচন্দ্র পাঁড়ে পৌষ্য পুত্র ১২৪৭ সালে পৌষ্য পুত্র গ্রহণ করেন।

২০। প্রভাসচন্দ্র পাঁড়ে
(নিঃসন্তান)

২১। চন্দ্রকান্ত পাঁড়ে
মৃত্যু ১৩১৮। ফাল্গুন

২২। শৈলেন্দ্রকুমার পাঁড়ে
(নিঃসন্তান)

২৩। হেমেন্দ্রকুমার পাঁড়ে
নিঃসন্তান স্ত্রী রাধারাণী দেবী

২৪। হাজারীলাল পাঁড়ে
(নিঃ সন্তান)

১৫। মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে
মৃত্যু ১২৭০ সাল বৈশাখ কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথি স্ত্রী শিবসুন্দরী দেবী।

১৬। গিরিশচন্দ্র পাঁড়ে
মৃত্যু ১২৭৫ সাল ২৯ আশ্বিন কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি স্ত্রী প্রসন্নময়ী দেবী।

১৭। গৌরিশচন্দ্র পাঁড়ে
মৃত্যু ১২৮৯ সাল ১লা কার্ত্তিক কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি স্ত্রী সুশারময়ী দেবী মৃত্যু ১২৫৬ অগ্রহায়ণ

১৮। উমেশচন্দ্র পাঁড়ে
মৃত্যু ১২৭২ সাল ৯ অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী তিথি স্ত্রী স্বর্ণময়ী দেবী মৃত্যু ১২৫৬ সাল ১১ অগ্রহায়ণ শুক্লদশমী তিথি।
২৬। কেদারেশ্বর পাঁড়ে মৃত্যু ১৩০৯
২৭। বীরেশ্বর পাঁড়ে
২৮। শ্রীকৃষ্ণ পাঁড়ে (নিঃ সন্তান) স্ত্রী শান্তময়ী দেবী
২৯। দেবেন্দ্রনাথ পাঁড়ে (নিঃ সন্তান)
৩০। নবকুমার পাঁড়ে জন্ম ১২৭৪। ফাল্গুন মৃত্যু ১৩১৫। ১৮ আশ্বিন স্ত্রী হরিমতী দেবী
৩১। রাজকুমার পাঁড়ে মৃত্যু ১৩১২ মাঘ স্ত্রী কাদম্বিনি দেবী
৩৬। সুধীরকুমার পাঁড়ে (নিঃ সন্তান)
৩২। তারাকুমার পাঁড়ে জন্ম ১৩০৫। চৈত্র।
৩৩ প্রফুল্লকুমার পাঁড়ে জন্ম ১৩১৩। ৫ পৌষ।
৩৪। সুরথকুমার পাঁড়ে জন্ম ১৩১৫ ১ ফাল্গুন।
৩৫। দীনেশ কুমার পাঁড়ে জন্ম ১৩১৭ ৩০শে আষাঢ়
২৭। বীরেশ্বর পাঁড়ে
৩৭। মনোমোহন পাঁড়ে
৩৮। লালমোহন পাঁড়ে
৩৯। সুরেন্দ্রমোহন পাঁড়ে
৪০। নগেন্দ্রমোহন পাঁড়ে মৃত্যু ১৩২৭। ১৯শে আশ্বিন।
৪১। জ্যোতিন্দ্রমোহন পাঁড়ে (নিঃসন্তান)
৪২। শচীন্দ্রমোহন পাঁড়ে (নিঃসন্তান)
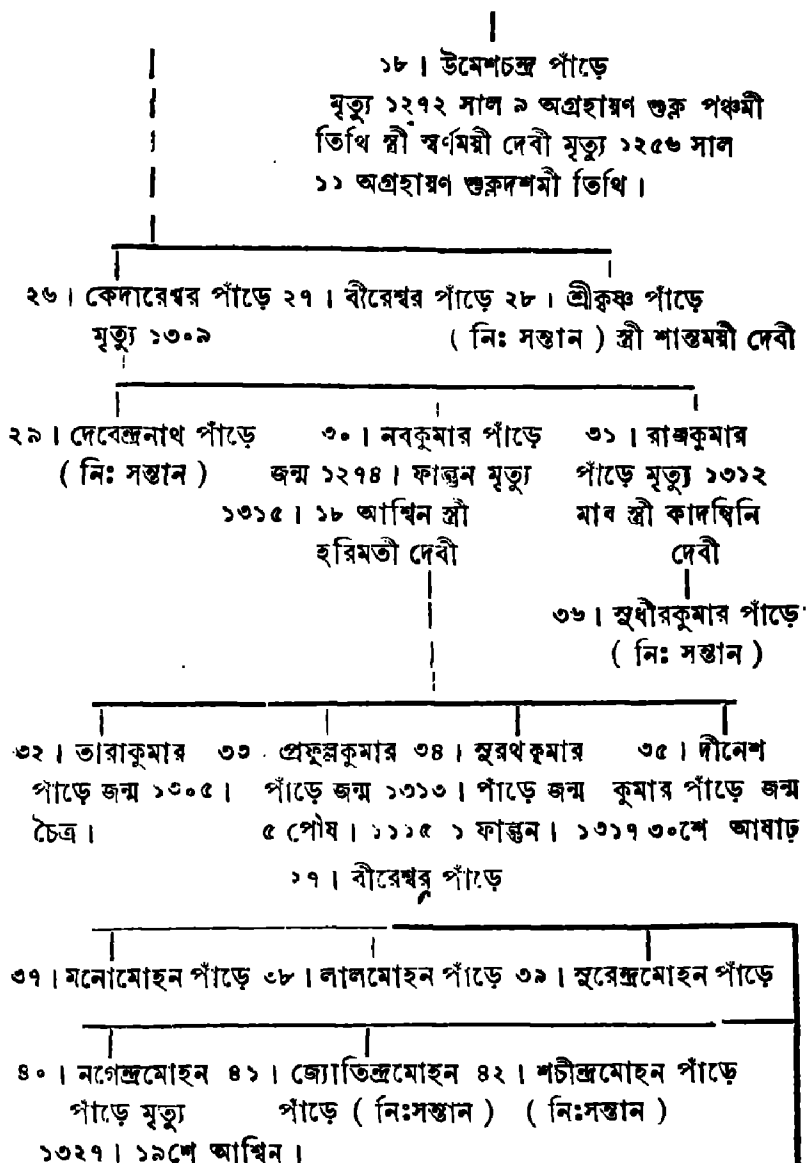
৪৩। জিতেন্দ্রমোহন পাঁড়ে ৪৪। ধীরেন্দ্রমোহন পাঁড়ে

৩৮। লালমোহন পাঁড়ে

৪৮। বিশ্বনাথ ৪৯। শম্ভুনাথ

৫০। ভূধরচন্দ্র পাঁড়ে ৫১। কুঞ্জবিহারী পাঁড়ে জন্ম ১৩০৭। ফাল্গুন

স্ত্রী কুন্তলাবালা দেবী

জ্যোতিশচন্দ্র প্রবোধচন্দ্র বুলটু ওরফে প্রভাসচন্দ্র পাঁড়ে পূর্ণচন্দ্র পাঁড়ে

১৭। গৌরিশচন্দ্র পাঁড়ে

৫৩। কালীশচন্দ্র পাঁড়ে ৫৪। সতীশচন্দ্র পাঁড়ে ৫৫। শ্রীশচন্দ্র পাঁড়ে
মৃত্যু ১২৯০।৫ই পৌষ। নিঃসন্তান (নিঃসন্তান)
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাষষ্ঠী তিথি মৃত্যু ১৩১৪।১ ভাদ্র
স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী ৺ কাশীধাম
মৃত্যু ১২২৯।চৈত্র স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী
মৃত্যু ১৩১২।কার্ত্তিক

৫৬। ভূপতিনাথ পাঁড়ে
জন্ম ১২৭১। আষাঢ়
স্ত্রী সরলাবালা দেবী

৫৭। শ্রীপতিনাথপাঁড়ে
(নিঃসন্তান)
জন্ম ১১৮৪ সাল
মৃত্যু ১২৯৭।১ জ্যৈষ্ঠ

৫৮। রমাপতি পাঁড়ে
জন্ম ১২৯৯ পৌষ মাহা
শ্রীনীহারবালা দেবী

লক্ষ্মীপতি পাঁড়ে
জন্ম ১৩২৪। পৌষ

৫৯। গণপতি পাঁড়ে
জন্ম ১৩০৫। ৪ঠা মাঘ
স্ত্রীবিমলশশী দেবী

অনন্তদেব পাঁড়ে
জন্ম ১৩৩০। ৬ই আশ্বিন

১৮। উমেশচন্দ্র পাঁড়ে

৬০। নীলকণ্ঠ পাঁড়ে
মৃত্যু ১৩০৬।২৮শে কার্ত্তিক
শুক্ল একাদশী তিথি

৬১ বরদাকণ্ঠ পাঁড়ে স্ত্রী শীতলাময়ী দেবী
নিঃসন্তান
জন্ম ১২৫২। পৌষ

জন্ম ১২৫৪।ভাদ্র মৃত্যু ১২৭৫।আশ্বিন
স্ত্রী ইচ্ছাময়ী দেবী

৬১। নীলকণ্ঠ পাঁড়ে

৬২। শ্রীকণ্ঠ পাঁড়ে
জন্ম ১২৮৪।
মৃত্যু ১৩০৮।৯ই বৈশাখ
(নিঃসন্তান)

৬৩। চন্দ্র পাঁড়ে
স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

৬৪। অমৃত পাঁড়ে
প্রফুল্লদেবী জন্ম ১৩০০

৬৫। ক্ষীরোদ পাঁড়ে
স্ত্রী রাণুবালা দেবী

ননীগোপাল পাঁড়ে — জন্ম ১৩২০।১১ শ্রাবণ
খোকা — জন্ম ১৩৩১। ১৮ই ফাল্গুন
দিবাকর পাঁড়ে — জন্ম ১৩২৭।৫ আশ্বিন

৪নং, ১০নং, ১১নং } ইহারা কৃষ্ণনগরের মহারাজের নিকট হইতে কতকগুলি ব্রহ্মোত্তর লয়েন।

১৩নং। ইহার স্ত্রী সহমরণে গমন করেন।

১৪নং। ইহার স্ত্রী ১২৪৭ সালে ভবাবান পাঁড়েকে পোষ্যপুত্র লয়েন।

২৬নং। বাল্যকাল হইতে ডাক্তারি শিক্ষা ও ভোজ বিদ্যার উপর অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া বাটী আসিয়া বিনামূল্যে রোগীর চিকিৎসা ও ঔষধাদি দিতেন। ইহার নিজের আবিষ্কৃত গুটিকতক ঔষধের মধ্যে একটী পাগলের ঔষধ ছিল, তাহতে বহুদূর হইতে পাগল প্রত্যহ আসিয়া নিরাময় হইত। ভোজবিদ্যার দরুণ বড় বড় লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইনি বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন।

ইহার পিতার ন্যায় সকলকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া ও দেখাশুনা করিতেন ও তাঁহার পিতার আবিষ্কৃত পাগলের ঔষধ পাগলদিগকে দিতেন।
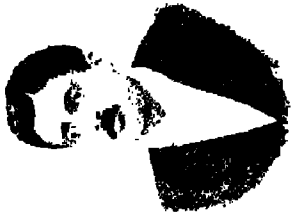
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
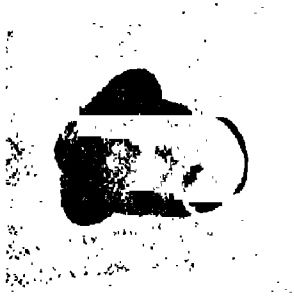
রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে ইনি ঢাকা জেলার অধীন মুন্সীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ইছাপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাঢ়ী শ্রেণীর স্বভাব কুলীন, পণ্ডিতরত্নী মেল। ইঁহার পিতা ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঢাকা সার্ভে সেটেলমেণ্ট আফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং পরোপকারী ছিলেন। বহু বিদ্যার্থীকে তাঁহার ঢাকাস্থ বাসাতে রাখিয়া অন্নদান এবং পড়াশুনার অন্যান্য সাহায্য করিতেন। মহেন্দ্রচন্দ্রের মাতা ৺মহামায়া দেবী ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কেওটখালী গ্রামের খ্যাতনামা পণ্ডিত গদাধর বিদ্যা-লঙ্কার মহাশয়ের কন্যা ও পণ্ডিত হরিমোহন শিরোমণি মহাশয়ের ভগ্নী ছিলেন, মহামায়া অতি দয়াবতী ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন এবং দরিদ্র-দিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন।

৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ মহেন্দ্র। ১৮৮৬ সনে বি. এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা জজকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিবার তিন চার মাস পরই দুর্ভাগ্যক্রমে উপেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ শোকে রামচন্দ্র এবং মহামায়া উভয়েরই শরীর ভাঙ্গিয়া যায় এবং অল্পদিন মধ্যেই উভয়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁহার পিতৃব্য হাইকোর্টের উকীল ৺শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার বিদ্যাভ্যাস সমাপ্ত করেন এবং কিছুদিন নারায়ণগঞ্জে ও সিরাজগঞ্জে শিক্ষকের কার্য্য করার পর ১৮৮৭ সনের ২ই জুলাই তারিখে সিরাজগঞ্জ কোর্টে ওকালতীর কার্য্য

আরম্ভ করেন। ঐ সনের নবেম্বর মাসে তিনি সিরাজগঞ্জের সরকারী উকীল নিযুক্ত হন এবং তদবধি যশ ও প্রতিপত্তির সহিত ওকালতীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত কুশাড়িপাড়া গ্রামনিবাসী মাসচড়ক শ্রোত্রীয় ৺রামমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। মনোমোহিনী দেবী আনুষ্ঠানিক হিন্দুরমণী এবং অতিথি সৎকার আদিতে স্বামীর অনুরাগিণী ও বিশেষ সহায়কারিণী।

মহেন্দ্রচন্দ্র দেশের ও সাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহার সমস্ত জীবনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন; এমন কি এই জনহিতকর ব্রতে অনেক সময় তাহার নিজের ব্যবসায়ের এবং স্বার্থের ক্ষতি হইলেও তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এককালীন পাঁচ সাতটী দায়ীত্বপূর্ণ সাধারণের কাজ তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত এবং তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত সমভাবে সমস্তগুলির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং কখনও কোনও প্রকার সাহায্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতেন না।

ইনি ৩৬ বৎসর একাদিক্রমে সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন; এই সময় মধ্যে তিন বৎসর চেয়ারম্যান ও ছয় বৎসর ভাইস্ চেয়ারম্যান স্বরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ২৬।১৭ বৎসর যাবৎ অত্রত্য বি-এল, স্কুলের এবং বহুদিন যাবৎ স্থানীয় আরবান বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন এবং কয়েক বৎসর যাবৎ সিরাজগঞ্জ কেন্দ্রের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কমিটির প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত আছেন। ১৭ বৎসর কাল ভিক্টোরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের সেক্রেটারীর কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাহার ভাইসচেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। ৮।৯ বৎসর যাবৎ কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ও ১০।১১ বৎসর যাবৎ

কো-অপারেটীভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ারম্যানের কার্য্য করিতেছেন। তিনি ব্যাঙ্ক দুইটীর কার্য্য কিরূপ যত্ন এবং আগ্রহের সহিত করিয়া থাকেন চেয়ারম্যান ও জয়েণ্ট রেজিষ্ট্রার অব কো-অপারেটীভ সোসাইটীর নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি ৬।৭ বৎসর স্থানীয় কৃষক সমিতির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া ঐ সমিতির জন্য কতক ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কৃষক সমিতির একটী ফারম স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্নবান আছেন।

* * * * *

"I Should like to thank our Deputy Chairman Rai M. C. Mukherjee Bahadur for his unceasing attention to Bank's interest. I should especially mention his name, who in spite of his multifarious duties and pre-occupations has always found time to be present with his useful suggestion ; he is at present devoting his wonderful energies to superintending the foundation work of the new Bank buildings which I am proud to see proceeding apace and likely to assume something like their final form before I leave in March."

4. 1. 25. } Sd/. N. L. Hindley chairman,
Central Co-operative Bank Ld.
Sirajganj.

Audit note of Sirajganj Co-operative Urban Bank Ld. year 1923-24.

"I cannot conclude the report without acknowledging my thanks to Rai Mohendra chandra Mukher-

jee Bahadoor, Chairman, who is taking parental interest in the welfare of this popular institution. My sincere thanks are due to him."

Sd. A. K. K. Ahmed

Asst. Registrar 27. 12. 24.

সিরাজগঞ্জ সহরে সাধারণ হিতকর যে কয়েকটি দ্রষ্টব্য ও উল্লেখযোগ্য public institution আছে তৎসমুদয় ইঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক। ইঁহার চেষ্টায় ও যত্নে সিরাজগঞ্জের মিউনিসিপাল বাজার; বি, এল, স্কুলের বৃহৎ দালান; হিন্দুদিগের শ্মশান ঘাট; দাতব্য চিকিৎসালয়ের দালান, অপারেশন রুম, কলেরা ও বসন্ত ওয়ার্ড, ডাক্তার ও লেডি ডাক্তারের বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া ঐ সকলের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের "লেডি কারমাইকেল ফিমেল হাসপাতাল" (with paying word) নির্ম্মাণ ও লেডি ডাক্তার স্থাপন ইঁহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল।

তাঁহার এই সমস্ত জনহিতকর কার্য্যকলাপ ও আত্মত্যাগ সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নিম্নলিখিত Certificate of honour প্রদান করেন।

"By Command of His Excellency the Viceroy and Governor General in Council, this Certificate is presented in the name of His Most Gracious Majesty King George V Emperor of India, on the occasion of His Imperial Majesty's coronation Durbar at Delhi to Babu Mohendra Chandra Mukherjee in recognition

of his good services in connection with the Sirajganj B. L. School.

12th December 1911 } Sd/. Thos. S. Bayly. Lt. Governor of E. Bengal & Assam,

তৎপর ১৯১০ সনে তিনি যে Durbar Medal প্রাপ্ত হন তৎকালে তাঁহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করেন।

Memo recounting briefly the services rendered to the State by the gentlemen who are receiving Durbar Medals.

* * * *

Non official—

Babu Mahendra Chandra Mukherjee Government Pleader, Sirajganj.

Appointed Government Pleader in the year 1887.

Many works of public utility in this town are due to his efforts. Rendered good services to the State in the Following capacities :—

(a) As a member of the local charitable Dispensary of which he was Secretary for 6 years.

(b) As a commissioner of the Sirajganj Municipality for last 18 years of which he was the Vice Chairman for 6 years.

(c) As a member of the Bonwarilal School Committee for the last 18 years of which he has been

the Secretary for last 8 years. He was granted a Certificate of Honour during the last Coronation Durbar for his good service in this connection.

(d) As Secretary of the Coronation Celebration Committee of His Late Majesty King Edward VII, as Vice President of the Edward Memorial Commitee and as Vice President of the Coronation celebration Commitee of His Imperial Majesty King Georg V.

20th June 1912. } Sd. G. H. W. Davis
Sub Divisional officer, Sirajganj.

অবশেষে মিউনিসিপালিটী সংসৃষ্ট কার্য্যকলাপে তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।

Sanad

To Babu Mohendra Chandra Mukherjee Chairman, Sirajganj Municipality, Pabna District, Bengal.

I hereby confer upon you the title of Rai Bahadur as a personal distinction

Delhi.
The 1st January 1914 } Sd Hardinge of Penshurst
Viceroy and Governor
General of India.

এই সকল রাজকার্য্য ও সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ। রাজকীয় সংশ্রবে গভর্ণর, কমিশনার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহু ইংরাজ রাজপুরুষের সহিত ইঁহাকে মেলামেশা

করিতে হইয়াছে, কিন্তু কখনও ইঁহাদের সহিত একত্র পান ভোজন বা অহিন্দু আচরণ করেন নাই। এমন কি বর্ত্তমান সভ্যতা জ্ঞাপক সিগারেট কিংবা কোন মাদক দ্রব্যে ইনি কদাচ অভ্যস্ত নহেন।

সিরাজগঞ্জের বর্ত্তমান কালীবাড়ী ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও সভামন্দির ইঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফল। ইঁহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ৺রাধাগোবিন্দ জিউ ও তাহার মন্দির স্থাপিত হইয়া নিত্য সেবা, পূজা ও বাৎসরিক সমস্ত পর্ব্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ইনি অনেকদিন যাবৎ উক্ত আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার সভাপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তান্ত্রিক সাধনোপযোগী একটী "আসন" নির্ম্মাণ-কল্পে অভিলাষী হইয়া স্থানীয় শ্মশান ক্ষেত্রে একটী "পঞ্চবটি" রোপণ করিয়া তন্মধ্যে কালীমন্দির ও কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতি অমাবস্যায় ষোড়শোপচারে মায়ের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং স্থানীয় থানার কালীবাড়ীর পাকা মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি কুমিল্লা জেলাস্থিত মেহার কালীবাড়ী ও সর্ব্বানন্দ মঠের উন্নতিকল্পে চাঁদা আদায় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন

মহেন্দ্রচন্দ্রের অন্নদান ও অতিথি সৎকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন এবং সাধ্যমত তাহাদের আদর অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শরৎকালে বরিশাল নোয়াখালি, ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলা হইতে সমাগত বহু ঘটক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তিনি সমাদরে আহার ও বাসস্থান দিয়া থাকেন এবং যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্যও করিয়া থাকেন। তদুপরি তিনি অনেক দরিদ্র বিদ্যার্থি বিপন্ন ভদ্রলোক এবং আত্মীয় স্বজনকে অন্ন দিয়া প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং অবস্থানুসারে অনেককে চাকুরী দিয়া এবং আর্থিক সাহায্য করিয়া বহু পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

চিরদিন বিদেশবাসী হইয়াও জন্মস্থানের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে এবং অবসর পাইলেই দেশে গিয়া গ্রামের জলকষ্ট নিবারণকল্পে জলাশয় আদি খনন করাইয়া ও রাস্তাঘাট প্রস্তুতের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া গ্রামবাসীর অভাব অভিযোগ মোচনের চেষ্টা করেন। বর্ত্তমানে নিজগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

ইঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিরাজগঞ্জেই ওকালতী আরম্ভ করাতে সাধারণের কার্য্য করিবার অধিকতর সুযোগ এবং অবসর ঘটিয়াছে। সতীশচন্দ্রও অল্পসময় মধ্যেই তদীয় কার্য্যকলাপে তিনি যে তাঁহার পিতার উচ্চ আদর্শ অনুসরণ প্রয়াসী তাহার পরিচয় দিয়াছেন। স্থানীয় উকীল লাইব্রেরীর সুন্দর এবং বৃহৎ দালানটী তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এখন হইতে দুই একটী করিয়া সাধারণ অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি স্থানীয় আরবান বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা কেন্দ্র সমিতির মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন।

সতীশচন্দ্র রংপুর জেলার অন্তর্গত নাওডাঙ্গা নিবাসী কুচবিহারের জমিদার রায় চৌধুরী প্রমদারঞ্জন বক্সী মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। কুচবিহারের তৎকালীন মহারাজা স্বর্গীয় জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর ঐ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং মহারাজা ও মহারাণী নব দম্পতিকে মূল্যবান যৌতুক উপঢৌকন দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের বর্ত্তমানে তিন পুত্র আশুতোষ, মধুসূদন এবং শিবরাম ও কন্যা যোগমায়া।

* * * *

নিম্নে ইঁহাদের বংশতালিকা দেওয়া হইল—

বংশাবলী।

দেবকীনন্দন মুখোপাধ্যায়
পণ্ডিত রত্নী মেল
|
অধস্তন কয়েক পুরুষ পর
শ্রীহরি
|
জগদানন্দ
|
রূপরাম
|
কালীকাপ্রসাদ
নিবাস মদনপুর (নদীয়া)
[ইনি ঢাকা জেলাস্থ ইছাপুর গ্রামে
৺জগন্নাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের
ভগ্নী উমাময়ী দেবীকে
বিবাহ করেন]
|
রামচন্দ্র (স্ত্রী মহামায়া)
|

(মৃত) উপেন্দ্রচন্দ্র (স্ত্রী স্বর্ণময়ী)	মহেন্দ্রচন্দ্র (স্ত্রী মনোমোহিনী)	কন্যা (মৃত)
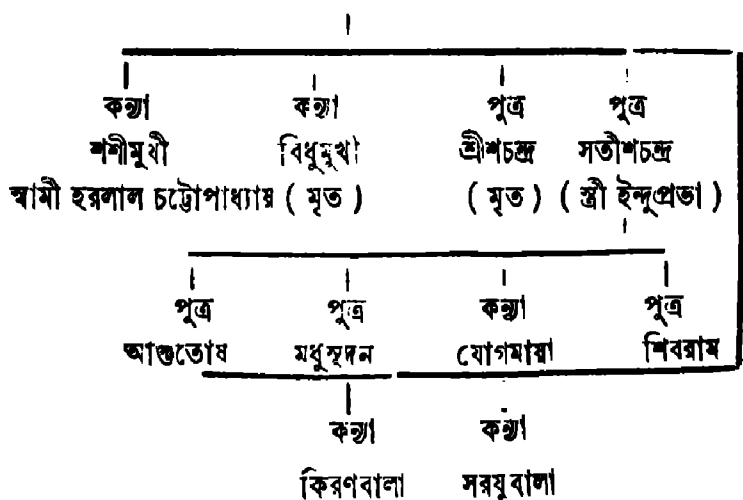
স্বামী হরিপদ গঙ্গোপাধ্যায় স্বামী শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র সিংহ

বড় জাগুলির সিংহ বংশ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত হরিংঘাটা থানার অধীনে সুপ্রসিদ্ধ বড়জাগুলি গ্রামের সিংহ বংশ অতি প্রাচীন ও বনিয়াদী। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে বাংলার সুবাদার আলিবর্দ্দি খাঁর শাসন সময়ে এই বংশের জনৈক আদি পুরুষ বলরাম সিংহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমিন নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার অপর দুই সহোদর জনার্দ্দন সিংহ ও রতন সিংহ অন্যান্য বড় বড় রাজষ্টেটে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, বলরাম সিংহ তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও কার্য্যকুশলতা ও কৃতিত্বের পারিতোষিকস্বরূপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে বড় জাগুলি ও অন্যান্য গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হন, তখন বড় জাগুলি গ্রাম নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। বলরাম সিংহ, জনার্দ্দন সিংহ ও রতন সিংহ ইহারা বড় জাগুলি গ্রামে বসবাস করিবার অভিপ্রায়ে বড় জাগুলির বন কাটাইয়া উহা আবাদ করেন এবং তথায় বসতবাটী নির্ম্মাণ করতঃ বসবাস করিতে থাকেন। বড় জাগুলি গ্রাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে বলরাম সিংহের পদমর্য্যাদা অনুসারে অদ্যাপি "আমিন সিংহের জাগুলি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বলরাম সিংহ, জনার্দ্দন সিংহ ও রতন সিংহ বড় জাগুলি গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। কালে ঐ গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বড় বড় জলাশয় খনন, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত এবং গড়নির্ম্মাণ ও দেবতা স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বড় জাগুলি গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। বলরাম সিংহ, জনার্দ্দন সিংহ ও রতন সিংহের চেষ্টায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ গ্রামে বহুতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য যাবতীয় লোক আসিয়া বসবাস করেন।

কৃষ্ণনগরে ও বড় জাগুলিতে বলরাম সিংহ, জনার্দ্দন সিংহ ও রতন

সিংহের অনেক জনহিতকর কীর্ত্তি-কলাপ আছে, ইঁহারা দেশের সেবায় প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, জাতিতে ইঁহারা মৌলিক কায়স্থ এবং গোষ্ঠীপতি উপাধিধারী। ইঁহাদের বিবাহাদি কার্য্য সমস্ত মুখ্য কুলীনের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ইঁহারা অনেক মুখ্য কুলিনের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া ও জামাতাগণকে যৌতুকস্বরূপ বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়া তাঁহাদিগকে বড় জাগুলি গ্রামে বসবাস করাইয়া দেন।

বড় জাগুলির সিংহ বংশ অত্যন্ত বিস্তৃত, এখনও কলিকাতা, বর্দ্ধমান এমন কি কটক ও পুরী পর্য্যন্ত নানাস্থানে ইঁহাদের বংশের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন এবং তাঁহাদের বংশধর ও আত্মীয় কুটুম্বগণ সরকারী ও বে-সরকারী উচ্চ উচ্চ চাকুরী করিতেছেন।

জনার্দ্দন সিংহের পুত্র কৃষ্ণকিঙ্কর সিংহ, তৎপুত্র কালীকিঙ্কর সিংহ ও ও তৎপুত্র কৃষ্ণমোহন সিংহ কৃষ্ণমোহন সিংহ একমাত্র পুত্র মাধবচন্দ্র সিংহকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

মাধবচন্দ্র সিংহ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, তিনি অল্প বয়সেই নিজ প্রতিভা বলে ভাগ্যোন্নতি করার জন্য কলিকাতায় আসেন। প্রথমতঃ সামান্য সামান্য কণ্ট্রাক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিজের বুদ্ধি ও কার্য্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, অল্প দিনের মধ্যেই মাধবচন্দ্র সিংহ নিজ সততা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে সরকারী ও মিউনিসিপ্যালিটীর বহুমূল্যের দায়ীত্বযুক্ত কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য পান; সেই সমস্ত কার্য্যে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইনি অতিশয় পরদুঃখকাতর ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি ৺ বারাণসীধামে ৺ শিবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, অনেক ব্রাহ্মণকে তিনি কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। ধনী দরিদ্রে তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। যাচক কখনও

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ

বিমুখ হইয়া তাঁহার দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইত না। দেবদ্বিজে তাঁহার অকপট ভক্তি ছিল। তাঁহার বাড়ীতে নিত্য ঠাকুর সেবা হইত এবং বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। দোল, দুর্গোৎসব ইহার কোন ক্রিয়াই তাঁহার বাড়ীতে বাদ যাইত না। ইঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে দান সাগর শ্রাদ্ধ করেন। এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড়, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নানা দিগ্ দেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। গোপাল চন্দ্র সিংহ সকল অধ্যাপককে যথাযোগ্য বিদায় দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় বিংশতি সহস্র কাঙ্গালীকে অন্ন ও বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সিংহ

গোপালচন্দ্র সিংহ মহাশয় স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র সিংহের একমাত্র পুত্র। হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি পিতার সহিত কণ্ট্রাক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ব্যবসায় কার্য্যে ইনি পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহার দুই বিবাহ। প্রথমে ইনি ৺কালীকুমার মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বারে ইনি ৺গিরিশচন্দ্র মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী এবং বঙ্গ সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ উপাসক। সুগায়ক ও চিত্রবিদ্যা নিপুণ। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি ছয়খানা নাটক লিখিয়াছেন। বই ছয়খানির নাম—লক্ষ্মণা হরণ, লব-কুশ বিজয়, অপূর্ব্ব মিলন, পারস্য সুন্দরী, ভাগ্যচক্র ও কল্পনা রহস্য। ঐ সমস্ত নাটক থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ ও আনন্দ উৎপাদন করিত। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে বাসস্থান দিয়া ও সাহায্য করিয়া পিতার কীর্ত্তি-কলাপ সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিতেছেন।

৺কাশীধামে ইনি একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভোজন, বিদায় দান ও কাঙ্গালী ভোজন করাইয়াছিলেন। দেশের উন্নতিকল্পে ইহার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ইনি পৈতৃক বাসস্থান বড় জাগুলিতে তথাকার লোকদের ও জনসাধারণের সুবিধার জন্য ইহার পিতা ৺মাধবচন্দ্র সিংহের নামে একটি রাস্তা পাকা করিয়া দিয়াছেন এবং স্থানীয় বালকদিগের শিক্ষার্থে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া "গোপাল একাডেমী" নামে একটী মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। স্বদেশীয় শিল্পোন্নতির জন্য এবং অন্যান্য উন্নতি কল্পে ন্যাশন্যাল কাউন্সিলে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। ইনি গ্রামবাসী দুঃস্থ লোকদের চিকিৎসার্থে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ৺কাশীধামে যাহাতে দরিদ্র বিদ্যার্থীগণ সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবার মনস্থ করিয়াছেন।